মহানিশা

অনুরূপা দেবী

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ষষ্ঠ মুদ্রণ   ১৩৬২

: লেখিকার কয়েকখানি গ্রন্থ :

মা

রাঙ্গাশাঁখা

চক্র

জ্যোতিঃহারা

পথহারা

বারি ঝরা বাদলে

বিচারপতি

মন্ত্রশক্তি

পোষ্যপুত্র

উত্তরায়ণ

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-১২ হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত
নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলি-৬ হইতে সুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

মাতৃ-পাদপদ্মে

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতিস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি॥

মহানিশা

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া স্টেশন হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বাকুল গ্রাম আয়তনে বড় না হইলেও তাহাতে গ্রাম-লক্ষ্মীর অবস্থিতি-চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস থাকিলেই সেকালের গ্রাম সেই সমৃদ্ধির অংশ-লাভে বঞ্চিত হইত না। সহরের টানে তাঁরা যদিও অনেকেই দেশ-ছাড়া, তথাপি তখনও তাঁহাদের পূর্ব কীর্তির উপরে প্রত্নতাত্ত্বিকের অধিকার জন্মাইবার কাল উপস্থিত হয় নাই। পুষ্করিণীগুলির অধিকাংশেই জলের বর্ণ স্বাভাবিক; দুই-একটায় পদ্ম ফুটিতেছে, কিন্তু পঙ্কের তখনও শৈশব-লীলা। গ্রামের প্রান্ত প্রদেশে রাধিকাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস। এঁরা মুখ্য কুলীন, এই গ্রামেরই বাসিন্দা, পূর্ব নিবাস জানা নাই।

তেতলার ঘরে কৃষ্ণলীলার কয়েকটা চিত্র, কাঠের জলচৌকিতে কি ঠাকুরের মূর্তি—চন্দনে অর্ধলুপ্ত, জীর্ণ ধূলি মলিন ভূষণে আবৃত। পুরোহিত,—পুরাতন সরকার। সে-ই পূজা আরতি করে, ভোগ দেয়, নিজেই ভোগ রাঁধে। ভাঁড়ারের চাবি তারই কাছে, খরচের জিনিষ খরিদ করে, বাজার আনে, হিসাব লেখে, গোয়ালা দুধে জল দিলে ঝগড়া করে, ধোপার কাছে কাপড় বাকি থাকিলে দাম কাটে, অবসর পাইলে কর্তার হুঁকার উপর কলিকাটি চাপাইয়া দিয়া দেবী-ভাগবতের 'শুম্ভ-নিশুম্ভে'র পালার পদ্যানুবাদ শুনায়।

গৃহস্বামীর বয়স এককালে ঠেকিয়াছে। চেহারা ততোধিক রুক্ষ, মনটিও সমধিক কঠোরতর। তাঁর তিন কুলে কেহ আছে কি না এ সংশয় অনেকের মনে জাগে, মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীর অভাবে যে সরকারমশাই-ই বৃদ্ধের সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিবে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ ছিল না। ঐ প্রৌঢ় সরকার ব্যতীত

পরলোকযাত্রা-পথের পথিক বৃদ্ধের আত্মীয়-বন্ধুর সমাচার অনেকের জানা ছিল না। প্রাচীনেরা জানিতেন একদা একজন ছিল। দূর.অতীতে তাহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, সেই হইতে তার নাম চিরলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—সে আজও আছে, কি মরিয়াছে কে জানে!

সেদিন আরতি সমাপ্ত হইয়া গেল; নিকট প্রতিবেশী-গৃহের কচি ছেলেটি শীতলের দুখানি বাতাসার লোভ দমন করিয়া শ্রাবণের বর্ষণ-শ্রান্ত রাত্রিটা নিরানন্দতর করিল। ঘণ্টার শব্দ বর্ষার আর্তনাদে মিশিয়া বারংবার ব্যর্থ-আহ্বানের নিস্ফল আক্ষোভে ফিরিয়া আসিল, কাঁসর সেদিন বাজিল না—বাজাইবার লোক ছিল না। ম্লান মুখে সরকার-মহাশয় প্রদীপ উস্কাইয়া দ্বারে শিকল টানিয়া দিল। রাধিকাপ্রসন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরিলেন। কোন কিছুর জন্যই তাঁর আসে যায় না, এই তাঁর জীবনের আদর্শ।

বসিবার চৌকির উপর একখানা পত্র পড়িয়া আছে। বৈকালে ডাক হরকরা জানালার ফাঁক দিয়া পত্রখানি ফেলিয়া গিয়া থাকিবে। দীপালোকে স্তিমিত দৃষ্টি মেলিয়া বৃদ্ধ পত্রখানা পাঠ করিলেন:

প্রণাম শতকোটী নিবেদনমিদং

পরস্পরের সহিত অতি নিকটতম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেও আপনার নিকট সম্পূর্ণ রূপেই অপরিচিতা। সেইজন্য সর্বপ্রথমে নিজের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিয়া লিখিতেছি, আমি—আপনার চির পরিত্যক্তা কন্যা শশিবালার হতভাগ্য সন্তান—দামিনী।

হয়ত এ পরিচয়ের ফলে আপনি আমার এ পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন, কিন্তু তথাপি যখন আজ আপনার কৃপাভিক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াই পত্র লিখিতে বসিয়াছি, তখন সে সম্ভাবনা সত্ত্বেও নিবৃত্ত হইব না। ভিখারীর মান-অভিমান সাজে না।

যদি জগতে দ্বিতীয় কোন পথ মুক্ত থাকিত. হয়ত আপনার মত নির্মম আত্মীয়ের দয়া প্রার্থনা করিতাম না। এ কথা কতদূর সত্য—এই সুদীর্ঘ

অতীত বৎসরগুলি তাহার বিশ্বস্ত সাক্ষী! আজ আমি অনাথা, সহায়-সম্বল বিহীনা—ভিখারিণী। ভিখারীর মানমর্যাদা নাই; পাঁচজনের দ্বারে যাহাকে আঁচল পাতিতে হয়, ছয়জনের দ্বারকে উপেক্ষা করিবে সে কি জন্য?

বাক্যাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, আপনার হয়ত ভালও লাগিবে না। কথা এই,—আমি যে-কোনরূপে যৎসামান্য কিছু সাহায্যপ্রার্থী। যদি ভিক্ষাপাত্রের বিচার নিষ্প্রয়োজন বোধ করেন, তবে তাহা যেরূপে সুবিধা বা ইচ্ছা, পাঠাইলে অনুগৃহীতা হইব। নিকটে গিয়া ভিক্ষা চাহিবার সাহস নাই।

কি লিখিব?—কত কথা, কি বিপুল আলোড়নে এ ভাঙ্গা বুক ভরিয়া উঠিতেছে! কিন্তু হায়—এ বন্যা ধারা কোন্ মরুলক্ষ্যে ছুটিতে চায়? কাহাকে বলিব?

প্রণাম গ্রহণে বাধা আছে কি? যদি না থাকে, তবে অসংখ্য প্রণাম।

—হতভাগিনী সৌদামিনী।

দামিনী!—দামিনী!—উঃ কতদিন পরে! কি যুগ যুগান্তর ভেদ করিয়া সুদূর অতীতের ধূলি-মেঘ বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই ক্ষুদ্র দামিনীলতা আজ আবার এই মেঘাড়ম্বর-ভরা দুরুদুরুবিকম্পিত বর্ষা-নিশীথে প্রকট হইল! কতদিন! সে কি এই জীবনেরই কথা? না, অতীত জন্মের?

রাধিকাপ্রসন্ন চশমার নিকট হইতে পত্রখানা সরাইয়া কিছুক্ষণ চশমার মধ্য হইতে ক্ষণকম্পিত দীপশিখার নর্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, তাঁর মনের ভিতরকার-বর্ষা বাতাসেও বোধ করি এমনি একটা নর্তনশীল আলোকরশ্মি আলো-আঁধারের লুকোচুরি-খেলা খেলিতেছিল। মনের মধ্যে কোন সুদূর অতীত স্মৃতির জ্বালা লবণাক্ত হইয়া উঠিতে সময় পাইল না—বুদ্ধি, অহঙ্কার কেহ কাহাকেও আমল দিতে রাজী হইল না, কেবল একটা উদ্দাম সুখ বা তীব্রতম দুঃখ,—কি যে বলা যায় না—ঐ মেঘসঞ্চারী তড়িতের মতই বুকের অন্ধকার চিরিয়া চিরিয়া খান খান করিতে লাগিল, বজ্র হাঁকিল না।

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া আজ আর নিদ্রা আসিল না। আকাশের কূল-কিনারা মেঘসমুদ্রে ঢাকিয়া আছে। অদূরবর্তী পুষ্করিণী ভেকরবে মুখরিত, সেই

সঙ্গে ছাদের নল হইতে জলধারার পতন-কল্লোল মিশিয়া যাইতেছিল। লণ্ঠনের তেজ বাড়াইয়া দিয়া আলোক-হস্তে বিনিদ্র গৃহস্বামী চোরের মত পা টিপিয়া নিজেরই জনশূন্য দ্বিতলের একটা চাবিবদ্ধ ঘরের বহুদিনকার বন্ধন মোচন করিয়া প্রবিষ্ট হইলেন।

ঘরখানা দেখিলে মনে হয়, বহুকাল ইহার মধ্যে মানব-সংস্পর্শ ঘটে নাই। কিন্তু তৎপূর্বে যে একটি ক্ষুদ্র মানবক এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী ছিল, এখনও এই অপর্যাপ্ত ধূলিজাল ভেদ করিয়া পর্যালোচকের দৃষ্টি এটুকু ধরিয়া ফেলে। বড় খাটের পাশে ছোট একটি কাঠের রেলিং-ঘেরা দোলনা, তার উপর দড়ি দিয়া ঝুলান একটা ধূসর পদার্থ—গঠনে শিশুর নয়ন-শোভন বিচিত্রবর্ণের কাঠের ঝারা কল্পনা করা অসঙ্গত নয়। একপাশে জলচৌকির উপর ধূলি-রঞ্জিত বাঁধা হুঁকা মায় সরপোশ, পানের বাটার সহিত মাটির সিংহ, আহ্লাদী ও কৃষ্ণ-রাধা মূর্তিগুলা কাহার স্নেহস্পর্শ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া রাধিকাপ্রসন্ন কিছুক্ষণ এই রাক্ষসীপুরীতুল্য, অকস্মাৎ-পরিত্যক্ত গৃহের প্রতিটি বস্তুর পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া নিচে নামিয়া ডাকিলেন—বেহারি!

কাঁচা বয়সে ঘুমের যেরূপ গাঢ়তা থাকে, একটু বয়স বাড়িলে সেটুকু কমিয়া আসে। এমন নিশুতি বর্ষা-রাত্রির আরাম-শয্যা ছাড়িতে তাই সরকার-মহাশয়ের অধিক বিলম্ব ঘটিল না। উঠিয়া বসিয়া দুই হস্তে নেত্র-মার্জনা করিতে করিতে উত্তর দিল—আঁজ্ঞে!

—দেখ বেহারি! এ আবার কি ফ্যাসাদ জুটলো দেখ! ভাল গ্রহেই পড়া গেছে!—বলিয়া সন্ধ্যায় প্রাপ্ত পত্রখানা ও লণ্ঠনটা তাহার দিকে সরাইয়া দিলেন।

পত্রপাঠ সমাপ্তির সঙ্গে বিহারীর বাকি ঘুমের ঝোঁকটুকু কাটিয়া গিয়াছিল সঙ্কোচের সহিত কহিল—তাহলে এটা কাল একবার ভাল করে বিবেচন করে, যা হয় কিছু মনিঅর্ডারেই পাঠান যাবে—

আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মধ্যপথে বাধা প্রাপ্তি ঘটিল

রাধিকাপ্রসন্ন তীব্র অসন্তোষে সবেগে কহিয়া উঠিলেন—ঐ তোমাদের এক রোগ! পরামর্শ করিব—কনফারেন্স বসাইব—অত ঘটা কিসের? মনি-অর্ডার-ফর্ডারে টাকা-ফাকা পাঠান, ওসব আমার কম্ম নয়। পরের জন্যে অত ঝক্কি সইতে গেলাম কেন শুনি?

প্রভুর ধাতুর সহিত বিহারী বিশেষ পরিচিত। সে আর কিছু না বলিয়া ভূমিলগ্ন দৃষ্টিতে নীরব রহিল। এসময় প্রত্যুত্তর চলিবে না, জানিত।

রাধিকাপ্রসন্ন একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া সমধিক বিরক্তিভরে কহিতে লাগিলেন—ভিক্ষে করতে বার হয়েছেন তবু তেজ দেখ না! সাপের শলুই কি না! কত ভাল হবে? ওর বাপ বেটা যে অতি পাষণ্ড ছিল, আসল বজ্জাৎ ছিল। আমার খেয়ে মানুষ, আর সেই আমাকেই অপমান করে কি না স্ত্রী-কন্যা কেড়ে নিয়ে তেজ দেখিয়ে চলে গেলেন! হুঁ, আমিও রাধিকা শর্মা,—এমন বাঁড়ুয্যে বামুন নই, আজ ত্রিশ বৎসর সেই বেইমান গুষ্ঠির নাম পর্যন্ত আমার মুখে কেউ শুনতে পেয়েছে বলুক দেখি। কিসের দরকার—যারা আমার নয়, আমি তাদের মায়ায় বদ্ধ হয়ে হরে-নরের মত কেঁদে মরবো, হাঃ! এজন্ম জন্মাই নি। মনে করি চিরদিনই নিঃসন্তান ছিলাম। যাক—সে বেটাও বিক্রমপুরের কুলীনের ব্যাটা। গোঁ বজায় রেখেছে বটে! মরে গেছে,—তবু আমার দোর যে মাড়াবে না বলেছিল, সে কথা রেখে মরেছে। বেশ করেছে! শুধু এই মনুষ্যত্বটুকুর জন্যই আমি তাকে একবিন্দু শ্রদ্ধা করি; তা ছাড়া আর কিছু না!—যাক্, সে তো চুকেই গেছে। এত দিন পরে, এই নবাবজাদী যে হঠাৎ মানের বোঝা নামিয়ে ভিক্ষের পাত্তর তুলে ধরলেন এর মানে কিরে বিহারি?

বিহারী ত্রস্তে দৃষ্টি উঠাইয়া কাতর নেত্রে চাহিল, বলিল—বোধ করি, মা-ঠাকরুণ বড়ই বিপন্ন, না হলে, এমন করে তিনি চিঠি লিখতেন না; তাঁকে কিছু সাহায্য—

—তুমি যেমন ক্ষেপেছ! তিনি তাঁর মানের বোঝা নিয়ে সিংহাসনের রাণী হয়ে বসে থাকুন, আর আমি তাঁর পাইকব্যাটা ঘাড়ে বয়ে খাজনা দাখিল করে

মরি। হ্যাঃতোর দায় পড়েছে! তাঁর যদি তেমন দরকার হতো তাহলে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে নিজেই হাজির হতেন না? যাক যেতে দাও। বৃষ্টি বাদলের রাত্তিরটা, নাও ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। আমাকে একটু ঘুমোতে হবে ত; সারারাত্তির তোমার যুক্তি শুনলে ত চলবে না।

বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। ঘুমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা কে জানে, বরং জানালার কপাট খুলিয়া সেইখানেই ক্লান্তভাবে বসিয়া-পড়াটা বিহারীর দৃষ্টি এড়াইল না।

২

দুদিন পরে বর্ষণক্লান্ত মেঘের স্তর নিজস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে যখন ব্যস্ত, বর্ণাঢ্য মেঘপুঞ্জ বিভক্ত পথে সূর্যকিরণ স্বাধিকার প্রমত্তভাবে অবতরণ করিতেছে, রাধিকাপ্রসন্নর গৃহদ্বারে একখানা গরুর গাড়ী পথ-কর্দম মথিত করিতে করিতে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে আসিয়া দাঁড়াইল।

শকট চালকের পশ্চাতে বিহারী বসিয়াছিল। গাড়ী থামিতে ত্রস্তে ব্যস্তে নামিয়া ছইয়ের সামনের ময়লা কাপড়ের আবরণটা মুক্ত করিল। আরোহী দুইজনেই নারী—বয়োজ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া সম্ভ্রমের সহিত কহিল—আসুন মা—নেমে আসুন।

ভিতর হইতে দুইজনে নামিয়া সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত পদে বিহারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সঙ্গের যৎসামান্য জিনিষপত্র গাড়োয়ান ও বিহারীই বহন করিল—সে অল্প, সত্যই বড় অল্প! দুইজনের মধ্যে একজন অন্যূন ছত্রিশ বা সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স্কা শীর্ণা চিন্তাম্লানমুখী বিধবা—তিনিই রাধিকাপ্রসন্নবাবুর দৌহিত্রী সৌদামিনী দেবী। অপরজন তাঁহার কিশোরী কন্যা অপর্ণা—বয়স সম্বন্ধে উল্লেখ আমরা করিব না, মেয়েটি কুমারী। সেকালের দিনে আইবুড়ো মেয়ের বয়স—ঘড়ির বড় কাঁটার মত ঘুরিয়া ফিরিয়াও ঠিক বারোর অঙ্কেই ফিরিত।

অন্দর ও সদরের যোগ যে ক্ষুদ্র দ্বার পথে সেই সন্ধি-স্থলে পৌঁছিয়া সৌদামিনী উৎকণ্ঠিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন—দাদাবাবুকে ত দেখছি নে বেহারীমামা!

বিহারী হাতের বোঁচকাটা নামাইয়া রাখিয়া সদরের দিকে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু কি ভাবিয়া পরিত্যক্ত ভারটা উঠাইয়া লইল। অগ্রসর হইতে হইতে মৃদুস্বরে কহিল—একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিন, তারপর দেখা-শোনা ত হবেই মা!

সৌদামিনী বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলেন—আমরা যে এলাম গাড়ীর শব্দে জানতে ত পেরেচেন, এলেন না ত!

বিহারী এমন জেরায় পড়িবে আশা করে নাই, ম্লান হাসিয়া বলিল—আহা মা!—ওনার কি আজ মনের স্থিতি আছে? তুমিই বল? তাই ত বল্‌চি,—তোমরাও হাতে-মুখে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও। আমিও একবার দেখে আসি,—হয়ত এতক্ষণ মুখ গুঁজে একলাটি পড়ে কাঁদ্‌তেইচেন্! তা দেখ মা! একটা কথা তোমায় বলি, উনি শোকে-তাপে,—আর বয়সও ত একটু হয়েচে, খিট্‌খিটে মত হয়ে পড়েছেন, তোমায় যদি দুটো কথা বলেন, তুমি দুঃখ করো না মা।—যা বলবেন জবাব না দিয়ে সয়ে যেও, দুদিন পরে বুঝ্‌বে—যা বলেন, তা ওনার ভেতর থেকে বার হয় না!—আচ্ছা, এই নাও,—তোমার ঘরকন্না দেখে নাও।—ঐ দেখ কুয়াতলা, চৌবাচ্ছায় জল ধরা আছে, এইটে রান্নাঘর, কুলুপ লাগানোটা ভাঁড়ার, এটায় কাঠ-ঘুঁটে থাকে, বাকিগুলো খালি; মানুষ-জন ত নেই!

সৌদামিনী গায়ের মোটা চাদর খুলিয়া রাখিয়া হাত-পা ধুইবার জন্য উঠানে নামিলেন। মায়ের দেখাদেখি মেয়েও অনুসরণ করিল। বিহারী কাদামাখা জুতাজোড়া খুলিয়া ঘড়ার জলে পা ধুইয়া ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। নারী বিবর্জিত গৃহস্থালীতে দীর্ঘকাল ধরিয়া গৃহিণীর কার্য সে-ই করিয়া আসিতেছে, কাজেই পাকা গৃহিণীর যা-কিছু গুণপনা পুরা-দস্তুর আয়ত্ত হইয়াছিল। কাচা কাপড়ে এক ঘটি গঙ্গাজলে খানিকটা মিছরি ভিজাইয়া দিল, একপাশে কুশাসন

পাতিয়া পিতলের চুম্‌কি ঘটিতে গঙ্গাজল ঢালিয়া আহ্নিকের স্থান করিল। চালের জালার মধ্যে একটা আধাপাকা পেঁপে মাত্র সম্বল—কাটিয়া একটা রেকাবে রাখিতেছে, স্নান সারিয়া সৌদামিনী ভিজা কাপড় হাতে দ্বারের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাপড় কোথায় মেলে দিই,—বেহারী মামা ?

—ঐ যে মা, ঐ উত্তর-ধারের রকে দুটো যে বাঁশ দেওয়া রয়েচে—বলিতে বলিতে বিহারী উঠিয়া আসিয়া কথিত স্থান দেখাইয়া দিল। —নাও চট করে আহ্নিক সেরে মুখে একটু জল দাও। বেলা কি আর আছে!—কই দিদি-ঠাকরুণ কোথা? আয় না বোন্! তুই আর কেন দেরি করচিস্! তেষ্টা পায় নি? নে একটু সরবত খা।

অপর্ণা বিহারীর হস্তস্থিত সরবতের পাত্র গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ করিতেছে দেখিয়া জননী বিহারীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন—বেহারীমামাকে লজ্জা করতে হবে না অপি! বেহারী মামা আমার মায়ের সহোদর ভাই—সত্যি কারেরই—মামা। মা আমার বেহারী বলতে অজ্ঞান হতেন! মায়ের মুখেই শুনেচি—একটু একটু মনেও পড়ে,—ছোটবেলা বেহারী মামা আমায় কত যে আদর করত! আমি বড় জেদী আর আবদারে ছিলাম,—সকল আবদার সইতো আমার বেহারী মামা। সৌদামিনী সহসা থামিয়া দৃষ্টি নামাইলেন এবং দীর্ঘ একটা শ্বাস মোচনপূর্বক ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। পূর্ব-স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিলে কি আজ রক্ষা আছে!

পূজা আহ্নিক জলযোগে বেলা শেষ হইয়া আসিল। রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়া রাঁধিবার জন্য বিহারী যথেষ্ট জিদ্ করিল, সৌদামিনী এ অবেলায় রন্ধন করিতে স্বীকার পাইলেন না—অপি তোমাদের সঙ্গে রাত্রে খাবে, আমার এই খুব হয়ে গেল।

বিহারী খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কহিল—একি হলো মা! কিছুই ত ছিল না,—এমন জানলে না হয় কিছু মিষ্টি-টিষ্টি কিনেই আনতাম।

সৌদামিনী হাসিলেন—এই কি আজকাল সবদিন জোটে নাকি? এ আমার যথেষ্ট হয়েচে। পেটে কি ক্ষিদের জোর আছে মামা? চিন্তায়

অভাবে তার উপর রোগে এখনও যে উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি, আমায় বাহাদুরী দাও !

বিহারী করুণ চক্ষে তাঁর শীর্ণ-পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। মুখখানা এককালে বোধ করি ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরী নম্রমুখী মেয়েটির মতই চোখ ভরিয়া দেখিবার সামগ্রীই ছিল। এখন ?—তা এখনও মুখ-ফিরানোর দরকার হয় না। এই ধরো, যেন ফুলটি বাসি হইয়া ঝরিবার প্রতীক্ষা করিতেছে, চাঁদ দিনের-আলোর উজ্জ্বলতায় ডোবো-ডোবো হইয়াছে। সে পুরানো লোক, রক্তসম্বন্ধে সংযুক্ত না থাকিলেও ভক্তি-ভালবাসার সম্বন্ধে সে এ সংসারে চির-সম্বদ্ধ। এতটুকু বেলায় মাতৃহীন পিতৃত্যক্ত হইয়া রাধিকাপ্রসন্নের স্নেহশীলা পত্নীর নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সেই পর্যন্ত ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর এই ক্ষুদ্র সংসারটির সঙ্গে তার ঘটনা বিরল একটানা জীবনের স্রোত একত্রিত হইয়া আছে। এর বিপক্ষে উভয় পক্ষ হইতে কোন ফাঁক পড়ে নাই। নিরাত্মীয় বিহারী আত্মীয়জন-বঞ্চিত রাধিকাপ্রসন্নর একক অবলম্বন। তাই সেই রাধিকাপ্রসন্নের অবিচার-দণ্ডে চির-দণ্ডিতা শোকের ও অভাবের কঠোর পীড়নে নিষ্পেষিতা সৌদামিনীর জরা-জর্জরিত মুখের পানে চাহিয়া চোখের জল রোধ করিতে পারা তার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। তার গলার স্বরটুকুতেও কি যেন বিরাট রিক্ততা ও মর্মভেদী দুঃখ-কাহিনী জড়াইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—কর্তার কাছ থেকে একবারটি হয়ে আসি—তার পরে তোমাদিগে নিয়ে যাব। পান মসলার তো পাট নেই, ঐ কুলুঙ্গিতে হত্তকি আছে, তাই দুখান কেটে নাও তো দিদি! ওবেলা বাজার থেকে পানের সাজ-টাজ সব কিনে এনে দেবো।

বিহারী চলিয়া গেলে মার কাছে সরিয়া আসিয়া অপর্ণা কহিল—লোকটি বড্ড ভাল—না, মা ?

—খুব—বলিয়া সৌদামিনী চুপ করিয়া রহিলেন। অপর্ণা আবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তখনি বুঝিতে পারিল মা তার নিঃশব্দে বড় কান্নাই কাঁদিতেছেন! কিছু না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

কর্তার ঘরে তাঁহার সাড়াশব্দ না পাইয়া বিহারী ভয়ে ভয়ে গিয়াছিল। না জানি, তাঁহাকে কি অবস্থায়ই দেখিবে! কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—কর্তা মেঝের মাদুরে বসিয়া তেজারতির খাতাপত্র খুলিয়া যথাপূর্বই চশমা চোখে হিসাব কষিতেছেন। বিহারীর নিঃশব্দ গৃহ-প্রবেশ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; কলম চালান ঠিক রাখিয়া খাতা হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিয়া উঠিলেন—কি হে? বেহারীবাবুর যে আজকাল টিকি দেখা যায় না!

বিহারী খোঁচা খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, নিরুত্তরে বসিয়া পড়িয়া ঝুঁকিয়া খাতাটার পাতাখানা দেখিবার চেষ্টা করিতে করিতে সসঙ্কোচে কহিল—আপনি বলে দিন, আমি লিখে ফেলি—হাত বাড়াইয়া খাতাখানা লইতে গেল। অস্পৃশ্য জাতি ঠাকুর পূজার উপকরণ স্পর্শ করিতে গেলে মানুষ যেমন হাঁ-হাঁ করিয়া বাধা দেয়, তেমনি করিয়াই মনিব মহাশয় খাতা সরাইয়া ফেলিলেন। শ্লেষের সহিত কহিলেন—আহাহা! কর কি! কর কি! যাও—যাও, তোমার নিজের ভাল ভাল কাজ করগে। আমার কাউকে দরকার নেই, নিজেই আমি পারবো।

বিহারী অপ্রতিভভাবে হাত সরাইয়া লইল। কর্তা খাগের কলমের উপর জোর দিয়া গড় গড় করিয়া লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। কোনদিকে চোখ-কান দিবার অবসর নাই।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিল। সহিষ্ণু বিহারী সৌদামিনীর উৎকণ্ঠা বুঝিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছে, এমন সময় কর্মব্যস্ত রাধিকাপ্রসন্ন বারেকের জন্য কাজ থামাইয়া চশমাটা খুলিয়া কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে চোখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তার পর! বেহারী চন্দর!—বসে রয়েছেন কি মনে করে?

বিহারী একটু নড়িয়া চড়িয়া ঢোক গিলিয়া উত্তর দিল—এই—রইচি—

কর্তা কাপড় দিয়া জোরে জোরে চশমার কাচ ঘষিতেছিলেন। খালি চোখ তাহার দিকে বিস্তৃত করিয়া কহিয়া উঠিলেন—সেটা আমি দেখতেই পাচ্ছি! মশা-মাছিটি নও যে তোমায় দেখা যাচ্ছে না। বলি, কাজকর্ম কি

নেই কিছু? কাল থেকে ত উপোসের বিধান দিয়ে হাওয়া খেতে যাওয়া হয়েছিল, আজও কি কর্তার ওপাড়ায় বামুন-ভোজনের নেমন্তন্ন আছে নাকি! রাঁধা-বাড়ার চাড়্‌টি নেই!

এ সব নূতন কথা নয়! মনিব-ভৃত্যের সম্ভাষণের বাঁধা গৎ। বিহারী মৃদুস্বরে কহিল—কাল পলাশডাঙ্গা গেছ্‌লাম কিনা!

—তবে আর কি—চতুর্ভুর্জ হয়ে গেছি! সেখানে শ্বশুরঘর কেড়েচ না কি? কই, এতদিন ত পলাশডাঙ্গা ছেড়ে ব্রহ্মডাঙ্গায় ত কখন যেতে শুনি নি!

বিহারী সুযোগ বুঝিয়া মরিয়ার মত বলিয়া ফেলিল—আজ্ঞে, মাঠাকুরুণ সেখানে ছিলেন ত! তা পরশু তাঁর চিঠিখানা পড়ে মনে বড্ডই কষ্ট হল—তাই আপনার অনুমতি না নিয়েই চলে গেছলাম। অপরাধ হয়ে থাকলে—

—হ্যাঁ,—হ্যাঁ, ক্ষ্যামা করেন—গালে সাতটা চড় মেরে—ক্ষ্যামা-প্রার্থনায় আর কাজ নেই! আমি কে কোথাকার একটা হাড়-হাবাতে বুড়ো, একপাশে পড়ে আছি,—আমার অনুমতি কেনই বা নিতে যাবে! যা প্রাণ চায় করগে,—আমি—আমি কি কারো হাত পা বেঁধে রেখেচি?

বিহারী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবেগের সহিত হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মার আমার দেহে কিছুই আর বাকি নেই,—মাত্তর হাড়ের বোঝাখানি! সেখানে ওনার কষ্টের পরিসীমা ছিল না!—আর কিছুদিন থাকলেই—জন্মের শোধ আক্ষেপ থেকে যেত।

রাধিকাপ্রসন্ন বিকৃত মুখে চেঁচাইয়া উঠিলেন—হ্যাঁগো হ্যাঁ!—থেকে যেত,—সবই অমন থেকেই যায়! তা এই মা-টি তোমার কি রকম সম্পর্কের মা হন? নিজের মাকে ত কোন্ সত্যকালে খেয়ে বসে আছ! কি জাতের মেয়ে—সৃষ্টি ছুঁয়ে ত এক করলে?—শাশুড়ী নাকি?

বিহারী ধীর কণ্ঠে কহিল—আমার সৌদামিনী মা—মুখ্য কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

—অ্যাঁ!—সে কি?—সেই দেমাকে-মাগীটে আমার বাড়ী চড়াও হয়ে কোঁদল কর্তে এয়েছে নাকি? বার করে দাও, বার করে দাও—

বিহারী ত্রস্তে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল ; যদি সৌদামিনী এদিকে আসিয়া থাকেন, যদি এই নির্মম মন্তব্য শুনিতে পান। আহা! দুঃখিনী যে বড় জ্বালা সহিয়া, একমুঠা ভাতের আশায় আসিয়াছে। আর কথা কওয়া সঙ্গত নয় বুঝিয়া সে উঠিয়া পড়িল এবং নিঃশব্দেই প্রস্থানোদ্যত হইল। পিছু ডাক আসিল—ওহে লাট্! খট্ মট্ করে যে চললে কোথায়,—শোনই না কথাটা, বলি, মাঠাকৃরুণের পাদোদক খেলে ত তোমার মতন ক্ষিদে যাবে না—রান্না হবে—না চিঁড়ে ভেজাব ?

বিহারী ফিরিয়া কহিল—আজ্ঞে মাঠাক্রুণ এতক্ষণে হয়ত রান্না চড়িয়েই দেছেন।

—অ্যাঁ! বলিস্ কি! কোত্থেকে একটা স্‌ঁট্‌কি মাগীকে ধরে নে এলি—কে তার জাত-জন্মের খবর রাখে তারই ঠিক নেই,—দুম্ করে এসে হেঁসেলে গিয়ে হাঁড়ি চড়ালেন! আবার এদিকে বিনিয়ে বিনিয়ে বলা হচ্ছিল—দেহে তাঁর কিছু নেই,—হাড়ের বোঝাখানি!—সব জোচ্চুরি! সব জোচ্চুরি! আমি কি আর ওসব ভাঁওতা বুঝি নে।—হুঁঃ—আমার সঙ্গে চালাকি চালাতে এসেছ তুমি! বেহারীবাবু তুমি বেড়াও ডালে ডালে ত আমি বেড়াই পাতায় পাতায়! চল, কোথায় তোমার সেই রাণীঠাক্রুণ—না,—মাঠাকরুণ—না বিবিঠাকৃরুণ—গরীবের কুঁড়ে পবিত্র করতে এসেছেন—দেখেই আসি। আমার মত ছোটলোকের বাড়ী যখন দয়া করে পায়ের ধুলো দেছেন, গলায় বস্তর দিয়ে অভ্যর্থনা কর্‌তে হবে ত তাঁকে। ভাল এক আপদ এনে জোটালে তুমি বেহারী! অতি নিমকহারাম বদমায়েস তুমি! এতদিন ধরে যে ভাত-কাপড়ে পুষলাম তোমায়, আমার দিকে তোমার এতটুকু টান নেই। যেমন কাল!

সৌদামিনী কোন মতে উদ্বেলিত অশ্রুস্রোত ঠেলিয়া রাখিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই মাতামহ দুই পদ পিছাইয়া গিয়া কহিয়া উঠিলেন—থাক্—থাক্—গরু মেরে আর জুতো দান করতে হবে না। আগা-পাস্তলা জুতিয়ে দিয়ে ভক্তি দেখানো হচ্ছে! কেমন বাপের বেটি, হবে না! বাপ-ব্যাটা যে অতি ইতর ছিল।

সৌদামিনীর অর্ধাবনত মস্তক আর নামিল না। ক্ষণকাল তদবস্থায় থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—আপনার দোরে ভিক্ষা চাইতে এয়েছি, আমায় যত খুসী গাল দিন, আমার মরা বাপকে কিজন্যে গালিগালাজ করবেন।—পথের ভিখিরীর সঙ্গেও কি এই রকমই ব্যাভার করেন?

—না, করি নে, কেন করব? তাদের বাপরা কি ঐ রকম পাজী, ছুঁচো, নেমকহারাম, বেইমান—যে করব? তারা দুঃখী হতে পারে, ছোটলোক নয়।

সৌদামিনীর নাসারন্ধ্র স্ফীত ও অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল, কষ্টে কহিলেন—কেন তাঁকে অকথা-কুকথা বলচেন? মনে অবশ্য ভালই জানেন, তিনিও ছোটলোক ছিলেন না।

—নাঃ—ছিলেন না! ছোটলোককে ছোটলোক বললে কুকথা বলা হয়? বেহারী বদমায়েসটাকে যদি তালপাতার সেপাই বলি, তোমায় যদি শুট্‌কি মাগী বলি, সেটা গাল হবে? বাড়ী বয়ে এসে কোঁদলই করবে? দুটো খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে ধুক্‌-ধুকে প্রাণটুকু ধরে রাখবার চেষ্টা করলে হতো না? আমি বাপু ঘটা-পটা করে মেয়ের চতুর্থীর জোগাড় করে দেবো, তা স্বপ্নেও ভেবো না। যাও—যাও—শুয়ে পড়গে। পা দুটো যা কাঁপচে, আছড়ে পড়ে কাঁধে করাবে না কি? যত সব বদ্‌মায়েসের কাণ্ড! সেই এলিই যদি মরতে, প্রাণটা ঠোঁটের আগায় করে এলি কেন?—রামচন্দ্র!—রামচন্দ্র!

৩

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই বিহারীর সাড়া পাওয়া গেল। সে ঝিকে ডাকিয়া নূতন কার্যাবলীর উপদেশ দিতেছিল এবং তদুত্তরে মুখ বাঁকাইয়া ঝি বলিতেছিল—তোমরা অন্য নোক দেখ গা,—আমার দ্বারা অ্যাত নোকের অ্যাত কাজ হবে নি, এই কয়ে দিনু!

সৌদামিনীকে আসিতে দেখিয়া দুজনেই থামিয়া গেল।

বিহারী মুখে একটু হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—ঘুম-টুম হয়েছিল মা? অসুবিধা হয় নি?

পাছে ঝির কথা কানে গিয়া সৌদামিনীকে দুঃখিত করিয়া থাকে, তাই সে তাহাকে অন্যমনা করিবার চেষ্টায় অবান্তর কথা পাড়িল। সে জানিত সৌদামিনী যে অবস্থা হইতে আসিয়াছেন, এখানে তাঁর কষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। সৌদামিনী ঘাড় নাড়িয়া প্রশ্নোত্তর সাঙ্গ করিলেন, কি ভাবিয়া বলিলেন—অসুবিধা কিসের হবে বেহারী মামা? তুমি কত যত্নই যে করচো,—এত কে কবে করেছে!

বিহারী এ প্রশংসায় আকর্ণ রক্তিম হইয়া মুখ নত করিল। —আমি আর কি করতে পারলাম ছোট মা! এতদিন যদি একটু খবর পেতাম।

সৌদামিনীর চোখ ভরিয়া জল আসিল, চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, —এতই বা কে কার জন্যে কবে মামা? আপনজনই দীন-দুঃখী দেখলে মুখ ফিরোয়, তোমার আর কিসের টান বলো।

বিহারী সজল নেত্রে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল—কৃতজ্ঞতার টান বড় টান মা। যে অন্ন শরীরে গিয়ে রক্ত হয় এ যে তারই টান।

সৌদামিনী নীরব রহিলেন, তাঁর মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার আলোড়ন উপস্থিত হইয়া দুর্বল হৃদতন্ত্রীগুলিকে সবেগে স্পন্দিত করিতেছিল। এই অবসরে শতমুখী-হস্তা বামা ঝি তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ পূর্বক সবিস্ময়ে মন্তব্য করিল—হ্যাঁগা, ভদ্দর নোকের ঘরে এমন কাঁটাসার চেহারা কেন গা তোমার? গরীব দুঃখীর ঘরেই তো জানি খাওয়া পরার দুঃখে মান্ষে এমনি কেঁকালসার হয়ে যায়!

শুনিয়া সৌদামিনী ঈষৎ হাসিলেন। বিহারী কম্পিতস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল —তো-তো-তো মাগীর সে খবরে দরকার কি য়্যা? তুতু তুই কাজ করতে পারিস কর, না পারিস্ চলে যা,—আমি অন্য লোক নে আস্‌চি।

—ও মা গোঃ! এরা বাপ বললে শালা বলে! মানারী গোরা নাকি! —বলিতে বলিতে সম্মার্জনী আস্ফালনপূর্বক ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল। বোধ করি কৌতূহলই তাহাকে প্রস্থিত হইতে দিল না।

সৌদামিনী বলিলেন—আমাদের এবার পলাশডাঙ্গায় রেখে আস্‌বে চলো বিহারী মামা!—না মামা, দাদাবাবুর অপছন্দয় আমি জোর করে তাঁর বাড়ী বেদখল করতে চাই নে। এখন ত তোমার সঙ্গে চেনা শোনা হলো, মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও তুমি আমাদের খোঁজখবরটা নিও। এক ভাবনা অপির জন্যেই—তা ওর কপালে যা লেখা আছে তাই হবে।

অপর্ণা স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্রে রোয়াকে উঠিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল—কার খোঁজ নিয়ে আসবে মা?

উত্তর শুনিয়া তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ হাস্যে বিকশিত হইল, সে তাচ্ছিল্যে কহিয়া উঠিল—ইস্ তাই আমরা গেলাম তো! তোমার দাদাবাবুকে তুমি চেনো নি মা। আমি ওঁর ধাত একবার দেখেই বুঝে নিয়েচি। মুখে উনি যত মন্দ, মনে তত নন!

সৌদামিনীর দৃঢ় আপত্তিতে বিহারী কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। এবার তার সপক্ষ পাইয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—ঐ দেখ! আমিও ত এই কথাই বলেছি মা। দুদিন থাক—তখন বলো যে, হ্যাঁ—বেহারির কথাই ঠিক!

সৌদামিনী নিজের দিক দুর্বল দেখিয়া অগত্যা পরাভব মানিলেন। মৃদু কণ্ঠে কহিলেন—কি জান মামা, আমার এই জ্বালাপোড়ার শরীরে কিছুই বরদাস্ত করতে পারি নে। মনে হয় যেন নির্ঝঞ্ঝাটে উপোস দেওয়াও ভাল।

অপর্ণা সগর্বে গ্রীবাভঙ্গীর সহিত মাথা নাড়িল—ঝঞ্ঝাট আবার কিসের? কেমন করে উনি আমাদের বিদায় করেন, সে আমি দেখচি! যা—বললেই অমনি যাওয়া পড়ে রয়েচে! সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে পূজা করগে।

বিহারী সায় দিল—ঠিক বলেচ দিদিমণি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কি মনে করেচ মা, কর্তামশাই এখন আবার তোমায় ছেড়েই দেবেন?—না মা, তুমি ওঁকে চেনো না—তাই এমন কথাটা ভাবচো। সেই থেকে পৃথিবীর উপর চিত্তির জ্বলে আছে, নৈলে—জান্‌লে মা,—ভিতরটা ওঁনার বড্ড সরেস!

কিছু মনে করো না মা!—ধর্তে গেলে এ ক্ষেত্রে ওঁর চাইতে তানাদেরই ত অপরাধটা বেশী।

উপর হইতে ডাক আসিল—বলি, ও বাদ্শা বাহাদুর! আ মলো! নেশা করতেছ! নেমকহারাম ব্যাটার সাড়া নাই কেন? মরেচে নাকি!

অপর্ণা হাসিয়া উঠিল—ঐ শোন।—বেহারিদার শুভ সম্ভাষণ আরম্ভ হয়েছে!—আহা যাও, যাও—

বিহারী ত্রস্তে ব্যস্তে যাইতে যাইতে বলিল—তুইও বাদ পড়বি নে দিদি, তোরও নৈবেদ্যি তোলা রয়েচে।—বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

কাপড়খানা বাঁশের উপর মেলিতে মেলিতে অপর্ণা কহিল—বেহারিদাদা খুব মজায় থাকে, না, মা?

মা এবার হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর করিলেন—খুব! আমি কিছুদিন এই রকম মজায় থাকলে, পাগল হয়ে যেতাম।

—না মা, তা হতে না। দেখচো ত—বেহারিদার মাথা অনেকের চাইতে ঠাণ্ডা, তোমারও থাক্তো—এই বলিয়া সে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া বঁটি ও তরকারির চাঙ্গারি বাহির করিয়া আনিল। বলিল—তুমি দেরি করো না, যাও। উনুন ধরলে আমি রান্না চাপাচ্চি। রাত্রেই হাঁড়িকুড়ি সব বার করে দিয়েছি। বগ্‌নোয় রাঁধ্‌লে তোমারও হয়ে যাবে।

আহার কালে অপর্ণা পরিবেশন-পাত্র হস্তে দাড়াইতেই গৃহস্বামীর দৃষ্টি তার উপর পড়িল। তবে তিনি যে ইতিপূর্বে তাহাকে লক্ষ্য করেন নাই, এমনও মনে হয় না,—তথাপি তাহাকে না চেনার ভান করিয়া কহিয়া উঠিলেন—এ রাঁধুনীকে আবার কোথেকে জোটালি? হ্যাঁ বেহারি! ওর ভর্তি-তারিখ খাতায় দেখলাম না! মাইনে ঠিক করিচিস? না, কি?

বিহারী অদূরে দাঁড়াইয়া হাতের কোষে তৈল লইয়া গায়ে মাখিতেছিল, সভয়ে দ্বারের অন্তরালে অর্ধাবরিতা সৌদামিনীর দিকে চাহিল। অপর্ণা তিল পিঠালির বেগুনভাজা পাতের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—মাইনে এখনও ঠিক হয় নি,—কত দেবেন বলুন না!

রাধিকাপ্রসন্ন ঘাড় তুলিয়া ভাল করিয়া মেয়েটির দিকে চাহিলেন—মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল; কহিলেন—আমার পুরণো রাঁধুনীর তোলা চার টাকা মাইনে ছিল। দিনে-রেতের লোক আমি রাখি নে, ওতে বড্ড খরচা। তুমিও তাই পাবে।

অপর্ণা কহিল—কাজ বুঝে দাম দেবেন। আপনার সে রাঁধুনী কি এই রকম রাঁধতে পারত?—রান্নাটা কেমন লাগছে?

বস্তুতঃ এ মেয়ের এ জাঁকটুকু করিবার অধিকার ছিল। অত অল্পবয়সে এমন পাকা রাঁধুনীর মত রান্নার হাত প্রায় দেখা যায় না। ভোজনকর্তা কচি আমড়ার অম্বল আস্বাদ করিয়া বলিলেন—যাচ্ছেতাই! যাচ্ছেতাই! মুখে দেওয়া যায় না!—

—পাতে কিছুই পড়ে রইলোও না তো কই?

—হুঁ পড়ে থাকলে নিত্যি-উপোসের পালাও পড়ে যাবে যে।—তুমি যে হঠাৎ বিদেয় হবে, তার লক্ষণ তো দেখছি নে।

অপর্ণা সংক্ষেপে উত্তর দিল—ঠিক ধরেছেন।

সৌদামিনী এতক্ষণ কোনমতে চুপ করিয়া এই বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন, 'বিদায়ে'র কথাটা কর্ণগোচর হইতেই তাঁর অন্তরের সন্তপ্ত অভিমান উথলাইয়া উঠিল। তিনি ত্রস্তে বলিয়া উঠিলেন—ও আমার মেয়ে অপর্ণা, দাদাবাবু!

—তোমার মেয়ে?—অন্নপূর্ণা?—কেমন করে জানবো বাবু? তুমি একটা ঠেলামারা পেরণাম করেছিলে বটে, আর কেউ ত কই উঁকিটিও পাড়েন নি? কি করে জানবো কোন বাদশাজাদী আমার কুঁড়েয় পা দিয়ে কৃতার্থ করতে এয়েছেন!

অপর্ণার এখানে কাজ ছিল না। কিন্তু কোন্দলের প্রবল স্পৃহা মনে ছিল, তাই সে ব্যঞ্জন-পাত্র হস্তে খাড়াই আছে। খপ করিয়া জবাব দিল—বাব্বা মায়ের প্রণামের প্রত্যক্ষ ফল দেখে এগোতে আর সাহস হয় নি। মায়ের চৌদ্দপুরুষ তো ভালরকমই অভ্যর্থনা পেলেন, কি জানি, আমি হয়ত ধনঞ্জয়ই পেয়ে বসবো।

রাধিকাপ্রসন্ন এই মুখরা বালিকার কাছে নিজেকে হতমান বোধ করিতেছিলেন, পথ পাইয়া নবোৎসাহে গর্জিয়া উঠিলেন—তোমার মায়ের বাপকে গাল দেব না? দুশো বার দেব—পাঁচশো বার দেব।

অপর্ণা কহিল—আমিও ত মাকে তাই বলি,—দিলেনই বা,—ওঁর নিজের সন্তানদের গালিগালাজ করে উনি যদি একটু স্বস্তি পান, তোমার ক্ষতি কিসের?

—বটে! স্বস্তি পাই!—এবার যেন বৃদ্ধের চির-উড্ডীয়মান বিজয়-বৈজয়ন্তী নত হইয়া পড়িল, পরাস্তভাবে সৌদামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—দামিনী! তোর এমন ব্যারিষ্টার-মেয়ে থাকতে তোর ভাবনা কিসের? গাউন কিনে দিলে কোর্টে গিয়ে এ মেয়ে সওয়াল করতে পারে?

—বেশ তো, মার তো টাকা নেই—আপনিই কিনে দেবেন—প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া দ্রুতপদে সে রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধ যে তার কাছে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছেন এটুকু সে বুঝিয়া লইয়াছিল। মায়ের কালিকার আঘাতের প্রতিশোধ হইয়াছে বুঝিয়া প্রীত হইল। সে মনে মনে ভাবিল—যে দেবতার পূজার যে মন্ত্র!

রাধিকাপ্রসন্ন আচমন করিতে উঠিয়া গিয়াছেন; বিহারী স্নানার্থ গামছা-কাপড় হাতে নদী গিয়াছে সৌদামিনী কিছুই জানিতে পারেন নাই। যে নামে মাতামহ তাঁকে সম্বোধন করিয়াছেন, সেই চঞ্চলা এই ছুতায় শরীরে ঢুকিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া একাকার করিতেছিল! 'দামিনী!', 'তোর!'—এমন দুটি স্নেহের ভাষা শুনিলে কি আর বুকের কান্না চাপিয়া রাখা যায়? তিনি দেওয়ালে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! মাতামহের বিরক্তির ভয়ও আর সে মর্মবিদারী ক্রন্দনবেগ রোধ করিতে পারিল না। রাধিকাপ্রসন্ন গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ তাঁর সেই অর্ধ-ব্যক্ত যন্ত্রণা-রোদন নীরবে দর্শন করিবার পর আরও একটু সরিয়া আসিয়া ডাকিলেন—দিদি!

—দাদাবাবু!

—চুপ কর, কি করবি দিদি! কপাল বড় মন্দ—দৈব বড় প্রবল, নৈলে কি এমন হয় রে?

সৌদামিনী এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া কহিলেন—দাদাবাবু! বড় কষ্ট, বড় কষ্ট—আমার কত কষ্ট কেউ জানে না!

—জানে ভাই!—জানে বই কি! সব্বাই ওই কথাই মনে করে দিদি! নিজের দুঃখটা এ সংসারে কে না বড় করে দেখে। তুমি ভাব তোমার দুঃখই সবার চাইতে বড়, আমি ভাবি আমার,—ঐ রে! তোর কৌঁসুলী মেয়ে আসছে!—অতি বদমাস ঐ মেয়েটা, একরত্তি মেয়ে,—মুখের কাছে দাঁড়ায় কে? পালাই বাবা!

৪

সৌদামিনী তাঁদের পলাশডাঙ্গায় রাখিয়া আসিবার কথা মধ্যে মধ্যে তুলিলেও তেমন যেন জোর ছিল না, বিহারী—দরকার নেই মা—বলিয়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দিয়া তাঁর অনুরোধ খণ্ডন করিয়া যায়। অগত্যা সৌদামিনী মাতামহের বিশেষ অনুজ্ঞা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই গৃহে থাকাই স্থির করিয়া লইলেন। পাছে অপমানিত হইতে হয়, এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়াই রহিলেন। সংসারে যারা নিঃস্ব, মনের মধ্যে তাদেরই অভিমান। ভয় পাছে কেহ দয়া-ভিখারী বোধে ঘৃণার হাসি হাসে।

সৌদামিনীর মন সংসারচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে বড় বেশী নিষ্পেষিত, তাই বিচার-শক্তি তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিল না। আজন্ম দেবতা ও মানুষের অবিচারের মধ্যে বর্ধিত বলিয়া জগতের কাহাকেও অথবা জগদতীত কোন কিছুতেই তাঁর যথেষ্ট বিশ্বাস নাই। শুধু অবিশ্বাসই নয়, একটা তীব্র অভিমান আছে এবং সহজেই সেটা জাগিয়া উঠে। মাতামহের অবিচার তাঁর চক্ষে ভাগ্য-বিধাতার অবিচারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।—কপালকে দোষী করিয়া বরং দৈবকে মার্জনা করা যায়, কিন্তু একগুঁয়েমীর অগ্নিকুণ্ডে স্নেহ-প্রেম-ক্ষমা-করুণার আহুতি

দানকারী—স্বাভাবিক মানবত্ব বর্জন কি ক্ষমার যোগ্য ?—যে পিতৃহৃদয়ের অতুলনীয় বাৎসল্য জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ,—মানুষের অন্তর-বৃত্তির প্রধান অহঙ্কার —যে সম্বন্ধের অপেক্ষা অপর কোন বড় সম্পর্ক খুঁজিয়া না পাইয়া মানুষ স্রষ্টাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, সেই পিতৃ-সম্বন্ধ তুচ্ছ অভিমানের আঘাতে জন্মের মত গুঁড়া হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়! যে মানুষ নিজের সন্তানকে এমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারে সে পারে না কি? সৌদামিনী যতদিন দুঃখের চরম সীমায় না পৌঁছিয়াছিলেন ততদিন এই অস্বাভাবিক পরমাত্মীয়ের নিকট কোন সাহায্যই প্রার্থনা করেন নাই। দুঃখের বোঝা, রোগের জ্বালা, শোকের ঝড়—সমস্ত বিপ্লবই একে একে এবং এক সঙ্গে মাথার উপর বহিয়া গিয়াছে, ঔষধ-পথ্য-বিহীন সন্তানের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে বসিয়া একখানি পত্র লিখিবার জন্য মন উন্মুখ হইয়াছে, কিন্তু লোভের সহিত যুদ্ধ করিয়াই নিজেকে নিবৃত্ত রাখিয়াছেন! তবে কেন যে প্রাণ-শোষক হৃদয়পাষাণকারী তীব্র অভিমানকে পরাজয় মানিতে হইল তাহা খুলিয়া বলিতে হয়—সৌদামিনীর অপদার্থ স্বামী একদিন মত্তাবস্থায় পথে পথে মারধোর করিয়া পুলিশ হাঙ্গামায় পড়ে এবং সেই উপলক্ষে যেখানে যা ছিল বেচিয়া তার কারাবাস ক্লেশ ঘুচাইবার পর গৃহহীনের গৃহে দারিদ্র্য পূর্ণমূর্তিতে প্রকট হয়। অখাদ্য খাইয়া, আধপেটা খাইয়া, না খাইয়া দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে যারা এতদিন যমের সহিত যুঝিতেছিল একে একে হার মানিল। মা-বাপ বহুপূর্বেই মেয়েটিকে হাত-পা না বাঁধিয়াই জলে ফেলিয়া দিয়া নিজেদের পথ দেখিয়াছিলেন।

সংসারে রহিল একমাত্র কন্যা—সকলের জ্যেষ্ঠা—যেটির জন্য কেবল দুটা ভাতের ভাবনা ভাবিলেই চলিবে না—সে অনূঢ়া মেয়ে। আর রহিলেন—দুষ্ক্রিয়ার অনুষঙ্গী বিবিধ জটিল রোগে বিক্ষত-শরীর উচ্ছৃঙ্খল স্বামী—এবং শোক দুঃখের জ্বালায় বিব্রত ভবিষ্যতের বিভীষিকায় আতঙ্কিতা তিনি স্বয়ং।

এতগুলি ভাইবোনের রুগ্ন দেহ ও স্বল্প জীবনের সংস্পর্শে থাকিয়াও এ মেয়ে তাদের ছোঁয়াচ পায় নাই! সুন্দর শক্ত শরীর এবং বোধ করি অখণ্ড আয়ু লাভ করিয়া সে পৃথিবীতে আসিয়াছিল। তা যখন রহিলই—অপগত-

গুলির মত রোগে ভুগিয়া থাকিলেও না হয়, হয়,—তাও না! অনাদৃতা অভাগা মেয়েটা বর্ষার নদীর মত ডুলিয়া ডুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল! শিরা-সঙ্কুল হাত ডুখানা যেন মন্ত্রবলে সুগোল হইয়া উঠিল। তৈলাভাবকে উপহাস করিয়া খাটো চুল আগুল্‌ফলম্বিত মেঘজাল সুচিক্কণ হইল—এক কথায় সর্বশরীর পরিপূর্ণ হইয়া একটি বসন্ত অপরাহ্লের আপ্রান্ত কুসুমাকীর্ণা নবীনা বল্লরীর শোভা ধারণ করিল। খাটো মোটা সেলাইকরা শাড়ী সে দেহের পূর্ণ সৌন্দর্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। ছাইচাপা আগুনের মত ভিতর হইতে দীপ্ত-স্ফুলিঙ্গ লোকলোচনে প্রকটিত হইতে চায়। দিনের আলোকে চাপা দিতে মেঘের সাধ্য হয় কি!

যতদিন যুঝিবার সাধ্য ছিল সৌদামিনী যুঝিয়াছেন। সামনের লাইনের সৈন্যদের যেমন সম্মুখে শত্রুর, পশ্চাতে সেনাপতির অস্ত্র উদ্যত থাকে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যুদ্ধ তাদের করিতেই হইবে, স্বামী বর্তমানে ভদ্রমহিলার সেইরূপ ছিল। ভরণ-ভার গ্রহণ করেন বলিয়া স্বামীর নাম ভর্তা, মন্ত্রে অনুষ্ঠানে এই ভারগ্রহণ-প্রতিজ্ঞা বরকে একাধিক বারই করিতে হয়। দুই বেলা দুমুঠা, নেহাৎ এক বেলা একমুঠা ভাত স্ত্রী-পুত্রকে দেয় না এমন অভাগা দুনিয়ায় কম। কিন্তু কুলীন-কন্যাদের কথা স্বতন্ত্র! কুলীন-পত্নী?—যে পদ সমাজের শ্রেষ্ঠ পদ হওয়া উচিত ছিল, তাঁদের কপালে সমাজ সেই 'কুলীন' সম্প্রদায়কে শিব না গড়িয়া যখন বানর গড়িয়া উঠিতে আপত্তি করিলেন না, তখন এঁরা এ দুর্ভাগ্য বহন না করিলে করিবে কে? কুলীন-কন্যাদের স্বামী ভর্তা হন না। স্থলবিশেষে সম্বন্ধ উল্টাইয়াও যায়। সৌদামিনীর এইরূপ ঘটিয়াছিল। স্বামী কুলীন সন্তান হইলেও এক-পত্নীক। সৌদামিনী যখন অর্ধাহারেও স্বামীর নেশার কড়ি উচিত মত যোগান দিতে অপারগ হইতেন, ভাবিয়াছেন, যদি আর দু-একটা সতীনও থাকিত!—যতদিন স্বামী বাঁচিয়া রহিল সৌদামিনী তাঁর খাইবার ভাত, পরনের কাপড়, আফিম, তামাক আরও কিছু কিছু কদভ্যাসের কড়ি যোগাইলেন, গাঁজার কলিকাটি সাজিয়া হাতে তুলিয়া দিলেন, মরিয়া গেলে শাঁখা খুলিয়া একাদশী করিতে লাগিলেন।

সেই শৃঙ্খল যখন চরণচ্যুত হইল, হুঁস হইল, এ পৃথিবীতে তাঁকে যত জনের সম্পর্কে আসিতে হইয়াছে সবার চাইতে এই মেয়েই তাঁর বেশী শক্র! বাঁচিল ত ছেলে না হইয়া মেয়ে হইল কেন? পেটের ভাত জুটে না, বিবাহ দিবেন কেমন করিয়া?

অপর্ণার সে ভাবনা ছিল না। গাছের উপর ফুলে-ভরা আগাছার মত স্বচ্ছন্দ চিত্তে হাসিয়া খেলিয়া শুক্লপক্ষের শশিকলার মতই সে বাড়িতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া অপর্ণার মায়ের মনিব-গিন্নি সবিস্ময়ে বলেন, কি খেয়ে তোমার অপির এমন ছিরিখানি হচ্চে বামুনমেয়ে? আমার রাজলক্ষ্মী ভুবনমোহিনীকেও তাই নয় খাওয়াই!

সৌদামিনী এ অনুযোগে আনন্দের পরিবর্তে বিরক্তিপূর্ণ নেত্রে কন্যার অনাবশ্যক স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যভরা দেহ পানে তাকাইলেন, উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, কিছু না খেয়েই ওর এই ছিরি মা! তোমার মেয়েদের বেশি খাওয়া কমিয়ে দাও অমনিই হয়ত হবে।

একে মেয়ের প্রতি রাগ ধরিবার নানা কারণ বর্তমান, তার উপর তার জন্য পরের চাকরিতে বদ্ধ থাকিতে হইল, সৌদামিনী কোন ক্রমেই তাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিতেছিলেন না। কন্যাদায়ের মত দায় ঘাড়ে লইয়া কপর্দকহীনা বিধবা একা সংসার সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া—কুল কোথায়!

একদিন ইতিমধ্যে একটু পরিহাসের খেলাও বিধাতাপুরুষ খেলিয়া লইলেন। —তা এ রকম ছোটি-খাটো কৌতুক করিতে তাঁকে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় না, তা নয়, নহিলে সংসারটা একান্ত একঘেয়ে হইয়া উঠে!

মনিব-গিন্নির ভাইপো তাঁর সংসারে থাকিয়া পড়াশোনা করিতে দুইটা পাশের পর তিনটা পাশের পড়া পড়িতেছিল। ছেলেটির রূপগুণ এবং বিদ্যার বিষয় বিচারে সেটি অনাথাদের লুব্ধ দৃষ্টির বিষয় হওয়া উচিত ছিল না—ধনী কন্যার বাপেদের লক্ষ্য সে ছেলে, নিজেই না কি এ সম্বন্ধে অপরাধী। সে বামুন-পিসির অনুরোধে একটি 'গরীব' পাত্রের খোঁজ করা উপলক্ষে অনেকবার ইতস্ততঃ করিয়া হঠাৎ এক সময় গাঢ় রক্তবর্ণ মুখে ভূমিনতনেত্রে অর্ধস্ফুট

স্বরে বলিয়া ফেলে—আমিও তো গরীব বামুনপিসি, আমার চেয়ে গরীব আর আপনি কাকে পাবেন ?

কথাটার এমনই প্রলোভন—আর এতই তা অবিশ্বাস্য যে সৌদামিনী নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া আর একবার শুনিবার, শোনা জিনিষটাকে ধারণা করিবার জন্য নির্বাক বিস্ময়ে লজ্জারক্ত সেই মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ছেলেটির বিজড়িত ভাব লজ্জাভীত মুখচ্ছবি তাঁর অবিশ্বাস-কঠিন চিত্তেও সত্য প্রচার করিতে বিলম্ব করিল না। মুখ তার রাঙা হইলেও গোপন হর্ষোচ্ছ্বাসে তরুণ সূর্যের মত সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে না, কি, ও ? ঘৃণার্হ পরিহাসের স্থান-কল্পনা অসম্ভব! সৌদামিনী চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—তোমার মত গরীব আমার স্বপ্নের অতীত। অত আশা দেখিয়ো না বাবা ভবিষ্যতে মনস্তাপ পাবো। কারকুন, মুহুরি, জমিদারের গোমস্তা—এমনি দরের লোক ভিন্ন রাঁধুনী বামনীর মেয়েকে কে বিয়ে করবে ? তাই একটি দেখে শুনে দিও। কলকাতায় ত কত রকমের লোক আছে।

ছেলেটি নিজের ঘটকালি নিজে করিয়া ফেলিয়া, বড় বেশী লজ্জা পাইয়াছিল, কিন্তু এখন আর সরিয়া দাঁড়ান চলে না, মুখ না তুলিয়া মৃদুস্বরে কহিল—যে সম্প্রদায়ের কথা বলছেন, তার মধ্যে ভাল লোক দুষ্প্রাপ্য, সেখানে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে না দেওয়া ভাল। অযোগ্য যদি না ভাবেন, একটা বৎসর অপেক্ষা করুন আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি বিনা পণে বিয়ে করবো। আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম—

ছেলেটি থামিয়া গেল, না থামিলেও থামিতে বাধ্য হইত, সৌদামিনী তার কথার ভাবার্থ বুঝিয়া ব্যস্ত হইয়া বাধা দিলেন—না, না, হঠাৎ এত বড় একটা প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়! তোমার পিসিমা কি বলবেন—মনে করবেন আমি তোমায় ভজন দিয়ে এ কাজে নিইয়েছি। ছি ছি, ঘেন্না! না বাবা! অন্য পাত্র তুমি দেখে দিও—সেই তোমার ঢের করা হবে।

বলিতে বলিতে আত্মমর্যাদার উচ্চ পাহাড় ধসাইয়া অশ্রু প্রস্রবণ ছুটিয়া

আসিতে উদ্যত হইল। কে কি মনে করিবে কি বলিবে,—এ ভাবিয়া কোন মা কবে নিজ সন্তানের এত বড় অযাচিত সৌভাগ্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে যায়! এ যে জন্মদুঃখিনীর মেয়ের পক্ষে স্বপ্নেরও অতীত। অন্যে কিরূপে বুঝিবে? তবু এ সুধাপাত্র বুভুক্ষা-ব্যাকুল অধরে তুলিতে তাঁর সাধ্য নাই! এ বিবাহে প্রবল করুণাপরতন্ত্র এই বালকের প্রতি সুবিচার হইবে না, এ কথা সৌদামিনী জানিতেন। ছেলের পিসি তাঁরই রাঁধুনীর-মেয়েকে ঘরের বধূ করিতে সম্মত হইবেন না। নির্মলের নিজ-গৃহ? সেখানে প্রবলা বিমাতা, সপত্নী-সন্তানকেই স্থান দিতে নারাজ, বধূর জন্য বরণ-ডালা কে সাজাইবে? কিন্তু সেই অতর্কিত অভিব্যক্তির পর যখন তখন তরুণ প্রস্তাবকারীর সুকুমার মূর্তিখানি তাঁর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অন্ধকার চিত্তে আলোকাভাষ জাগাইয়া তুলিল। প্রত্যাখান করিয়া মুখ ফিরাইলেও সে কিন্তু বিমুখ হয় না। লোভাতুর চিত্ত বলে—কেন লইব না? চুরি করি নাই, নিজে সাধিয়া দিতে আসিতেছে, ফেরৎ দিব কেন?

কিন্তু এ 'কেন'র উত্তর খুঁজিয়া মিলে না! বাহিরের লোকেও এ 'কেন'র উত্তর দিতে অসমর্থ! যাহা পাইতে পারি সবই ভোগ করিতে পারি না।—প্রবৃত্তি হয় না কেন? আগ্রহ সত্ত্বেও মন সাগ্রহ হয় না কেন?—বুঝা কঠিন!

৫

দিন কাটিতে লাগিল। একদা ডাকের চিঠি বিলির পর গৃহিণীর উচ্চ-চীৎকারে বাড়ীর লোক ত্রস্ত হইয়া শুনিল তিনি ভ্রাতৃহীনা হইয়াছেন। এর দিন পনের বাদে একদিন সৌদামিনী একখানি চিঠি পাইয়া বিশেষ বিস্ময় বোধ করিলেন এবং নির্জনে গিয়া পত্র-পাঠান্তে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে চিঠিতে যে খবর ছিল, তাহা সুসংবাদ কি দুঃসংবাদ, তাও বুঝিতে পারিলেন না। সে খবর এই:

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

আমাদের দুর্ভাগ্যের সংবাদ আপনার অবিদিত নাই, কিন্তু সকল সংবাদ জানিতে পারা আপনার পক্ষে সম্ভব নহে ; সেজন্য যেটুকু আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করিয়াছি জানাইলাম। আমার পিতৃঋণ পর্বত-প্রমাণ! শোধ দিবার উপায় থাকিলে—আমরা বোধ করি সহসা পিতৃহীন হইতাম না। ছোট-মা ছেলে দুটিকে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। না গিয়া করিবেনই বা কি? বাড়ী বহুপূর্বেই বন্ধক রাখা হইয়াছিল, সুদে আসল ছাপাইয়া গিয়াছে। পাওনাদারে নিলাম করিয়া লইবে।

শেষ উপায় তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁর একমাত্র সুহৃদ বর্মায় থাকেন। আমার পিতাও অল্প বয়সে সেইখানে কাজ করিতে গিয়া অনেক টাকা উপার্জন করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁর বিশ্বাস—মৃত্যুকালেও দৃঢ় বিশ্বাস—একমাত্র তিনিই আমাকে এই বিপদ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ।

সেইখানেই চলিলাম। যদি এ বিপদে কূল পাই আবার ফিরিব। নহিলে—না, না পাইলেও ফিরিয়া আসিব। যাঁদের ঋণ শোধ আমার ক্ষমতার বহির্ভূত, তাঁরা আমার প্রতি যেরূপ বিধান করিবেন আমি মানিয়া লইব।

আশা যদি পূর্ণ হয়, যদি ঋণমুক্ত হইতে পারি, আপনি কি আমার দুরাশা পূর্ণ করিবেন না? আপনি 'পাত্রের' যে দর দিয়াছিলেন এখন তার চেয়ে বেশী দর তো আর আমার নাই! গৃহহীন অর্থহীন আশা-ভরসা বিহীন নিঃস্ব ভিখারীর চাইতে কোন মুহুরী কারকুন গোমস্তা ভাতরাঁধা রসুইদার—অধিকতর দারিদ্র্যের দাবী রাখে? ফিরিয়া আসিতে বোধ করি খুব বেশি দেরী না হইতেও পারে ; মনে হয় বৎসরাধিক হইবে না।

সৌদামিনী চিঠিখানি বারবার, পরে আরও কয়েকবার পাঠ করিলেন। তাঁর শীতল কঠিন অন্তরে কোথা হইতে একটা উত্তপ্ত স্নেহের তরল বাষ্প ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতে ছিল, অশ্রুবিস্মৃত শুষ্ক নেত্রে সহসা সুপ্রচুর উষ্ণ অশ্রু উথলিয়া উঠিতে উদ্যত হইল, সাবধানে চোখ মুছিয়া চিঠিখানি কাপড়ের বাক্সে সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিলেন। ভয়, সন্দেহ ও নূতন আরও একটা চিত্তবৃত্তি একত্রিত

হইয়া আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাত বিবর্জিত চিত্তকে তাঁর আলোড়িত করিতে থাকিল। সেটা, সেই অজ্ঞাত নূতন জিনিষটা হয়ত আনন্দ? বুঝি বা আশা।

কোনরূপ বিচার বিতর্ক মনের মধ্যে না তুলিয়া পরদিন চিঠিতে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল, সেই ঠিকানায় উত্তর দিলেন: একটি বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব। আমায় তুমি কি ভাবনা হতে যে উদ্ধার করিলে সে শুধু অন্তর্যামীই জানেন। নিশ্চয় সে পুণ্য তোমার ব্যর্থ হইবে না।

এর পর যে অপত্য স্নেহ-সমুদ্র অগস্ত্যগণ্ডূষরূপী নিরাশা শুষিয়া লইয়াছিল, এই তরুণ ভগীরথের সাহায্যে অবতীর্ণা আশা-জাহ্নবী সেই বিরাট শূন্যতাকে বেগবান স্রোতজলে ভরিয়া দিল। অপর্ণা সবিস্ময়ে সচকিতে দেখিল, রাত্রে বিছানার মধ্যে মা তাকে বুকে টানিয়া নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিলেন। সে নিজেও মায়ের সঙ্গে কারণবিহীন অশ্রুজলের বিনিময় করিয়া কোন সময় ঘুমাইয়া পড়িয়া চিরদিনের অনাবৃষ্টির পরের প্রবল-বর্ষণের হস্ত মুক্ত হইয়া বাঁচিল।

৬

এই পত্র লেখালেখির বৎসরাধিক পরে সৌদামিনী মাতামহগৃহে স্থান পাইয়াছিলেন! এ সময়কার ইতিহাস তাঁদের পক্ষ হইতে খুবই সংক্ষিপ্ত, এবং বোধ করি তাঁর সংগ্রামপূর্ণ জীবনে এর প্রথমাংশ যেমন স্বস্তির, শেষটা তেমনি নিরানন্দময়। যে তাঁকে আশাতীত আশা দিয়া প্রলুব্ধ করিয়াছিল, সংসারের সাধারণ পাঁচ-জনেরই একজন মাত্র সে! তার প্রতিজ্ঞা সে লঙ্ঘন করিল। আশাপূর্ণ চিত্তে তার জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে সেই আশা-তরুর মূল হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়তর হইয়া গিয়াছিল; সময় সময় সে তরুর শাখা-প্রশাখায় সামান্য রূপআন্দোলন ভিন্ন মূলে কখনও টান পড়ে নাই। মনিব-গৃহিণীর নিকট কদাচ তাঁর প্রবাসী ভ্রাতুষ্পুত্রের সংবাদ আসিত। সৌদামিনী যদিও ভরসা করিয়া কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নাই, তথাপি জানিয়াছিলেন পিতৃবন্ধু নির্মলকে ঋণমুক্ত করিয়া ঐখানেই চাকরী দিয়াছেন।

সৌদামিনী তখন মনে মনে বলিয়াছিলেন, ওগো কাঙ্গালের ঠাকুর! তুমি কি কাঙ্গালিনীর জীবনের একটি মাত্র প্রার্থনা না শুনে কখন থাকতে পার?

বৎসর পূর্ণ হইল। উদ্বিগ্ন প্রত্যাশায় দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছিল। এত বিলম্ব কেন? কেন, কোন সংবাদ আসিতেছে না? কবে আসিবে? কিসেরই বা এ বিলম্ব?—এমন সময় একদিন বাটীর গৃহিণী হাসি মুখে তাঁর পক্ষে যথাসম্ভব চঞ্চল চরণে, রান্নাঘরের দ্বারে আসিয়া সৌদামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—আর শুনেচ বামুন ঠাক্‌রুণ! আমাদের নিমুর যে বে!

সৌদামিনী স্কুলের ছেলেদের জন্য একটা চুল্লিতে ভাত চাপাইয়া অপরটাতে মাছ ভাজিতে ব্যস্ত ছিলেন। আর কাহারও মুখে অপর কোন নাম শুনিলে হয়ত তিনি কথায় কানও দিতেন না, কিন্তু একে ত তাঁর মত অধীনার পক্ষে গৃহিণীর মুখের অসার বাণীতেও একটুখানি শুকনো হাসিও টানিয়া আনা উচিত, তার উপর এ সংবাদে এমন দুঃসহ শব্দ ছিল, যাহা শব্দভেদী বাণের চেয়ে কোন অংশেই কম না। হাতের খুন্তি মাছের অঙ্গ স্পর্শ না করিয়া হাতেই স্থির রহিল। বিদ্যুৎ বেগে ফিরিয়া রন্ধনকারিণী উচ্চকণ্ঠে আর্তরব করিয়া উঠিলেন—কার—কার—কার বিয়ে?

গৃহিণী এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা লক্ষ্যই করিলেন না, তাঁর নিজের মন তখন সুসংবাদের আনন্দে আকণ্ঠ ভরিয়া ছিল। হাসিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—আমাদের নিমুর গো, নিমুর! স্পষ্ট করে কিছু লেখে নি; শুধু লিখেছে—বড্ড তাড়াতাড়ি তাই খবর দিতে পারি নি—সেই বন্ধুরই মেয়ে—তা এ একটা রাজ্যি জয় হলো বটে! আহা রে! যেমন ওর মা নেই,—বাপ নেই, তেমনি ভাল লোকের জামাই হলো। তোমরা সবাই মন খুলে আশীর্বাদ করো—বেঁচে থেকে বাছা আমার ভোগ করুক। ও আমার এখন রাজা—ও মা! ও কি গো! ও বামুন ঠাক্‌রুণ পড়ে গেলে না কি? হ্যাঁগা কথা কও না যে! ওরে ওখানে কে আছিস—দেখ, দেখ, বামুন ঠাক্‌রুণ হঠাৎ রাঁধতে রাঁধতে অমন হয়ে পড়লো কেন?

কারণ দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। বাড়ীর ছেলে যতীশ্বর ডাক্তারী

পড়ে। সে মূর্ছিতা সৌদামিনীর শরীর পরীক্ষা করিয়া মার দিকে চাহিয়া সহানুভূতির স্বরে কহিল—এই মানুষ তোমাদের এই যজ্ঞির রান্না বারমাস রাঁধছেন মা! এঁর শরীরে তো কিছুই নেই!

সারাদিন স্তব্ধ থাকিয়া রাত্রে সৌদামিনী একখানা পত্র লিখিয়া মেয়েকে বুকের মধ্যে টানিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন! মেয়ে ঘুমের ঘোরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া আবার ঘুমাইল। আজ তাঁর চোখে জল নাই বক্ষে দীর্ঘশ্বাসও ছিল না। নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি গভীর ক্লান্তি ও অবসাদের মধ্যে নিথর হইয়া কাটিল। দেহটার মত মনও পাথর হইয়া গিয়াছিল। যে জগতের কোন প্রাণীর নিকট কোনদিন সহানুভূতি পায় নাই, কোনখানেই যার দাবী ছিল না,—কিন্তু এতখানি দিয়া—-সে কি জবরদস্তি করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া—তারপর এমন করিয়া এত অকস্মাৎ কাড়িয়া লওয়া!—এ কি ধর্ম সহিবেন? সৌদামিনী যদিই বা ক্ষমা করিতে পারেন, উপরের জন, তিনিও কি এত বড় অবিচারক?

ডাক্তার-ছেলেটি নিজের মাকে বিশেষ ভয় দেখাইয়া দিন কয়েকের জন্য সৌদামিনীর আগুন তাতে যাওয়া বন্ধ করিল। নিজের খরচে ঔষধ-পত্র আনাইয়া দিল। উঠিয়া বসিবার সামর্থ্য নাই। এতদিন যে আশার বল ভগ্ন শরীর-মনকে বলীয়ান রাখিয়াছিল, সেটুক ঘুচিয়া যাইবার সঙ্গে প্রবলবেগে প্রত্যাকর্ষণ আরম্ভ হইল। অপর্ণা মায়ের সঙ্গে রাঁধিয়া রান্না ভালই শিখিয়াছিল। মায়ের সঙ্গে তিনভাগ রান্নাই ইদানীং সে রাঁধিত। এখন পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইল। তাহাতে তার আসিয়া যায় না। মা বলেন, কাজ না করিলে তাঁর কষ্ট হয়, তাই সে মাকে কাজ করিতে দেয়, নহিলে কাজ তার গায়ে লাগে নাকি? কর্মে নৈপুণ্য ও আনন্দ দুই-ই তার সমান।

অপর্ণা কচি বয়সে যখন পরের ঘরের ভাত রাঁধার সম্পূর্ণ ভার ঘাড়ে লইয়া তার মাকে মুক্তি দিল, সৌদামিনীর তখন সহ্য করিবার শক্তি আর রহিল না। মৃত্যুকামনা সেইদিনই তিনি সর্বান্তঃকরণে করিলেন। ইতঃপূর্বে দুঃখ তাঁর এমন অসহ্য হয় নাই। এর জন্য দায়ী মাঝখানে সেই সর্বনেশে

আশাটুকু! সে স্বাদ না পাইলে চিরসঙ্গী দুঃখকে আজ তাঁর এত অসহনীয় ঠেকিত না।

কিন্তু ঠেকিলে কি হইবে? সেদিন যে শক্তি তিনি মনিববাড়ীর রন্ধন-চুল্লীর সম্মুখে হারাইয়াছিলেন সে আর ফিরিল না। উঠিতে বসিতে হাত-পা কাঁপে—প্রত্যহ জ্বর হয়, শরীর দ্রুত ক্ষয় হইতে লাগিল। অপর্ণা দুইবেলাই রাঁধিয়া দিয়া আসে। কাজ ছাড়িলে দুটি প্রাণীর ত খাওয়া চলে না, অথচ ঐ বস্তুটি যে জীবনের মধ্যে অপরিহার্য।

যথাকালে পত্রোত্তর আসিল! সে পত্র কম্পিত হস্তে খুলিয়া জ্বর-জ্বালা-পূর্ণ নেত্র বারে বারেই অঞ্চলে মুছিলেন, তারপরও সৌদামিনী সাহস করিয়া সে পত্রের দিকে চাহিতে পারিলেন না। হায় রে মানুষের মন! বোধ করি তখনও সেই নির্ঘাত সংবাদের যথার্থতার উপর সংশয়াপন্ন হইতে চাহিতেছিল! বুঝি মনকে বলিতেছিল, সংবাদ সত্য নাও তো হইতে পারে?—সেই শেষ আশা কি মুহূর্তে মরীচিকাবৎ বিলীন হইয়া যাইবে নাকি?

পত্রে লেখা ছিল ঃ

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অভিজ্ঞতার নিকট আমার জ্ঞান বালকের অজ্ঞতা মাত্র! আপনি তখনই বলিয়াছিলেন, সহসা কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া অনুচিত,—সেই অনুজ্ঞার অর্থ আজ বুঝিতেছি।

যা শুনিয়াছেন উহা মিথ্যা না। আমি আপনার নিকট যে ঘোরতর অপরাধে অপরাধী—ক্ষমা চাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র! যদি কোন প্রকারে কখনও আপনাদের কোন উপকারে আসিতে পারি নিজেকে ধন্য বোধ করিব—একথা লিখিলে হয়ত বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এর চেয়ে কিছু বলিবার অধিকার বা বিশ্বাস আমি রাখি নাই।—প্রণাম করিবার অযোগ্য হইলেও আপনার শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিবার লোভ দমন করিতে পারিলাম না। আপনার স্নেহের নিমু—(কাটিয়া দিয়া লিখিয়াছে)—নির্মল।

পরদিন অপর্ণা ম্লানমুখে মনিব-গৃহিণীকে জানাইল অন্য লোক খোঁজা হোক,

মায়ের বড় জ্বর, আজও সে জ্বর ছাড়ে নাই। কেমন করিয়া তাঁকে ফেলিয়া সে রাঁধিতে আসে।

চাকুরী ঘুচাইয়া সামান্য যাহা সঞ্চয় ছিল সমস্তই নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার পর সৌদামিনী বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অত বড় বাড়ীর যজ্ঞের ব্যাপারে প্রবেশ করিতে তাঁর সাহস হইল না। চলিতে গেলে আজও পা কাঁপে, কানে তালা ধরে। তাঁরাই বা বারমাস সহ্য করিবেন কেন?

ভিক্ষা করিতে বাহির হইবেন কি? না দেশান্তরে কোন ঘরে রাঁধুনি বৃত্তি খুঁজিতে যাইবেন? এই শরীরে কেই বা কাজ দিবে? দিলেই কি পারিবেন? উপায়?

উপায়? এক উপায় আছে, হয়ত অন্যের পক্ষে ঐ উপায় সবচেয়ে সহজ, কিন্তু সৌদামিনীর পক্ষে সেইটেই চরম। দাদাবাবুর দ্বারস্থ যদি কখনও হইতে হয়,—তবে এই সেই সময়। ভিখারীর পক্ষে দ্বার বাছাই সাজে না। যে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল দ্বারেই হাত পাতিবে, তার এ অহঙ্কার কেন?

অপর্ণা যখন মুখ শুকাইয়া মার কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল, কিছুই বলিল না, তবু বুঝা গেল কাল হইতে না খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার তার সামর্থ্য নাই—তখন সৌদামিনী উঠিয়া বসিয়া—যে চিঠি লিখিতে গিয়াও অনেকবার মন পিছু হটিয়াছিল, উহা দৃঢ় হস্তে লিখিয়া ফেলিলেন। বাক্সে আর কিছুই না থাক দু-একখানা কাগজ ও লেফাফা ছিল। সেগুলি বৎসরাধিক পূর্বে কিনিয়া ছিলেন। বিশ্বাস ছিল মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইবে। তাই আজ উহারা এ সময়ে কাজ দিল। চিঠি লিখিয়া অপর্ণার হাতে দিতে তার ম্লানমুখে যেন মুহূর্তে দীপালোক জ্বলিয়া উঠিল। সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—চল না মা! আজই আমরা যাই—চিঠি লেখার কি দরকার?

সৌদামিনী যে কত বড় দুঃখে এ পত্র লিখিয়াছেন, ছেলেমানুষ অপর্ণা তা ধারণা করিবে কিরূপে? এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার শক্তি তাঁর ছিল না, ক্লান্তভাবে শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উত্তর করিলেন—না, না, মত না পেলে কি যেতে আছে।

অপর্ণার এ-যুক্তি সমীচীন ঠেকিল না। এতদিন যে কথা সে মায়ের বিরাগের ভয়ে সাহস করিয়া বলিতে পারে নাই, আজ সুযোগের মুহূর্তে বলিয়া ফেলিল।

বলিল—তবু ত তিনি গুরুজন। আপনার লোক যদি বিদায় করেও দেন, তাতেও অপমান নেই। চল আমরা আজই যাই।—

—অপর্ণা!

মায়ের তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ স্বরে চমকিয়া অপর্ণা থামিয়া গেল। সৌদামিনী সবেগে উঠিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁর অতি পাণ্ডুর মুখে রক্তহীন একটা উত্তেজনার উচ্ছ্বাস দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে শোণিতশূন্য নেত্রের অতি শুভ্রতার মধ্যে কৃষ্ণতারকা সমধিক কালো দেখাইতে লাগিল। অপর্ণা মায়ের এ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় মনে মনে উদ্বেগ অনুভব করিল। সৌদামিনী কহিলেন—আপনার লোক তুমি কাকে বল অপর্ণা! আমার আবার আপনার লোক কে? এ আমি ভিখারীর মত ভিক্ষা চেয়েছি। জেনো রেখো আত্মীয়তার দাবী এ পৃথিবীতে আমার কোথাও নেই।

এ তীব্র অভিমানের লক্ষ্য যে শুধু দাদাবাবু একাই নহেন, আরও একজন এই দারুন হতাশার নিমিত্ত-কারণ, এ ইঙ্গিতে যে তাহারও প্রতি মর্মভেদী অভিমান ব্যক্ত হইল—ইহা বুঝিতে অপর্ণার ভুল হয় নাই। সে মায়ের লুকাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও সেই পত্র দুখানা পড়িয়াছিল। কণ্ঠ চিরিয়া তার একটা মৃদুশ্বাস উঠিয়া অতি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৭

আমাদের দেশে, বোধকরি সকল দেশেই, পিতৃনামে পরিচয়কে মধ্যম শ্রেণীতে ফেলা হয়। পুরুষ স্বনামেই ধন্য হন। স্বনাম-ধন্য পুরুষ মুরলীধরেরও পিতৃনামের বালাই ছিল না। মাতুলালয়ে প্রতিপালিত এবং অতিক্রান্ত-প্রায় কৈশোরে তিনি দুঃখদারিদ্র্যের জ্বালায় উদ্‌ব্যস্ত হইয়া দেশ-ভূমি পরিত্যাগপূর্বক

মগের মুল্লুকে আগমন করেন। সে অনেক দিনের কথা। ইংরেজ-অধিকার তখন নিম্ন-ব্রহ্মেই নিবদ্ধ ছিল।

১৮২৪ সাল হইতে যুদ্ধারম্ভ ও ১৮২৬ সালে ইংরাজ ব্রহ্মরাজ ফাগাদুর নিকট হইতে আরাকান, তেনাসেরিম ও আসাম লইবার পর যখন ব্রিটিশ-বর্মার সৃষ্টি হইল তখন চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে অনেক লোক বাণিজ্য ব্যপদেশে নিম্ন-বর্মা বা ব্রিটিশ-বর্মায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকটায় চাকরী-প্রীতি রোগটা এত সংক্রামক হয় নাই, বরং তাঁদের দৃষ্টান্ত ও সুবিচারের সুযোগ বাঙ্গালীর চিত্তে লক্ষ্মীর বাস-স্বরূপ বাণিজ্যের প্রতি আকর্ষণ আনিয়াছিল।

মুরলীধরের মাতুলালয় চট্টগ্রামে। মাতুল যজমান সাধিয়া সংসার প্রতি-পালন করেন। পোষ্যসংখ্যা অল্প নয়। টাকায় তখন একমণ চাল। আঙিনায় শাক সব্‌জি, চালে চালকুমড়া আর চরকা-কাটা সুতায় বোনা ঠেঁটি কাপড় এইতেই লোকে তুষ্ট ছিল।

মুরলীর মাতা ইচ্ছাময়ী কুলীন-পত্নী। ভ্রাতৃগৃহের কর্ত্রী—ভ্রাতৃবধূগণ পালা খাটিয়া পর্যায়ক্রমে আসা-যাওয়া করেন, সংখ্যায় তাঁরা বহু। একজনের দুইবার ঘুরিয়া আসিতে যথেষ্ট সময় লাগে। সুতরাং তাঁরা এ গৃহে আগন্তুকা, গৃহিণী নহেন বধূ। সংসারে পিসিমারা ভগ্নীগণ, তাঁদের ছেলেমেয়ের সংখ্যাই বেশী। সহসা চাকা ঘুরিয়া গেল। একজন বধূ পালা অস্বীকার করিয়া গৃহিণী-পদ গ্রহণ করিলেন। মুরলীর মামা কুলীনসন্তান হইলেও পিতৃ-পিতামহবৎ উগ্রতেজা কুলীন নহেন—চণ্ডী ভৈরবীরূপ ধারণ করিয়া বক্ষারূঢ় হইলে তাঁর পদতলে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। এ-স্থলে যাহা হয়, হইল—অর্থাৎ যে যার নিজের পথ খুঁজিতে সচেষ্ট হইল। ইচ্ছাময়ীর বোনেরা পিসি ও তাঁর ছেলেরা একে একে নূতন গৃহিণীর বাক্য-বিদ্ধ হইয়া চিরদিনের আশ্রয়ের বাহির হইলেন। ইচ্ছাময়ীর উপরেও আক্রমণের বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। ইচ্ছাময়ী সকলের বড় বোন, এতদিন সবার উপরে কর্তৃত্ব করিয়া আসিছেন। আজ এক অর্ধ-পরিচিতা বধূ

তাঁহাকে চোটা চোটা কথা শুনাইয়া দেয়, ইহা একান্তই অপমানজনক। ভাইকে ডাকিয়া অনুযোগ করিলে, ভাই ঔদাস্যসহকারে উত্তর দিলেন—আমি ওসব মেয়েলি ঝগড়ার মধ্যে নেই। এমনি সর্বদা খেঁচাখেঁচি করতে করতে তোমরা আমার লক্ষ্মী ছাড়াবে দেখছি !

দিদি রাগিয়া বলিলেন—কি ! আমরা তোর লক্ষ্মী ছাড়িয়ে দিচ্ছি ! এতদিন তোর ঘরের লক্ষ্মী ছিল কোথায়—ওরে লক্ষ্মীছাড়া ? থাক তুই তোর লক্ষ্মী নিয়ে, আমরা অলক্ষ্মীরা বিদায় নিই।

কিশোরপুত্র মুরলীর হাত ধরিয়া মুরলীর মা সেই দিনই ভ্রাতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন।

এই অল্প বয়সে স্বাবলম্বী হইতে হওয়ায়—মুরলীধরের ভবিষ্যতের যবনিকা তলে সৌভাগ্যের উদয়চ্ছটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। মুরলীধর বিশেষ লেখাপড়া শিখিবার অবসর পান নাই কিন্তু তার চেয়ে বড় শিক্ষার সুযোগ তাঁর ঘটিয়াছিল, দুঃখের পাঠশালে পড়িয়া মানুষ হইবার উত্তম শিক্ষার চেয়ে বড় শিক্ষা আর নাই। মায়ের অবস্থা তাঁর কৌলীন্য গর্বের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া নিজের সে পরিচয়ের স্পৃহা রক্ষা করিল না। অতবড় কুলীন মুরলীধর শর্মা—সামান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া যখন একমাত্র পত্নী সঙ্গে সমুদ্রপথে সুদূর ব্রহ্মদেশে চলিয়া গেলেন তখন প্রতিবেশী মহলে বিস্ময়, ক্রোধ ও লজ্জার সীমা রহিল না। শ্বশুর-শাশুড়ী অথবা মা কেহই বর্তমান ছিলেন না, গ্লানি শুনিবার লোকের একান্ত অভাব, পিতার সংবাদ অজ্ঞাত, তাঁকে তাই এত বড় লজ্জাকর সংবাদে অজ্ঞ থাকিতে হইল। তখনকার দিনে ব্রহ্মদেশে-যাত্রা বিলাত যাওয়ার মত জাতিচ্যুতি ঘটাইত।

মুরলীধর অতিকষ্টে পেগু পৌঁছিয়া অসামান্য চেষ্টায় দু-তিন বৎসরের মধ্যে ব্যবসায়ে লাভবান হইলেন। এমন সময় সেখানকার রাজনৈতিক গগনের খণ্ড মেঘ সহসা জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল এবং দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া সমস্ত বিপর্যস্ত করিয়া দিল।

রাজ-পরিবর্তনের অনিবার্য ফল রাষ্ট্রবিপ্লব!—কখন সামান্য—কখন

যাও ভুলিয়াও কেহ বারণ করিবে না—এর সঙ্গে ইচ্ছানুরূপ একটি গৃহের পুরাপুরি গৃহিণীপনায় যে বড় প্রভেদ।

এখানের সারা গৃহস্থালীর ভার তার অধীনতা স্বীকার করিল, তখন সেই বিজয়ের গৌরব অপর্ণার ধরিল না। পরম পরিতোষের সহিত প্রত্যুষে উঠিয়া সে অঙ্গনস্থ কূপজলে স্নান সারে, সেই হইতে ঠাকুরঘরের পাট, রান্না সকল কাজই তার সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে হাসিখেলার মত সহজ আনন্দে সম্পন্ন হইয়া যায়। কাজ যেন হাতে পায়ে লাগে না। সারাবাড়ীর উপর নিচে ঝাড়িয়া মুছিয়া ঝকঝকে করিয়া তোলা, কোথায় কি থাকিলে মানান হয় এই লইয়া বিহারীর সহিত পরামর্শ এবং শেষে বিহারীর যুক্তির অসারতা দেখাইয়া কলহাস্যে তাহাকে অপ্রতিভ করিয়া দেওয়া—এইরূপে এ ক্ষুদ্র সংসারটি লইয়া সে মাতিয়া থাকে।

সৌদামিনীকে এ সকলের মধ্যে পাওয়াও সম্ভব নয়, প্রয়োজনও ছিল না। প্রশস্তবক্ষ নদীর মধ্যে বর্ষার জল নামিলে সে জল যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটে অথচ সীমা লঙ্ঘন করে না, অপর্ণার চির-রুদ্ধ গৃহিণীপনার আকাঙ্ক্ষা তেমনি তীব্র উৎসাহে জাগ্রত হইয়া নিজেকে লইয়াই খাটাইয়া ভাবাইয়া তুষ্ট ছিল, মধ্যস্থতার প্রয়োজন কোথায়! বিহারী তার এই অত্যুৎসাহী নূতন অতিথিটিকে নিজের এতদিনকার সমস্ত বিশৃঙ্খল রাজ্যপাট ধরিয়া দিয়া তার শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবকত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। অপর্ণা হুকুম করিত, সে নত মস্তকে পালন করিয়া যাইত আর অবাক হইয়া দেখিত—এতদিনকার সমস্ত অক্ষমতার লজ্জা চাপা দিয়া কেমন করিয়া অপরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী দেখিতে দেখিতে ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবির মত আপনার চেহারা বদলাইয়া ফেলিতেছে।

সৌদামিনী সেদিনের পর হইতে এই অন্ধকারমুখ কটুভাষী বৃদ্ধের বিরুদ্ধে একটু ক্ষমার সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপর্ণার এখনও তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হয় নাই। সেদিন মাসকাবারী হিসাব দেখিতে দেখিতে রাধিকাপ্রসন্ন বিহারীকে চড়া গলায় গালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—

এই কয়দিনে এত তেল ঘিয়ের খরচ কিসের জন্যে হল বেহারীবাবু? আজকাল কি ঘি-তেলে চুমুক দাও?

লোক বাড়িলেই খরচ বাড়া যে অনিবার্য। বিহারী সে কথা স্মরণ করাইয়া না দিয়া মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।—তা, কিছু কম করতে তা—আচ্ছা—তা—

—খোকার মতন তা-তা করতে শিখচো যে নতুন মা-ঠাকরুণ পেয়ে! রাঁধুনী বেটিকে ধম্‌কে দিও—যেন তিনি একটু কম করে খরচ করেন।

শেষ কথাগুলা গৃহস্বামী বিলক্ষণ চেঁচাইয়া বলিলেন—বিহারীর আর বলিবার সঙ্কট ভোগ করিতে হইল না। পাশের ঘরে দরজার কপাট ও দেওয়ালের সর্‌দালে উইপোকার বাসা জন্মিয়াছিল, ঝাঁটা দিয়া অপর্ণা সে-গুলি সাফ করিতেছে, তার সম্বন্ধে কর্তার মন্তব্য কানে ঢুকিতেই সেই অবস্থায় দরজার সামনে আসিয়া বলিল—ওর চেয়ে কম ঘি তেল দিয়ে কে রাঁধতে পারে,—রেঁধে দেখাক তো।

—ইস পারে না!—বেহারি তুই পারিস নে?

এই সওয়ালের জবাব করা বিহারীর পক্ষে কঠিন। না-ও বলা যায় না, হাঁ বলাতে যথেষ্ট বিপদ! সে আবার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল। অপর্ণা তার সঙ্কট দেখিয়াও তার দিকে ফিরিয়া বলিল—বেশ'তো, বেহারি বলুক না কেমন পারে? ইঃ—কাউকে পারতে হয় না!

—কি বেহারি! বাক্যি হরে গেল যে!—মগজে ঘা দিয়ে ঘিলু বার করছিস না কি?

—আজ্ঞে, না, তা—হ্যাঁ—পারা যাবে না কেন?—তবে কি না সে তেমন আপনার গিয়ে—তেমন ইয়ে,হয় না।

রাধিকাপ্রসন্ন মুখ খিঁচাইয়া উঠিলেন—তোমার গুষ্টির পিণ্ডি হয়! ওগো রাঁধুনি ঠাকরুণ! দোহাই তোমার—গরীবের গলায় মা-বেটিতে পা তুটি তুলে দিও না,—একটু দয়ার সঙ্গে করো। বাবাঃ দশ দিনে আট আনার সর্ষের তেল!

অপর্ণা ক্রমাগত রাঁধুনি-ঠাকুরাণীরূপ—মহৎ পদলাভ করিতে করিতে মনে

মনে চটিয়াছিল, বলিয়া উঠিল—বাড়ীতে মানুষ এলে খরচ বাড়ে, এ ত কচি খোকারাও জানে!

—সেই জন্যই তো মানুষদেরকে অনুগ্রহ করে না আসবার জন্যে দুটি বেলাই বলা হচ্ছে,—বেহায়া মানুষরা শোনে কই?

অপর্ণা হারিয়া গিয়া নিরুপায় রোষে বিহারীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হানিয়া সবেগে কহিল—আমি কাল থেকে আর রাঁধবো না—রেঁধো তুমি।

—আঃ তাহলে হাড়ে বাতাস লাগবে। কাল তুই গোটাকতক রান্না রেঁধে ও বেটিকে দেখিয়ে দিসতো বেহারি, নিজের রান্নার গুমুরেই মেয়েটা মলো! যেন ভূ-ভারতে কারু হাতে অমন ফুলবড়ী চাঁপানটের ঘণ্ট সৃষ্টিই হয় নি!

বিহারী নিজ কৃতিত্ব প্রকাশের এমন সুযোগে আনন্দিত না হইয়া অপর্ণার পরাভবে উদ্বেগ-ব্যথিতই হইতেছিল, অপর্ণাকে কোনখান দিয়া স্পর্শ করা যায়, এই মান্যবান চতুর ব্যক্তিটি যে বুঝিয়া লইয়াছেন, বিহারী উহা বুঝিল। রান্নার নিন্দা ইহার নিকট প্রসূতির নিকট সন্তান-গ্লানির মতই অসহ্য। চকিতের মধ্যে অপর্ণার বেদনাকৃষ্ট মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বিহারী সস্মিতস্বরে উত্তর করিল—আমি রাঁধলে তো মায়ের খাওয়া হবে না।

—সেই ভাবনাতেই আমার ঘুম বন্ধ হয়ে গ্যাল! না হয় তিনি আর একটা একাদশী করবেন!—না না, বেহারি সত্যি একদিন তুই ওকে দেখিয়ে দিস্, ওর চাইতে কত ভাল ভাল বেন্নুন তুই কত কম ঘি তেলে রাঁধতে পারিস।—ভারি তো রান্না, তারই আবার অত গুমোর। রামো! অমন রান্না আমি ঢের খেয়েছি।

পরদিন আহারে বসিয়া পরম পরিতোষের সহিত ভেটকি মাছের ঘণ্ট আস্বাদন করিতে করিতে গৃহস্বামী অদূরে দণ্ডায়মান বিহারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্নমুখে কহিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ একেই বলে রান্না! তোফা রেঁধেছিস বেহারি! আহা যেমন মূলোর শুক্তোটির তার হয়েচে, তেমনি হয়েচে সোনা-মুগের ডালটুকু—আর সব্বার ওপোর টেক্কা দেছে মাছের ঘণ্ট! একবার মুখে দিলে সাত বচ্ছর পেরমাই বৃদ্ধি হয়!—এই বলিয়া সমুৎসাহে ভাতের

সহিত ঘণ্ট মাখিয়া বড় করিয়া গ্রাস তুলিয়া পুনশ্চ কহিলেন—চমৎকার হয়েছে বেহারি! বাঃ বেড়ে রেঁধেছিস!

বিহারী এতটুকু হইয়া নতমুখে রহিল। সৌদামিনী ঈষৎ হাসিয়া দুধ আনিতে উঠিয়া গেলেন। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল—রান্না কি আজ বড়ই ভাল হয়েছে? সত্যি বলুন।

—হয় না হয় খেয়েই দেখ না, বাপের জন্মে এমন কখনও খাস নি। দে তো রে বেহারি আর একটু মুগের ডাল, আহা! এমন যে সোনার বর্ণ, অন্য দিন এ যেন কালি পারা হয়ে যায়! কথায় বলে—অ-রাঁধুনির হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে, না জানি রাঁধুনি আমায় কেমন করেই রাঁধে!—জানিস্ দামিনি! তোর দিদিমা এই কথাটি যখন তখন—তার এক সম্পর্কে বোন হয়, —তাকেই বল্‌তো। আমার সেই শ্যালীটির রান্না মোটেই ভাল ছিল না, যেমন তোর মেয়ে এই অন্নপুন্নোর।—

অপর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সবেগে কহিয়া উঠিল—ইস, তাই না! আজ এ সব কে রেঁধেছে!

কর্তা ভালমানুষের মত মুখটি করিয়া কহিলেন—কেন? বেহারি।

—ইস! তা নয়! বলুক না—বেহারি দা, বলুক না, হ্যাঁ বেহারি দা! রেঁধেছ তুমি?

বিহারী আজিকার রন্ধন-খ্যাতি শুনিতে শুনিতে গর্বিত হইয়া গভীর স্নেহে অপর্ণার প্রচ্ছন্ন আনন্দে স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল, প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উত্তর করিল—সবই দিদির রান্না।

—বটে! আমিও তো তাই বলি!—সেই জন্যেই না শুক্তুনিটাতে অত নুনের ঘটা! আর এই যে এমন চাল্‌তার গুড়-অম্বল, এ যেন টকে বিষ! রামোঃ! এর নাম রান্না! বলিতে বলিতে রাধিকাপ্রসন্ন পাথরবাটিসুদ্ধ গুড়-অম্বল কোলের দিকের ভাতের উপর উপুড় করিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া সৌদামিনী ও বিহারী মুখ টিপিয়া হাসি চাপিল। অপর্ণা রাগ না করিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—বুঝেছি! বুঝেছি!

আপনার সব চালাকি! আচ্ছা, এইবার একদিন বেহারিদার রান্না খেয়েই দেখা যাবে। কাল মার পূর্ণিমার উপোস, রেঁধো তুমি বেহারিদা!

বেহারি সহাস্যে কহিল—আচ্ছা।

রাধিকাপ্রসন্ন গর্জ্জিয়া উঠিলেন—নেমকহারাম! তোর হাতে আমি আর জন্মে খাবো? কেন, আজ তোর রাঁধতে কি হয়েছিল? তা হলে তো ও বেটীর দর্পচূর্ণ হয়েই গিয়েছিল বলে। নাঃ, ওগো অন্নপূন্নো! তুইই বাপু সার্থক রাঁধতে শিখেছিলি—তুই-ই রেঁধে খাওয়া বাপু, যদ্দিন না বাড়ী থেকে বিদেয় হচ্চিস। ও বেহারি চামারটা কি রাঁধে নাকি? অতি জঘন্য রান্না ওর খেলে কান্না বার হয়।—ওর হাতে রান্না খাওয়া ঘুচেছে না—বেঁচেছি।—রাধিকাপ্রসন্ন আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। বিহারী কৃতজ্ঞচিত্তে আচমনের জল দিবার জন্য ঘটি খড়িকা লইয়া তাঁর অনুগামী হইল।

৯

একরকম সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। শুধু দিন কাটাই যদি যথেষ্ট হইত, তা হইলে হয়ত সৌদামিনী পলাশডাঙ্গার ভাঙ্গা ঘরখানিতেই জীবনের স্বল্প দিন ক'টা অনাহারে পড়িয়া কাটাইয়া দিতেন। যার জন্য তাঁর মরণ চিন্তার সাহস হয় নাই অপর্ণার সেই বিবাহের কথা ভাবিয়া এমন আশ্রয়ের মধ্যেও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ছিল না। পাড়ার পাঁচজনের কল্যাণে সে চিন্তা সময় সময় অসহ্য হইয়াও উঠিতে লাগিল। যে কেহ এতকাল পরে এই নাতনী-দাদামহাশয় সম্মিলন সন্দর্শন করিতে এ বাড়ীতে পা দেয় সে খোঁচা না দিয়া যায় না।

হরিধন মুখুয্যের স্ত্রী অপর্ণাকে দেখিয়া বিস্ময়ে দুই চক্ষু ললাটবর্ত্তী করিলেন;—লোককে দুষ্‌বে বা কি? হ্যাঁ মা সৌদামিনী! এত বড় মেয়ে রেখে তোমার গলা দিয়ে জল উল্‌চে কি করে মা?

সমভিব্যাহারিণী নন্দর মা ঠোঁট টিপিয়া হাসিলেন—মেয়েটিকে বুঝি বীজ রেখেচ, হাঁগা সদু?

খোঁচা খাইয়া সৌদামিনী সন্ধ্যার পর মাতামহ যখন একা বসিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন সঙ্কোচের সহিত অনতিদূরে মাটি চাপিয়া বসিয়া পড়িয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাধিকাপ্রসন্ন অসময়ে নাতনীকে এ ভাবে আসিতে দেখিয়া ব্যাপারটি অনুমান করিতে বিলম্ব ঘটে নাই, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়, নিবিষ্টভাবে মালাজপই করিতে লাগিলেন।

সৌদামিনী দেখিলেন এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে অর্ধরাত্রেও হয় ত দাদাবাবুর মালা জপা শেষ হইবে না। বহুক্ষণ জপ-ভঙ্গের অপেক্ষা করিয়া হতাশ হইয়া শেষে উঠিয়া গেলেন। যদিও রাধিকাপ্রসন্নকে জপের সময় বিহারীর সহিত কতবার বৈষয়িক আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছে তথাপি কথা কহিতে তাঁর ভরসা হইল না।

রাত্রের আহার্য দু-চারখানা গরম লুচি দু-চার রকম ভাজাভুজি আর একটু দুধ আনিয়া অপর্ণা ঠাঁই এর নিকট নামাইয়া রাখিতেই রাধিকাপ্রসন্ন কুঁড়ো জালির ভিতর মালা রক্ষা করিয়া আসনে আসিয়া বসিলেন ও একবার চারি-দিকে চাহিয়া অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর মা কোথা রে অন্নপূর্ণা?

—মা ঘরে—আপনি বুঝি আমায় চিরকাল ভুল নামেই ডাকবেন? আমার নাম তো অন্নপূর্ণা নয়—অপর্ণা।

—ওঃ ডাকি এই কত না—আবার এ নামে নয় সে নামে!—কেন অপর্ণার চেয়ে অন্নপূর্ণা নাম মন্দ নাকি?

অপর্ণা স্বভাব-সিদ্ধ কলহাস্যে উত্তর দিল—ও মাগো! তাই বলে নিজের নাম মন্দ হলে বুঝি বদলে নিতে হবে?—মাকে ডেকে দেবো?

—কি জন্যে ডেকে দিবি শুনি? তোর মার যে পাকশিটে চেহারা না দেখলে পেট ভরবে না! যা, যা, আমি কি কাউকে গ্রাহ্য করি—না, চাই?

—জানি, জানি,—কেই বা না জানে!—বলিয়া অপর্ণা সরিয়া গেল এবং মাকে পাঠাইয়া দিল।

সে দিন কিছু না বলিতে পারিলেও দু-একদিনের ভিতর চোখকান বুজিয়া সৌদামিনী তাঁর আবেদন পেশ করিলেন। বলিতে রক্তাল্পতায় পাণ্ডুর মুখ

সম্ভবমত লাল দেখাইল স্বর অস্ফুট হইয়া গেল। কোন দিন যে আব্দার করিতে পায় নাই, হৃদয় তার সহজেই ভীরু হইয়া পড়ে। আব্দার সহিবার লোক পাইলেও জোর করিতে পারে না। সংশয়জড়িত স্বরে কহিলেন—অপর্ণার বিয়ের জন্যে ভাবনায় পড়েচি, কি করে কি হবে ভেবে পাইনে।

রাধিকাপ্রসন্ন স্বভাবসিদ্ধ সহজ গম্ভীর স্বরে কহিলেন—অত ভাবনা কিসের?—শুনিয়া বর্ণহীন মুখে একটা আশার দীপ্তি ফোটে ফোটে—এমন সময় মাতামহ কথাটা শেষ করিলেন—ওর বিয়ে ত হবে না।

সৌদামিনীর উচ্ছ্বসিত চিত্ত অর্ধপথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঙ্কোচে মরিয়া গেল। মৃদুশ্বাসে কহিলেন—ওকে আর ঘরে রাখা যায় না, চারিদিক থেকে নিন্দে করচে—।

—বটে! দে বেটিকে ঘাড় ধরে বার করে।

মনে যার আনন্দে নাই—সহজে মুখে তার হাসি ফুটে না। বিশেষতঃ অপর্ণার বিবাহের আলোচনা সৌদামিনীর পক্ষে হাসি-তামাসার বিষয় নয়, এ সত্বেও ঐ কথায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একটু হাসিতে হইল। তারপর কাতরস্বরে কহিলেন—আপনি একটু মন করুন, তাহলেই হয়ে যাবে। বড় হয়েচে, এর পর যে কেউ ঘরে নিতে চাইবে না।

—আমি! আমি আবার কি করবো?—রাধিকাপ্রসন্ন আকাশ হইতে পড়িলেন।

সৌদামিনী কোন মতে বলিয়া ফেলিলেন—ওর আর কেউ কি আছে?

—ক্ষেপেচ! আমি পারবো না, সোজা কথা বলে দিচ্ছি!—অ্যাঁ! এমন কথাও শুনি নি। বলে কি? আমি? আমি ওর কে? মায়ের মাতামহ। আহা কি নিকট সম্বন্ধ গো, একেবারে পরমাত্মীয়!

সৌদামিনী কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। যতটা বলিয়াছেন, সেই যথেষ্ট।

রাধিকাপ্রসন্ন তাঁর সাড়া না পাইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই শীর্ণ স্তব্ধ মূর্তির পানে কিছুক্ষণ এক প্রকার পরিহাস-প্রসন্ন ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—বেহারি!

বিহারী বোধ করি কাছাকাছি কি করিতেছিল, এক ডাকেই সাড়া দিল—আজ্ঞে যাই— বলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

—শোন্ একবার কথা শোন্ বেহারি! এতবড় মজার কথা আর কখন শুনেছিস?—ইনি আমায় এঁর মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করবার ভার দিচ্চেন, আমার যেন ঐ ব্যবসা, মায়ের মাতামহ কার বিয়ের ঘটক হয় রে?

বিহারীকে ব্যাখ্যা করিয়া বলার আবশ্যক ছিল না, এ ঘরে পা দিয়াই সে ব্যাপার বুঝিয়াছিল। করুণচক্ষে অপমানিতা লজ্জায় বিবর্ণা সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া, কি যেন বলিবার চেষ্টা করিয়া আবার কি ভাবিয়া নিবৃত্ত হইল। দুবার কাশিয়া গলাটা ঝাড়িয়া লইল, মাথা চুলকাইয়া কহিল—তা ছাড়া—

—তোর মুণ্ডু! আ-মলো! ভাল লোককে মধ্যস্থ মেনেছিলাম। তা ছাড়া—কি আবার? হ্যাঁ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেউ কখনও শুনেছে যে, মা'র মাতামো কারু বিয়ে দিয়েচে? দিতে হয় তোমরা দাও, ডাকতে হয়—ঘটক ডাকো,—আমায় বিয়ের দিন নেমন্তন্ন করো—গরম গরম লুচি একপাত খেতে বসবো। আর আইবুড় ভাত দেবো।

রাধিকাপ্রসন্ন যে বিধান দিলেন, বিহারী অসঙ্কোচে সে অনুজ্ঞা পালন করিল। পরদিনই ঘটকপাড়ায় শ্রীদাম ঘটকের নিকট বরের তালিকা লইয়া আসিয়া সৌদামিনীর সহিত বিতর্ক করিবার পর হল্‌দে তুলোটে লেখা কুষ্ঠির ছক লইয়া ঘটকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। কন্যা যাচাইয়ের কষ্ঠি-পাথর—বিয়ে পাশের প্রবেশিকা।

বরের তালিকায় বাংলা মল্লুকের অনেকগুলি অমূল্য-রত্নের সংবাদ ছিল, সে সব দিকে তাকাইতে গেলে তাঁদের সম্মান হানি হয়, অপর্ণার বরের পদ পূর্বের চেয়ে কয়েক ধাপ উঠিয়াছে সত্য—মুহুরি গোমস্তা ছাড়াইয়া কেরাণী ওভারসিয়ারই তাদের পদ হোক!—যারা একদিন রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যো, অথবা রমেশচন্দ্র হইলেও হইতে পারে, বরের বাজারের সেই সব শ্রেষ্ঠ রত্ন কি ভিখারিণীর মেয়ে অপর্ণার সহিত মালাবদল করিতে আসিবে নাকি? মেয়ে সুন্দরী! হোক না।—সৌন্দর্য লইয়া কি ধুইয়া খাওয়া যায়? এমন

সুরূপা লক্ষ্মীশ্রী-সম্পন্না কন্যা সংসারে দেখা যায় না। যখন দেখাই যায় না নাই বা দেখিলাম! পাঁচ, সাত, দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া ফেলিলে বংশবৃদ্ধি করিয়া লক্ষ্মীশ্রী ঘরে আনিবে। ডোমের চুপড়ি ধোয়া মেয়েকে ঘরে তুলিলে লক্ষ্মীর-শ্রীটুকু বধূটির অঙ্গেই থাকিবে—গৃহস্থালীর মধ্যে নামিয়া আসিবে না। অতএব অকেজো রূপের চাইতে কাজের জিনিষ 'রূপিয়া'ই সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয়, এই বস্তু যিনি যত দিতে সমর্থ তাঁর মেয়ের জন্য নিলামের দরে তিনি তত ভাল মাল কিনিতে আধিকারী।—অপর্ণার মার যখন দিবার মত বড় যৌতুক নাই, তখন দশহাজারী জামাই আসে কিসের জোরে? বিহারীর পছন্দসই দু-একটি বর অন্ততঃ হাজার ছয়-সাতে হইতে পারিত, রাধিকাপ্রসন্ন অত টাকা খসাইতে রাজী হইলেন না। বরের বাপেরা দেখা গেল এ বিষয়ে সকলেই একজোট।

সাত-আট হাজার! বিহারী জানিত—রাধিকাপ্রসন্ন এত টাকা দিতে সম্মত হইবেন না। তাঁর অবশ্য টাকার দুঃখ নাই, দিলে দিতে পারেন, ভবিষ্যতে অপর্ণাই হয়তো সবই পাইবে, কিন্তু পণ তিনি দিবেন এমন আশা হয় না। বিহারী চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, কুলীন নয়—শ্রোত্রীয়। তাদের শ্রেণীতে বরপণের মত কন্যাপণ প্রচলিত—তবে দর এত চড়া নয়। পাঁচ সাত শত টাকা হইলেই এই চির-নিঃসঙ্গ বিহারীরই একটি পাঁচ সাত বৎসরের বালিকা বধূ ঘরে আসিতে পারিত। কিন্তু এই কথা প্রায় বিশ—কি পঁচিশ বৎসর পূর্বে যখন এই ঘটক ঠাকুরই একদিন কর্তার সাক্ষাতে তুলিয়াছিলেন, তখন এমন বজ্রনির্ঘোষে তিনি সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন যে, সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ বিহারীর আশানন্দের শিশিরাভিষেকে স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়মুকুলটিও জন্মের মতই ভস্মীভূত হইয়া যায়। সেদিন হইতে সে কৌমার-জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছে। এ জন্য তার মনে আর দুঃখ ছিল না। কিন্তু আজ আবার স্মৃতির ভাণ্ডার উল্টিয়া পুরাতন দৃশ্য জাগিয়া উঠিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, সেই মানুষ এতটা বরপণ দিতে রাজী হইবেন না। বিহারী যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল।

—বাবা! একবারও তো স্থির হতে পারছো না বাবা—যন্ত্রণাটা কি একটুও কমছে না? ঘুম কই আসছে না তো? কপালে কত ঘাম হচ্ছে! বড্ড যে ছটফট করছো তুমি! ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পাঠাই?—পাঠাই না বাবা! একবার এসে একটা ভাল ওষুধ দিয়ে যান!—ঘুম না হলে, কাল কিছু খেতে পারবে না!—গলার স্বর কত যে অস্পষ্ট শোনাবে! উঃ—এরই মধ্যে কি রকম আস্তে আস্তে কথা কইছো?—শুনলে ভয় করে যে।—

—ঘুম যে পাচ্ছে না মা! ডাক্তার তো অনেক ওষুধ দিলেন, নতুন ওষুধ কোথা পাবেন, বাবা?—তোর বাবার নিত্যি ওষুধ বদল করলেও তা একদিন বই কাজ দেয় না—এত নূতন নূতন ওষুধের আবিষ্কার কে করে ওঠে—বলতো? ঘাম হচ্ছে? হোক না, কত মুছবি ধীরা! দে—হতে দে, বাতাস সহ্য হচ্ছে না। ও ঘাম তো গরমের ঘাম নয়, ও যন্ত্রণার ঘাম—হ্যাঁ—কমছে বই কি, একটু কমেছে। সে রকম যন্ত্রণা থাকলে—উঃ—না,—কিছু না—কিছু না—ধীরা!

—বাবা!

—কত রাত মা?

—কত রাত? কি জানি বাবা, কত! ঘড়ির শব্দে তোমার ঘুম আসবে না বলে, বাজা ঘড়িগুলো সব নিচে পাঠিয়ে দিয়েছি, এই কতক্ষণ যেন কোথাকার,—বোধ হয় সোয়েডাগনের ঘড়িতে কটা যেন বেজেছিল,—কটা—তাতো গুনি নি।—মনে হচ্ছে এখনও ভোর হতে দেরী আছে। কোথাও তো সাড়া নেই! পাখী একটিও ডাকে নি! তোমার মাথার যন্ত্রণা একটু কমেছে?—কমেছে বাবা? ঘামটা বন্ধ হয়ে এলো। এইবার একটু স্থির হতে পারবে,—না?—খুব করে ঘুমোবার চেষ্টা করো তো—আমি তোমার মাথায় খুব আস্তে আস্তে—এই এমনি করে হাত বুলিয়ে দিই।

—আচ্ছা মা! তাই দে। তোর হাত আমায় বড় বড় ওষুধের চেয়েও ঠাণ্ডা করে।

ফাল্গুনের নাতিশীতোষ্ণ মধ্যরাত্রে রুদ্ধদ্বার কক্ষে মেহগ্নি কাঠের পালঙ্কে শয়ান বৃদ্ধের মাথার কাছে বসিয়া কিশোরী কন্যা শুশ্রূষা করিতেছিল। পিতা-পুত্রীতে মধ্যে মধ্যে কথা হইতেছিল; আবার উভয়ের বাক্যহীন স্তব্ধতার মধ্য দিয়া রোগযন্ত্রণার অর্ধস্ফুট ঊর্ধ্বশ্বাস স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। গৃহপ্রান্তবর্তী সবুজ আবরণের ঘনবেষ্টনে আবদ্ধ একটিমাত্র বর্তিকালোকের ছায়ান্ধকার বৃহৎ কক্ষটার স্তব্ধ গাম্ভীর্যের সহিত মিশিয়া তাহাকে সমধিক রহস্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। জানালাতেও ঐ একই সবুজ পর্দা ফেলা। বহির্জগতের আলো অন্ধকারের সহিত এ লোকের যেন যোগ ছিল না। ঘরে আসবাব সামান্যই, সেও সবুজপুরীর ছায়ালোকে অস্পষ্ট। নিশুতি মধ্যরাত্রে রোগ-যন্ত্রণার্ত শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতিধ্বনিত কক্ষভূমি মৃত্যুপুরী রূপেই প্রতিভাত হইত,—যদি এই প্রেত-দীর্ঘ ছায়ান্ধকার মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি করুণা-শীতল মূর্তি বালিকার আবির্ভাব না ঘটিত। এ মেয়েকে কোনমতেই মৃত্যুদূতের সহিত তুলনা করা চলে না, মরণের সহিত যুদ্ধ করিয়াই সে তার ক্ষুদ্র দুখানি হাতে চলনোন্মুখ পিতৃ জীবন বৎসরাধিক আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

শয্যাশায়ী অসহায় রোগী ব্রহ্মরাজ্যের ঐশ্বর্যশালী বাঙ্গালীদের অন্যতম—মুরলীধর।

জাগতিক সম্মানসম্পদ্ যে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা এবং মানব জীবন যে বিদ্যুচ্চল—তাঁর জীবন-ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য!

মুরলীধরের অদৃষ্টের ভোগ বা সুখদুঃখের পরিক্রমণে চক্রের নিবৃত্তি কালও আসে নাই—যেখানে অতুল সুখসম্পদ ভোগান্তে সহধর্মিণীর পশ্চাদযাত্রা উচিত ছিল, সেখানে ঈপ্সিত ত্রিদিববাসের পরিবর্তে মৃতা পত্নীর শেষচিহ্ন মন্দস্বাস্থ্য হীনভাগ্য মেয়েটিকে বার্ধক্যের অবলম্বন রূপে বুকে চাপিয়া বিস্তৃত ব্যবসায় কর্মকাজে যথাপূর্ব নিযুক্ত থাকিলেন। এমন করিয়া কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদা একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ভাগ্যদেবতা তাঁর অলক্ষ্য হইতেও উপহাসের বক্র হাসি হাসিলেন। নিজের সমুদয় শক্তিকে অযুত বাধার বিরুদ্ধে চিরজীবন উদ্যত রাখায় সে শক্তি বর্ধিত হইলেও অজস্র খরচে ক্ষয়ও বিপুলভাবে হওয়া

অনিবার্য, বৃদ্ধ বয়সেও যখন বিশ্রাম মিলিল না, ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া ভিতরে যে খাদটা জন্মিয়াছিল সেটাই জোর ধরিল। বন্ধ পথে জল ঢুকিতে বিলম্ব হইল না। শক্তির অতিরিক্ত শ্রমের ফলে শারীরযন্ত্রের বিকৃতি ঘটিল। মেয়ে মুখে বুকে হাত বুলাইয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল—বাবা! তুমি কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছ! না বাবা! তুমি আর কাজ করো না—তোমার শরীর খারাপ হবে।—এ মেয়েটির ঐ স্পর্শ টুকু পৃথিবীর সমুদয় অনিমেষ জাগ্রত দৃষ্টির চেয়েও যে বেশী সত্য।—এই ক্ষুদ্র স্নিগ্ধ স্পর্শ টুকু যে সংবাদ স্নেহ সজাগ চিত্তপটে লিখিয়া দিয়াছিল, কোন মস্তবড় ডাক্তারও 'ষ্টিথ্ সকোপ', 'এক্স রে' দিয়া এর চেয়ে সঠিক সংবাদ জানাইতে পারিত না। প্রাণের টানের ব্যাকুলতা যাহাকে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়া সাবধান করিতে চাহিল, তাহাকে প্রতারিত করা এতই সহজ যে, সে প্রলোভন তার নিজের স্নেহময় পিতাও সম্বরণ করিতে পারেন নাই। স্নেহ-সকরুণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন—বুড়ো হলে মানুষ শুকিয়ে যায় যে মা! অসুখ তো হয় নি।

তথাপি সেই স্নেহব্যাকুল চিত্ত এ সান্ত্বনায় শান্ত হইতে পারে নাই। সে দাদাকে ডাকিয়া ভীতি প্রকাশ করিয়া কাতরভাবে তাঁর সাহায্য চাহিয়াছিল, ফল পায় নাই। দাদা সমস্তটাই উড়াইয়া দিয়া উত্তর দিলেন—তুই ক্ষেপেছিস! বাবা আবার রোগা হচ্ছেন কোথায়? বয়স হলে কি মানুষ একটুও বদলাবে না?

পরের কথার উপরেই যার সারা জগৎ গঠিত, মানব শরীরের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যখন তার স্বষ্টিকর্তারা এমন জোরে সাক্ষ্য দিতেছেন, তখন অবিশ্বাস করিলেই বা উপায় কি তার?

একদা গ্রীষ্মের কোন রৌদ্র-তপ্ত মধ্যাহ্নে এক জটিল-বৈষয়িক সমস্যার সমাধানকালে মুরলীধর অকস্মাৎ ভীষণ সন্ন্যাস-রোগাক্রান্ত হইলেন, সেই আক্রমণের ধাক্কা কাটাইয়া উঠিয়া এখন এই জীবন্মৃত অবস্থাই তাঁর স্বাভাবিক হইয়াছে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস যে এই অবস্থার মধ্য হইতেই লইতে হইবে ইহাতে তাঁর অথবা অপর কাহারও সন্দেহ ছিল না। কর্মীর পক্ষে এই বিশ্রাম—প্রকৃতির এই জোর করিয়া কর্ম হইতে অবসর লইতে বাধ্য করা এ

যে কত বড় শাস্তি তাহা সে-ই জানে, যে জীবন্ত থাকিয়া পলে পলে নিস্পন্দ জড়ের মত মরণের পথে অগ্রসর হইয়া চলে! আবার যে গতি তাহাকে সেই অনির্দেশ্যের পানে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, সে গতিও বড়ই মন্দ মন্থর! জগতের যাবতীয় জড়বস্তুর ন্যায় তাঁহার স্থূল দেহটা বিরাট ভারগ্রস্ত মহাজড়ে পরিণত হইয়াছে, নদীর মৃদু প্রবাহ অর্ধদগ্ধ কাষ্টখণ্ডকে যেমন ধীরে ধীরে ভাসাইয়া স্রোতের মুখে আনিয়া দেয়, এরও সেই শিথিল শান্ত গতি। শেষ কোথায় তাহা জানা আছে, কিন্তু কবে—তাহা অনিশ্চিত। শুধু মৃত্যুদূতের বংশীধ্বনি অদূর হইতে কানে আসে, দেখা যায় না।

মৃত্যু সকলের চক্ষে ভয়াবহ হইলেও সকলের পক্ষে অপ্রার্থিত নয়। চির-রহস্যময় চিরপুরাতন—অত্যাশ্চর্যময় ভীষণ হইয়াও সুন্দর—অনেকের পক্ষেই সে বড় প্রিয়! মুরলীধরের পত্নী যথার্থ সহধর্মিণীরূপে নিজ ধর্মটুকু পালন করিয়া গিয়াছেন, দুঃখসুখে চিরানুবর্তিনী পত্নীহারা হইয়া সন্তপ্ত-বিরহীর নিকট মৃত্যু বোধ করি বিরহী যক্ষের নিকট আষাঢ়ের মেঘের মতই সুপূজিত হইতে পারিত, কিন্তু বিপ্লবকালের আকস্মিক অদৃষ্ট বিপর্যয়ের বিড়ম্বনায় মুহ্যমান অবস্থায় যে শেষ সন্তানটি তিনি শরীরে বহন করিতেছিলেন, সেটিকে যখন শেষ উপহাররূপে স্বামীকে প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন হইতে ইঁহাকে মরণ-চিন্তার পরিবর্তে বাঁচিবার কথাই ভাবিতে শিখাইয়াছে। নহিলে, এই মরিবার বয়সে মরিলেই বা ক্ষতি কি? ক্ষতি কি! সেকথা অতি সহজেই বুঝা যায় ধীরাকে চোখে দেখিলে!

এই সেই মেয়ে, মা মৃত্যুকালে যাহাকে তার বাপের হাতে দিয়া গিয়াছেন। বাপও গ্রহণ করিয়া অসীম স্নেহে বক্ষনীড়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ফেলিয়া গেলে এ শীর্ণা লতা আর কোন আশ্রয় পাদপ লাভ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পাইবে? ভগবান—ভগবান—যত যন্ত্রণা দিতে চাও দাও। শুধু বাঁচিয়ে দিও, ওর জন্য ভিক্ষা দিও মুমূক্ষু এই প্রাণটুকু। মেয়েটি অন্ধ, একেবারে জন্মান্ধ! ভ্রূলেখার তলে বৃহদায়তন সূক্ষ্ম নীলাভ নেত্র দুটি তার সম্পূর্ণরূপে দর্শনশক্তি-বিরহিত।

—ডাক্তারবাবু! এমন কোন ওষুধ কি নেই, যাতে করে রাত্রে ঘুম হয়?—আর খাওয়াটা একটু বাড়ে? আর বুকের কষ্টটা, মাথার যন্ত্রণাটা কম থাকে?

ডাক্তার ঈষৎ হাসিলেন। বড় দুঃখে দীর্ঘশ্বাসের মত যে আকস্মিক হাসি ফুটিয়া উঠে এ সেই সহানুভূতি ও বেদনাভরা হাসি, বলিলেন—সেই সব ওষুধই তো দিচ্ছি মা!—ডাক্তার প্রবীণ এবং এ বাড়ীতে তাঁর গতিবিধি বহুদিনের।

—খুব ভাল করে বই দেখেছেন? নূতন ওষুধ কি আর বার হয় নি? খুব টাট্‌কা ওষুধ এখানে পাওয়া যায়? আজ একবার খুব ভাল করে বই দেখে খুব ভাল ওষুধ দিন না, কাল যে বাবা একটি বারও ঘুমুতে পারেন নি।

রোগীগৃহের বাহিরে প্রভাত-সূর্য মুক্ত জগতের উপর কিরণধারা ঢালিয়া দিতে দিতে ঊর্ধ্বপথে সপ্তাশ্বযান চালিত করিতেছিলেন, রাত্রের অন্ধকার দিব্যালোকে ধুইয়া গিয়াছে, ডাক্তার চাহিয়া দেখিলেন, সৌরপতির বিপুল করুণালোকে করুণ মুখখানিকে মণ্ডিত করিয়াছে—ভিতরের সূচিভেদ্য অন্ধকারে সে আলো বিন্দুমাত্র রেখাপাত না করিলেও বাহিরে তাঁর প্রদীপ্ত কিরণ জাগরণ-কালিমাময় দৃষ্টিহীন চোখ দুটিতে এমন একটি আবেদন আনিয়াছে—দৃষ্টি উহাতে না থাক অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ডাক্তারী ব্যবসা করিতে গেলে কঠিন হইতেই হয়, নহিলে 'বড় ডাক্তার' হওয়া যায় না।

তাঁর ডাক্তারী-সাধনা-সিদ্ধ চিত্তের কাছে আসন্ন বিপদ-বিভীষিকাগ্রস্তা এই মেয়েটির করুণ আবেদনটুকু কিছুই না, কিন্তু এ জগতের আরও পাঁচটির মতো একটি বাপ হারানোর ভয়-ভীত কন্যামাত্র নয়,—পিতৃজীবনে জীবিতা অন্ধ-বালিকার সর্বস্ব আগলাইয়া রাখিবার এযে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা! অবহেলা করিতে পারে এমন কে আছে? কোমলকণ্ঠে কহিলেন,—আচ্ছা খুব ভাল করে বই দেখে খুব ভাল একটা নতুন ওষুধ দেব আজকে, কেমন তো?

—নতুন ওষুধ দেবেন? তাহলে বাবা আজ নিশ্চয় ঘুমুতে পারবেন, না? তাহলে নিশ্চয় কাল সকালে কাপে দুধ পড়ে থাকবে না! বেদানার রস সবটুকু খেতে পারবেন তো?—আপনি খুব ভাল!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, সব ভাল হবে।—আচ্ছা, আমি এখন যাই। ঐ ওষুধটা খাওয়ার কথা বলে এসেছি,—বারোটার পর আবার আসচি। মালিশ-টালিশ সব আগের মতই হবে বলেছি।

—আর নতুন ওষুধ?—সেটা দিতে দেরি করবেন কেন?

—ওঃ হ্যাঁ—সেটা ওবেলা থেকে দোব, বই দেখে ঠিক করতে হবে তো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ -ভুলে গেছলাম। আচ্ছা, মনে রাখবেন। খুব ভাল করে বই দেখে—

—নিশ্চয়!—ভাল করেই বই দেখবো মায়ি! আচ্ছা আসি। নিজের শরীরের একটু যত্ন করো মা, বড্ড পরিশ্রম করচো তুমি।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তাঁহার পায়ের ভারী জুতার শব্দ মিলাইয়া গেল। ধীরা ফিরিয়া পিতার কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া আবার কি ভাবিয়া নিবৃত্ত হইল। অগ্রসর হইয়া রেলিঙের নিকট দাঁড়াইল। এই বারান্দার নিচেই সামনের ফুল বাগান। দেখিবার মত জিনিষ সেখানে অজস্র। কিন্তু যেখান দিয়া দৃষ্ট বস্তুর ছায়া চিত্তফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে পরিচয় স্থাপন করে সেই কবাটই যখন রুদ্ধ, তখন এই বাসন্তী-প্রভাতের নির্মল নীলাকাশের উজ্জ্বল সৌরকর, বাসন্তী-প্রকৃতির সমস্ত লাবণ্যমাধুরী, অমাবস্যা রাত্রির সঙ্গে অভিন্ন। ক'দিন আগের একটা বৃষ্টিতে গাছগুলো শ্যামলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাদের সবুজ প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দাভাষ শুভ্র গোলাপি রক্ত পীত—বর্ণসাজে সাজাইয়া দিয়াছে। গাছের কেয়ারি-করা শ্রেণী, পাতা-বাহারের সারি, চায়না টবে অপূর্ব গুল্মপুষ্প, বৃক্ষজগতের বিভিন্ন জাতি গোত্র গোষ্ঠির একত্র সমাবেশ—লতায় লতায় থোকায় থোকায় ফুল দুলিতেছে, গাছে গাছে থোলো থোলো ফল ফলিয়াছে, পাখী প্রজাপতি ভ্রমর মৌমাছির ব্যস্ততার সীমা নাই। ধীরা নীরবে ধ্যানস্তিমিত শান্ত চিত্তে প্রভাতের

জ্বালাহীন সুপ্রচুর সৌন্দর্য অনুভব করিতে লাগিল। এমন কত প্রভাতেই সে এইখানে পিতার সহিত দাঁড়াইয়া তাঁর দৃষ্টির মধ্য দিয়া এদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে। হ্যাঁ—সেই প্রত্যক্ষই! তাঁহার হাত ধরিয়া উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁরই মুখে চারিপাশের তার কাছে অপরিদৃশ্যমান অপরিচিত বিশ্ব-জগতের সহিত নিজের অবগুণ্ঠিত চিত্তের পরিচয় সংস্থাপন করিয়াছিল। পাখীর ডাক শুনিয়া আজও তাঁর বর্ণিত পাখীগুলিকে মানস-চক্ষে দেখিতে পায়। কালো কোকিলের ডাক,—কুহু, কুহু, কুহু, কুউ কুউ কুউ! পাপিয়াও 'পিউ—পিউ কাঁহা' রব তুলিয়াছে যার নাম নাকি পাপিয়া! আহা পাখীগুলি—কি কোমল ক্ষুদ্র সুখস্পর্শ জীব! তার সহিত পরিচিত করিবার জন্য পিতা অনেক পাখী পায়রা খরগোস হরিণ ছাগল ময়ূর বিড়াল কুকুর কিনিয়া দিয়াছেন। সে এদের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া ইহাদের অনুভব করিত। কোন্‌টি কোন্ বর্ণের,—কাহার লেজে সাদার ছিটা, বুকে কার ধূসর রঙমাখা—সে শুনিয়া শুনিয়া চিনিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু হায়!—পিতৃ দৃষ্টির গণ্ডীঘেরা এই জগৎটুকুর বাহিরে যে ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেখানে চন্দ্র নাই সূর্য নাই, নক্ষত্র—অগ্নি—এমন কি জোনাকির আলোকও সে রাজ্যে অপরিচিত! ফুল ফল পাখী মানুষ সেই অপরিজ্ঞাত অন্ধতমসার মধ্যে কোথায় তলাইয়া আছে, সে বার্তা কে লইবে? যাক্—ক্ষতি নাই। সে অন্ধকারের রাজ্য তার অপরিচিতই থাক,—শুধু ওই স্নেহের আলোটুকু অনির্বাণ হোক!—আলো সে তো দেখে নাই। আলোর মভাব সত্য করিয়া জানে না।

হে ভগবান, তার জীবনের আলো যেন নিবাইয়া দিও না তুমি!—এইবার যাই—ঘরে ফিরিবার জন্য ফিরিতেই নিচে অচেনা কণ্ঠ শুনিতে পাইল। কাতর কণ্ঠে কেহ বলিতেছিল—দেখা হবে না?—কিছুতেই হবে না? কিন্তু তা হলে আমার যে সর্বনাশ হবে! জন্মের মত যে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো! পাঁচ-সাত মিনিটের জন্যেও একবারটি দেখা আমায় তুমি করিয়ে দাও, বড় আশা করে এতদূর ছুটে এসেছি।

যাহার নিকট বাহিরের সমস্তই শূন্য, ভিতরের সত্য তাহার নিকট তেমনি

প্রশস্ত,—শুনা যায় শব্দই বিশ্বসৃষ্টির উপাদান। সৃষ্টিকর্তার অহেতুকী আনন্দে যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছিল, তাঁর ইচ্ছাশক্তি বলে, সেই সৎ এবং অসৎ, প্রাণ এবং অ-প্রাণ, আলোক এবং অন্ধকার, মৃত্যু এবং অমৃত,—সর্বপ্রকার অস্তি এবং নাস্তি বিবর্জিত অবস্থায় সর্বপ্রথম স্পন্দনের বা শব্দ-ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়। এই স্পন্দন বা শব্দ হইতেই বিবিধ ছন্দ এবং তাহা হইতে বৈচিত্র্যময় জগতের আবির্ভাব! তাই মনোজগতে—রূপ রস গন্ধ যেখানে অপ্রকাশ শব্দই সেখানে সর্বময়। অন্ধ-বালিকার নিকট বিশ্ব তিমিরাবৃতা, তাই জগৎ তার কদাচিৎ স্পর্শ, এবং সর্বত্র শব্দময়ী! এই শব্দের বিচিত্র ছন্দেই তার পৃথিবীতে দিনরাত হয়, ঋতুপরিবর্তন চলে, বৎসর ঘুরিতে থাকে। তাহার আলোকহীন জীবনের সমুদয় অন্ধকার যখন পুঞ্জীভূত করিয়া দশদিক নীরব হয়, তখনই তার রাত্রি, পক্ষি-বৈতালিকদলের সঙ্গীতময় আহ্বানে তার জগতে দিবসাধিপের অভ্যুদয় বার্তা আসে, তাঁর জগৎ জাগান আলোক-স্রোতে নয়। যখন বিশ্বের সমস্ত দুঃখার্ত হৃদয়ের হাহাকারে হা হা করিয়া বর্ষা নামে, তার বিজুলী হানাহানির সংবাদ আঁধার দেশের রুদ্ধ বাতায়নে প্রবেশপথ পায় না, মেঘ-ডম্বরুর গুরু-গর্জন, গাছপালার সর্ সর্ শব্দ, নদীর কলরোল তাহাকে বর্ষাগমন জানাইয়া দেয়। প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া এই যে কোন বিপন্ন ভিখারী কথা কহিল, মূর্তি তার অপ্রকাশ থাক, করুণ মিনতিটুকু যে কত সত্য, মুহূর্তে বুঝিয়া লওয়া তার পক্ষে কঠিন হইল না। ভগবান যাহাকে একটা বড় জিনিষ বঞ্চিত করেন, পরিবর্তে আর একটা দেন। সেই গভীর দুঃখবোধ।—প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য রেলিঙের উপর সে ঝুঁকিয়া পড়িল, শুনিল,—তুমি ধ্বংস হবে, কি মরে যাবে, তাতে আমার কি? বাবুর ভয়ানক ব্যায়রাম, নিজেই তিনি এখন-তখন,—দেখা হবে না, পথ দেখ।

পুরাতন ভৃত্য পাঁচকড়ির স্বভাবসিদ্ধ প্রভুবাৎসল্য! কিন্তু চিরানুগত বৃদ্ধের সরল অভিব্যক্তির মধ্যে যে কি লৌহশেল বর্তমান ছিল, সে যার বুকে বিঁধিল সেই জানে! শব্দ! হায়, যে শব্দে জগৎবন্দনাগান গাহিয়া কোমল কিশলয়তুল্য পাখীগুলি স্নিগ্ধ সুখস্পর্শ ফুলের গাছে নাচিয়া বেড়ায়, সঙ্গীতের যে

স্বরে চির নিরানন্দ মূৰ্ছিত প্রাণেও আনন্দের মূর্ছনা বাজিয়া উঠে, শব্দের সেই পুলকসঞ্চারী আনন্দরূপও সময় সময় মানুষকে কি দুর্বিসহ যন্ত্রণাঘাত করিতে পারে! আর্তভাবে ধীরা অবলম্বনটাকে সজোরে চাপিয়া ধরিল! এখন-তখন! উঃ!—কি নির্ঘাত এ সংবাদ!—সত্য কি এ কথা?—না সত্য নয়! মূর্খ অজ্ঞ কর্মভীরু বৃদ্ধের অসংলগ্ন প্রলাপমাত্র! এত বড় নিষ্ঠুর সত্য আসিবার পূর্বে নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হইবে। প্রাণপণ শক্তিতে একবৎসর ধরিয়া সে শুধু এইটুকুই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, করিতেও ছাড়িবে না, এই দুঃখ ভগবান কখনও দিতে পারেন না!

আবার শব্দ আসিল—নিতান্তই তবে একমাত্র আশাও বিসর্জন দিতে হলো। হা ভগবান্! শেষকালে আমার ভাগ্যে চোর-ডাকাতের সঙ্গী হওয়াই লেখা আছে!

ধীরা ডাকিল—পাঁচকড়ি!

—কি দিদিমণি!—বলিয়া পাঁচু উপরদিকে তাকাইল। তার দৃষ্টি অনুসরণে আগন্তুকও সাগ্রহে উর্ধ্বে চাহিয়া পরক্ষণে দৃষ্টি নত করিল। মন তার একটি মুহূর্তের দুরাশা করিয়াছিল, কিন্তু চকিতের দৃষ্টিতে বুঝিল, যাহাকে সে নিরাশা সাগরের তৃণগুচ্ছ ভাবিয়াছিল সে ক্ষুদ্র একটি বালিকা মাত্র।

ধীরা বলিল--পাঁচকড়ি! ওঁকে বলো—বাবার কাছে যদি খুব বেশী দরকার থাকে, দুপুরবেলা একটুক্ষণ দেখা হতে পারে। বাবা ভাল আছেন।

শেষ কথাটা পাঁচকড়ি, আগন্তুক অথবা নিজের মনকে শুনাইয়া বলিল সে-ই বলিতে পারে। হয়ত অন্যের চাইতে এ সংবাদটা তার সদ্য আঘাতপ্রাপ্ত নিজ চিত্তের পক্ষেই প্রয়োজনীয়।

•

যে বস্তু হইতে যাহার উৎপত্তি তাহার স্থিতি-প্রকৃতিও তদ্‌গুণানুবর্তী হয়, ব্যাধি জিনিষটা তমোশক্তিসম্ভূত; তাই তামসী-নিশীথেই তার পূর্ণ বিকাশ। রাত্রিচর প্রাণীর ন্যায় দিবা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেও সঙ্কুচিত হয়।

মুরলীধরকে দিনের আলোয় অনেকটাই সুস্থ দেখাইতেছিল। ঘরখানারও

সেই আলো-আঁধারের ছম্‌ছমে ভাবটা নাই, দীর্ঘ দীর্ঘ সবুজ পর্দা সরাইয়া জানালা দরজা খোলা হইয়াছে, পুবের জানালা দিয়া প্রচুর সূর্যকিরণ ও আম্র-মুকুলের গন্ধমাখা হাওয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। রোগীর মুখে আলো পড়িয়া মুখ-খানাকে পূর্বরাত্রের মরণাপন্ন পরিবর্তে সজীব দেখাইতেছে। আর তাঁর দুইটি নেত্র তাঁর কপালের উপর অবনত যে মুখের উপর পরম স্নেহে আবদ্ধ হইতে-ছিল, সেই ছোট ছোট ঢেউতোলা চুলের বেড়ের মধ্যস্থ ছোট্ট মুখখানিকেও রাত্রে সেই সবুজ পরীর সব্‌জে মুখের পরিবর্তে অর্ধবিকশিত কুঁড়ি-ফুল ভ্রম হওয়া বিচিত্র ছিল না। তেমনই সুন্দর, তেমনই আত্মৈশ্বর্যে অনভিজ্ঞ।

মুরলীধর অতৃপ্ত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। বুকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছিল, রোধ করিয়া বলিলেন—কৈ, তোর ভিখারী এলো না? ওরা বুঝি তাড়িয়ে দিলে?

—না বাবা! তা দেবে না। ঐ যে, পায়ের শব্দ! সেই বোধ হয়।

ভৃত্য যাহাকে আনিয়াছিল তার দিকে চাহিয়া মুরলীধর চমৎকৃত হইলেন। এ মূর্তি দেখিবার আশাই করেন নাই! সংসারচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট, রুক্ষমুখ শীর্ণ মূর্তি লইয়া কেহ আসিয়া দাঁড়াইবে ইহাই তাঁর কল্পনায় ছিল, পরিবর্তে আসিল অতি সুকুমার এক তরুণ। বয়স কুড়ির অনধিক, দৃষ্টি উজ্জ্বল ও কোমল—প্রশস্ত ললাট বিষাদাচ্ছন্ন হইলেও বুদ্ধিদীপ্ত। মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন—কে গো তুমি?

আগন্তুক ঘরে ঢুকিয়া বিপন্ন বোধ করিতেছিল। নিজ স্বার্থে যতক্ষণ যুঝিতে হইয়াছে অপর পক্ষের আপত্তিগুলা বিচার করিবার অবসর ছিল না, অপ্রত্যাশিত সুযোগের ক্ষণে শয্যাপ্রসারিত মূর্তি লক্ষ্যে মনে তার বিবেকের কষা তীব্র আঘাত করিল। হায় রে স্বার্থ! এই লোকের উপরও কাজের সংঘাত ফেলিতে দ্বিধা নাই? গঙ্গাযাত্রীকে কলম্ বাড়ানোর ফরমাইস দেওয়া! প্রণাম করিয়া লজ্জা ব্যথিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—ক্ষমা করুন আপনাকে এ অবস্থায় দেখবো, ধারণা করতে পারি নি।

ধীরার মুখ কালি হইয়া গেল। সকলে ঐ এক কথাই কেন বলে? তবে কি অবস্থা তাঁর সত্যই খারাপ?

মুরলীধর একটুখানি মাথা তুলিয়া আগন্তুককে দেখিতেছিলেন। তার সঙ্কোচ দেখিয়া তাঁর শীর্ণ ওষ্ঠে করুণার হাসি ফুটিল, হস্তদ্বারা একটা চৌকি নির্দেশ করিয়া কহিলেন—বোস।

যুবক আদেশে পালঙ্কের অনতিদূরে কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িলে, আবার তাঁর অধরপ্রান্তে সেই মৃদু হাস্য দেখা দিল।—কোথা থেকে আসছো? কি প্রয়োজন বল!

যুবক একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তরে বলিল—খুলনায় আমাদের বাড়ী, আমার পিতার নাম ৺জগমোহন চট্টোপাধ্যায়, আ—

—অ্যাঁ জগ'র ছেলে তুমি? সে ছুটি নিয়েছে? হুঁ! ভালই করেছে! গিয়ে আবার সেই সেকালের মত দাবা নিয়ে বসা যাবে'খন!

—বাবা! বেশি কথা বললে কষ্ট হবে।

—ওরে না রে, ধীরা! আমায় বলতে দে—এই তো সেদিনের কথা! সেই আভাতে, সেখানে তখন আমরা দুজন বাঙ্গালী—আর দুজনে কি ভাব, এমন বুঝি নিজের ভাইয়ের সঙ্গেও হয় না! তোমার নাম?—দাঁড়াও আমিই বলচি—নিমু,—নিমু—না? নির্মলচন্দ্র। এ নাম যে আমারই রাখা। আঃ—সে সব একদিন গ্যাছে, সেদিন আর এলো না। তারপর কত কি-ই হয়ে গেল—এ-ও আর একরকম! দিন শেষ করে যেতে হবে তো।—

—বাবা! একটু বেদানার রস দিই?—অনেকক্ষণ খাও নি।

—দেবে? একটু পরে দিও। জগমোহন চলে গেছে, আহা! নির্মল! কত কথাই তোমায় দেখে মনে আসছে, উঃ সে সব বিচিত্র স্বপ্নের মত। বেশ করেছ, এসেছ। প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেছিল, কাকে যেন চাচ্ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে তোমায় দেখে মনে হলো—আমি যেন তোমাকেই খুঁজছিলাম। যেন, তোমায় পাবার জন্যই সর্বদা ভগবানকে ডেকেছি। তোমার কি কাজ আমার কাছে জানি নে—তোমার কাছে আমার যে কাজ তার তুলনায় তোমার কাজ নগণ্য। মনে হয় আজ থেকে মরণচিন্তাও আমার কাছে সহজ ঠেকবে।

—বাবা!—বাবা! বড্ড কথা কইছো!—পাঁচকড়ি। ক্ষমার মাকে বলো বাবার জন্যে বেদানার রসটা নিয়ে আসুক। আর সেইটে খেয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করবে।

গভীর কৃতজ্ঞতার আনন্দে নির্মল বাকৃশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাই ইঙ্গিত বুঝিয়া উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল—আমি এখন যাই আজ আবার বাবাকে ফিরে পেলাম! তার ডাগর চোখের পাতা কাঁপাইয়া জল ঝরিয়া পড়িল। পুরুষ মানুষ হইয়া জন্মিলেও যাহারা ঠিক পুরুষ প্রকৃতি লইয়া জন্মিতে পারে না সেও তাদেরই একজন। আর এই বয়সে অত্যন্ত বেশী সহিয়াছে।

ধীরা ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলি পিতার মাথার নিচে ঢুকাইয়া তাঁহার মস্তকাকর্ষণ-পূর্বক উত্তোলনচেষ্টা করিয়া অতি মৃদু কণ্ঠে কহিল—বাবা মাথাটা একটু তোল, তোমায় প্রণাম করবেন হয় তো!

নির্মল এবার তাঁর পায়ের গোড়ায় আসিয়া পায়ের উপর নিজের মাথাটা বারেক ঠেকাইয়া লইল এবং তারপর দ্বিতীয় মুহূর্তের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল। নিজের উপর আর বেশি বিশ্বাস রাখা সম্ভব ছিল না, কান্নায় বুক ফুলিতেছিল।

আগন্তুক চলিয়া গেলে ক্ষণকাল এই অতর্কিত সাক্ষাতের বিস্ময় ও অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদের বেদনা মুরলীধরের দুর্বলচিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল, তারপর আত্মসংবৃত হইয়া কন্যার দিকে চাহিলেন। মৃণ্ময় পুত্তলীর ন্যায় স্তব্ধ সে তাঁর পিঠের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া আছে—এমন করিয়া সেই এতটুকু বেলা হইতে তাঁকে সে অনুভব করিয়া থাকে, এইটুকুই তাঁদের যোগসূত্র। হঠাৎ মেয়ের দিকে চাহিয়া মুরলীধর কহিয়া উঠিলেন—আচ্ছা তোর কি মনে হয়? নির্মলের কি বিয়ে হয়ে গেছে? সে কি আবার দেশে ফিরে যেতে চাইবে?

—তা আমি কি জানি বাবা? যদিই চায় তাতেই বা আমাদের কি ক্ষতি?

—ক্ষতি কি? না ক্ষতি—তেমন—আচ্ছা কে ওকে এমন অসময়ে আমাদের মধ্যে এনে দিলে? আঃ।—নিশ্চয় যিনি আমায় এমন সুযোগ

দিয়েছেন, তিনিই তা ব্যর্থ হতে দেবেন না! নিশ্চয় আমার এতদিনের কাতর প্রার্থনা—

—বাবা! বাবা—তুমি কেবলই আজ কথা কইছো, ঘুমুতে চেষ্টা করছো কই?

—ওরে! আজ আমার মন যে কত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে জানতে পারলে তুই আমায় ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা হতে বলতিস নে, আহা! ওর মুখখানিতে যে কি ভাল জিনিষই দেখতে পেলাম। যে রকম করুণ চোখে সে আমার দিকে চাইছিল, তাতেই আমি বুঝতে পেরেছি, ভগবান ব্রজর মধ্যে দিয়ে যা আমাকে দিতে পারেন নি; এই বন্ধুর ছেলেটিকে দিয়ে আজ আমার সেই পাওনাটুকু শোধ করবার জন্যই তাকে বিপন্ন করে এতদূরে পাঠিয়ে দে'ছেন! না, না, ধীরা মায়ি! রাগ করিস নে মায়ি—এইবার চুপ করছি।—এইবার তুই তোর দুষ্টু ছেলেকে ঘুম পাড়া আর বাধা দেবে না সে। মন আমার আজ বড় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রে! অনেক দিনের পুরনো কথা কেবল মনে আসছে, ভবিষ্যৎটাতেও যেন ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে। আচ্ছা—আর কথা কবো না। নে, চোখের উপর এইবার তোর আঙ্গুলগুলি বুলিয়ে নে যা। দেখ্—খুব শীগ্গির ঘুমিয়ে পড়ি কিনা দেখ! এমন মনে সহজেই যে ঘুম আসে।

১২

বিপুল পিতৃঋণ সঙ্গে করিয়া ভিখারীবেশে নির্মল যেদিন পিতৃবন্ধুর দয়া ভিক্ষা করিতে তাঁর প্রাসাদতুল্য হর্ম্যদ্বারে প্রবেশ প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই দয়া যে এমন শতবাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবে, সে কল্পনা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। জীবনের যে ভীষণ মুহূর্তে সংসারানভিজ্ঞ কিশোরের চক্ষে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দিগন্ত বিস্তৃত অগ্নিক্ষেত্রে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, সেই অন্তহীন নিরাশার সমুদ্রে মাত্র তৃণগুচ্ছের মতই সে এই দুরাশাকে

অবলম্বন করিয়া বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দিয়াছে। এদিকে কোন সুদূর অতীতের বন্ধু, তার সহিত আঠার বৎসর সাক্ষাৎ নাই—তারই ছেলের জন্য একরাশি টাকা ঢালা, বাতুলেই করে।

কিন্তু এ জগতে কখন কখন বড় আশাতেও ছাই পড়ে ; আবার কখন ক্ষুদ্র আশালতায়ও প্রচুর ফল ধরে। এই ছেলেটি ছেলেবেলায় মা-হারা—সেই সঙ্গে বাপের স্নেহ, নিজের ঘরের আশ্রয় সবই হারাইয়া প্রথম জীবনে যে আশা-লতার গোড়াতে ছাই পড়িয়াছে বোধ করি এবার পিতৃবন্ধুর অপ্রত্যাশিত স্নেহনির্ঝরের তলায় টানিয়া আনিয়া ভাগ্যবিধাতা নিজের সে ক্রটি সংশোধন করিলেন।

মুরলীধর নির্মলকে পাইয়া যে নিধি পাইলেন সেই উচ্ছ্বাসের মুখে এত দুঃখের উপার্জিত ধন দৌলত, বোধ করি সবই তিনি ধরিয়া দিতে পারিতেন। নির্মল হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া টাকা লইল। এবং ঋণশোধের জন্য একটি চাকরীর সুপারিশ চাহিবে স্থির করিল। একবৎসরের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তার নিকট রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৎসরকাল অপেক্ষা সম্ভব নয়। পিসিমার ছেলে যতীশ্বর কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ে। সেখানে স্থান সঙ্কুলান না হয় এমন নয়, এতদিন ভার লইয়া এই সময়ে পিসেমহাশয় তাকে ঠেলিয়া ফেলিবেন এ সন্দেহেও তাঁকে অপমান করা হয়, কিন্তু নিজেই সে আশা উদ্যমে পরি-পূর্ণ ছাত্রজীবনে ফিরিয়া যাইতে কুণ্ঠাবোধ করিল। যদিও সে-জীবন তার কাছে বড়ই লোভনীয়। মন যখন বড় বেশী কাতর হয়, তখন সে তাহাকে বুঝাইয়া বলে, কাঙ্গালের ঘোড়া-রোগ সাজে না। যার মাথায় বিশহাজার টাকা দেনা, যার মা-ভাইকে পেটের দায়ে পরাশ্রয়ী হতে হয়, সে কোন হিসাবে পরের উপর ভার চাপাইয়া একজামিন্ পাশের ভাবনা ভাবিবে? তার চাইতে ইঁহার নিকট সুপারিশ-চিঠি লইয়া চাকরীর চেষ্টা করাই ভাল। এর পর আর কে আমার মুরুব্বী হইবার আছে?

একটা উপায় গ্রাজুয়েট সে, পিসিমার মতে কোন ধনী কন্যাকে বিবাহ করা। না, তা হয় না! এই চিন্তাকে যে আড়াল করে খনখনে টাকার

চেয়েও সে লোভনীয়া। তার হাত ধরিয়া ভিক্ষা করাকেও শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই বিপুল ঋণ ?—সমস্ত ঝাপসা হইয়া যায়।

মুরলীধর নিজে ডাকিয়া যদি তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় কথা না তুলিতেন, তাহা হইলে হয়ত নিজ হইতে সে বিষয়ে কথা বলা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইত না ; এতবড় কলঙ্ক লাঞ্ছনা হইতে যিনি রক্ষা করিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে বিদায়ের কথা কহা কি সহজ ? বিশেষ তিনি যখন এইরূপ রোগশয্যাশায়ী, পুত্রস্নেহে বঞ্চিত এবং তাহার প্রতি পিতৃবৎ স্নেহপরায়ণ।

পশ্চিমের জানালা দিয়া তিনি আকাশে চাহিয়াছিলেন। ধীরা তাঁর কানের পাশের চুলগুলি আঙ্গুল দিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। নির্মল পায়ের গোড়ায় বসিয়া পা টিপিয়া দিতে আরম্ভ করিল। সে যখনই মুরলীধরের আহ্বানে কাছে আসে পদসেবা করিতে বসিবার বারণ মানে না।

স্থর্যোদয়ের স্মৃতি-বিজড়িত আকাশ কি বৈচিত্র্যময়! অতীত গৌরব এর বিশাল বক্ষে শত শাসন-লিপি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখে, পৃথিবীর সকল বর্ণকে পরিহাস করিয়া অযুত বর্ণের ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া চলিতে থাকে। অনন্তের বিরাট বক্ষে কোথাও সুনীল জলধি গর্জনহীন গানে শ্বেত-তরঙ্গে নর্তনশীল, কোথাও ধূসর গিরিশ্রেণী রক্তরাগকিরীট, কোথাও স্বর্ণচূড় অভেদ্য দুর্গপ্রাকার সুমসৃণ পাটলবর্ণে ভীমকান্তি বিস্তার করিয়াছে। চাহিয়া থাকিতে ভাল লাগে।

মুরলীধর এই সমস্ত নিজে দেখিয়া ধীরাকেও দেখাইয়া দেন। তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে সঙ্কোচ উভয়ের উভয়গত মনকে জড়াইয়া রহিল। যেখানে সংসারের সহিত যোগ আছে, সেখানে নিজেদের এত বড় দুর্ভাগ্যের কাহিনী ভুলিয়া যাওয়া পিতা কন্যা কাহারও পক্ষে সহজ নয়। পাখী যেমন পক্ষোদ্ভিন্ন দুঃস্থ শাবকটিকে পত্রনিবিড় ডালে লুকাইয়া রাখে, তেমনই করিয়া লোকলোচনের অন্তরালে ভাগ্যহীনা সন্তানটিকেও তিনি সশঙ্কচিত্তে লুকাইয়া ফিরিতেন।

ক্ষণপরে মুরলীধর বহির্মুখী দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিলেন, নির্মলের সহিত চোখাচোখি হইল। উভয়েরই ওষ্ঠে একটু মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল।

মুরলীধরের হাস্যে তাঁর মানসিক চিন্তার ছায়াপাত হইল—'জিনিষটি খাঁটি।' নির্মলের হাসিতে শুধু একফোঁটা অকৃত্রিম আনন্দ ছিল, আর কিছুই না। তাই অভিজ্ঞ বৃদ্ধের চক্ষে বোধ করি সে হাসি মিষ্ট ঠেকিল।

হাতখানি পাতিয়া দিতেই সে নিজের দুই হাতের মধ্যে তাহা তুলিয়া লইল। আবার একটি আশানন্দের শীর্ণ হাস্যরেখা রুগ্ণের ম্লান মুখকে ঈষৎ উজ্জ্বল করিল, সঙ্গে সঙ্গেই একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাসও বাহির হইয়া আসিল। —একজামিনটা তাহলে দেওয়া হল না?

এ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিতের পুঞ্জীভূত বেদনায় ঢেউ লাগিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কই হল!

—আসছে বৎসর দেবার ইচ্ছে আছে?

—ইচ্ছা! হ্যাঁ তা—তা ইচ্ছা থাকলেই বা কি! পড়াশোনা নিয়ে থাকলে ত চলবে না!—একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া কহিল —মনে করছি, একটা চাকরী যদি পাই, কিন্তু—একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।—কিন্তু আজকালকার দিনে সুপারিশ ছাড়া চাকরী কে দেবে? —এই কথা বলিতে গিয়া আবেদনের ভাষা জিহ্বায় জড়াইয়া গেল। ক্রমাগত 'দেহি' 'দেহি' বলিতে আজও লজ্জা করে, ভিক্ষা এখনও ঠিক অভ্যস্থ হয় নাই।

মুরলীধর একটু প্রতীক্ষা করিয়া কহিলেন—চাকরী করতে চাও? মন্দ কি? ইচ্ছা করলে পড়তেও পারতে।

নির্মল এ ইঙ্গিত বুঝিল না। সরলভাবে প্রশ্ন করিল—কেমন করে? —উত্তর না পাইয়া পুনশ্চ কহিল—আমার যে অনেক দেনা; তা ভিন্ন খাওয়ার অতগুলি লোকও রয়েছেন।

—দেনার জন্য ব্যস্ত হয়ো না; মনে কর ও দেনা তোমার নেই। যাক, যাক, পরে সে সব বোঝাপড়া হবে—এক্ষণি তো তোমায় শোধ দিতে হচ্ছে না। আমি বলি কতকগুলো পাশ না করে যদি বিষয় কার্য শিখতে পার, সে খুব মন্দ হবে কি? তোমায় বলবো বলবো ভাবছি, পাছে কিছু

মনে কর তাই সাহস করে বলি নি। ব্যবসা লক্ষ্মীলাভের একটা নিশ্চিত উপায়। এতে শুধু পরিশ্রম আর সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।

মুহূর্তে নির্মলের মনের পর্দায় একখানা বিভিন্ন ছায়াছবি ফুটিয়া উঠিল। অধ্যবসায়ের ফলে ব্যবসায় লক্ষ্মী যেন তার পূজা-মন্দিরে ধরা দিয়াছেন! সে ব্যগ্র হইয়া দুই হাতে তাঁর চরণ স্পর্শ করিল, রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো।

—কাল হতেই আমার আফিসে কাজ শিখতে আরম্ভ কর, আমি ব্যবস্থা করে দেব; অসুবিধা হবে না।

সূর্যের উপর চলন্ত মেঘ আসিয়া পড়িলে যেমন ম্লান দেখায়, তেমনই মলিন হইয়া গিয়া যুবক কহিল—এইখানে?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—হঁ্যা।

উত্থিত প্রায় নিশ্বাসটা ভিতরে চাপিয়া রাখিয়া সে কহিল—আচ্ছা।

১৩

দিনকতক সকল প্রবাসীর মতই গৃহহারা চিত্ত উড়ু উড়ু করিয়া অবশেষে অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিল এবং নূতন গৃহের প্রতিষ্ঠাকল্পে মন আবার আর একরকম করিয়া আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথিবার চেষ্টায় সূঁচে সুতা পরাইল।

নির্মলের চিত্তে এখনও যথার্থ সাংসারিক কর্মজীবনের ক্লান্তিছায়ার ছাপ নামে নাই, বয়স হিসাবেও সে এখনও বালক ভিন্ন আর কি? তাই এমন অনেক কল্পনাকেই দ্বিধাহীন চিত্তে হৃদয়ে স্থান দেয় যাহা বিজ্ঞজনের নিকট গল্প কথা।

নিজের ভবিষ্যৎ সে রচনা করিয়া লইয়াছিল। ঐ রেঙ্গুন নদীর ধারে —যেখানে দিগন্তরেখা সবুজ মাঠের বুকের কাছে মাথা নত করিয়াছে অঘ্রাণে যার সোনার-ক্ষেতে বর্মী চাষারা আবালবৃদ্ধ অন্নক্লিষ্ট জগতের জন্য অন্নসত্র খুলিয়া দেয় তারই কিনারায় সে সংসার পাতিবে। ম

শাশুড়ী ভাইগুলি আর অপর্ণা, অপর্ণাকে সে ধীরার সহিত পরিচয় করাইবে। এই ধীরা হইতেই তো তাহার সব। যদি ধীরা পিতার সাক্ষাৎ না করাইয়া দিত তার ভাগ্যে কি ঘটিত, কে জানে! শুধু তারই জন্য সে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে।

কৃতজ্ঞতায় দ্রবীভূত হইয়া রক্ষাকর্ত্রীকে প্রণাম করিতে সাধ হয়, ভরসা হয় না। তার মধ্যে এমন একটি দূরত্বের ব্যবধান আছে, মানবীয় কোন বৃত্তি লইয়া তার কাছে পৌছান যায় না। রোগশয্যাপার্শ্বে শরীরিণী সেবা-মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া একদিকে গভীর শ্রদ্ধায়, অপরপক্ষে তার ব্যর্থ জীবনের দুর্বিসহ দুঃখভারে ইহার প্রতি করুণায় মমতায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে মাস কয়েকের মধ্যেই সে মুখার্জী এণ্ড হ্যাম্পডেন কোম্পানীর কাজ সম্বন্ধে বেশ একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিল এবং বৎসর মধ্যে তার চাকুরী পাকা হইয়া বেতন বৃদ্ধি হইল।

মনে তার সুখের সীমা ছিল না। এতদিন যে বেতন পাইয়াছে, মাতাকে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া, বাকি টাকা ধার শোধের জন্য সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখিতেছিল। প্রতিমাসেই একবার করিয়া সৌদামিনীর নামে আর একখানি মণিঅর্ডার লিখিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে রোধ করিতে হইয়াছে। তাঁর সেই প্রশান্ত গম্ভীর্যপূর্ণ মুখ স্মরণে আসিয়া তাহাকেই ইহাতে বাধা দিয়াছে।

সুযোগ বুঝিয়া নির্মল তার জমানো হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ কল্পে খাতাঞ্জির নিকট জমা দিবার কথা জানাইলে, আবার সেই মৃদুহাস্য মুরলীধরের শুষ্ক অধর রঞ্জিত করিল। কহিলেন—ব্যস্ত কেন? বাড়ীটা ছাড়াও।

বাড়ীর কথায় নির্মলের নিশ্বাস পড়িল। প্রপিতামহের ভিটা!

—কতদিন এসেছ তুমি?

—এক বৎসর।

—এক বৎসর! এতদিন এসেছ? মনে হচ্ছে এই সেদিন।

সস্মিত হাস্যে উত্তর দিল—সাড়ে এগার মাস হয়ে গেল। মার্চ মাসের মাঝামাঝি এসেছিলাম, ১১ই মার্চ, শনিবার।

—দিনটা আমার মনে আছে। দেখ, ঐ টাকা তুমি আমার কলকাতার এটর্নি অফিসে পাঠিয়ে দাও। বাকি টাকা ওরাই দিয়ে বাড়ী খালাস করে নেবে। তোমার মা, বিধবা মানুষ—তিনি এদেশে আসবেন মনে হয় না। নিজের ভিটেয় থাকতেই হয়ত পছন্দ করবেন। ঐখানেই খরচ পাঠিয়ে দিও।

ইনি তাদের জন্য কতখানি ভাবিয়াছেন, কি মহত্বপূর্ণ হৃদয়? পরের জন্য এমন ভাবে তার পক্ষের প্রত্যেক দায়িত্বটুকুতে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা দেওয়া এবং অর্থব্যয় ক'জন করিতে পারে? কোনমতে বলিয়া ফেলিল—আমায় এত বেশী দিচ্ছেন যে—

—ভয় হচ্ছে? কেমন করে শোধ করবে?—এই?

নির্মলের আকর্ণ ললাট আরক্ত হইয়া উঠিল। এত প্রাপ্তি যেন সে সহিতে পারিতেছিল না! এই পাওয়া একদিকে যেমন প্রদাতার মহত্ত্বে তাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞ ভক্তিতে ভরাইয়া তুলিতেছিল, অন্যদিকে অপ্রতিবিধেয় প্রতিগ্রহের লজ্জা ও চিন্তা তাহাকে পীড়া দিতেছিল। প্রতিদানে যে তার এতটুকু শক্তিই নাই?

মুরলীধর স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তার লজ্জিত মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ডাকিলেন—নির্মল!

—আজ্ঞে?

—ধার শোধের জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তোমায় আমি শুধু হাতে ধার দিই নি। মহত্ব কিছু নেই, খুব চোটা সুদেই দিচ্ছি। যে দিন দরকার হবে, পাওনাগণ্ডা মায় সুদের সুদ হিসাব করে ফিরিয়ে নোবো। আপাততঃ তোমার মাকে তাঁর নিজের ঘর ফিরিয়ে দাও। তাঁর প্রতিও আমার কর্তব্য আছে, তিনি জগুর স্ত্রী।

সুদের কথা যাই বলুন! নির্মল তাঁর প্রতি ভক্তি-উচ্ছ্বসিত না হইয়া পারিল না।

আগামী বর্ষার পূর্বেই ছুটির কথা পাড়িবে। বেশি দিন নয়—দিন পনেরোর ছুটি লইয়া বিবাহান্তে মাতাপুত্রীকে লইয়া ফিরিয়া আসিবে। মনে পড়িল নিজের বিবাহের ঘটকালি তাহাকেই পাকা করিতে হইবে। পূর্বকথা স্মরণে মুখখানা সলজ্জ-আনন্দে আরক্ত হইয়া উঠিল। পিসিমার কাছে নিজে বলিতে পারিবে না, যতীকে দিয়া বলাইতে হইবে।—ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

১৪

মুরলীধরের বাড়ীকে বাড়ী না বলিয়া প্রাসাদ বলাই সঙ্গত। রেঙ্গুন সহরে এমন বাড়ী কম ছিল।

টেনিস খেলা চলিতেছে। কয়েকটি ইংরাজ-নরনারী, একটি উচ্চপদস্থ বর্মীদম্পতী এবং গৃহস্বামীর পুত্র ব্রজরাজ এই দলে আছে। ব্রজরাজ ও তাঁদের অংশীদার-কন্যা মিস্ হ্যাম্পডেন দুইজনে ক্রীড়া-বিরত দ্রষ্টা হইয়াছিলেন। দু-একটি ছোট ছেলেমেয়ে রঙ্গীন পোষাকে প্রজাপতির মত খেলিয়া বেড়াইতেছিল। তাদের হাসির লহর তরল বায়ুস্রোতে ভাসিতেছিল। হাসিমাখা মুখগুলি ফুলের মত সবুজপত্র মণ্ডিত বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া, মেঘযুক্ত নক্ষত্রবিন্দুর মতই ফুটিয়া উঠিতেছে।

এথেল হ্যাম্পডেন কহিলেন—মিঃ চাটার্জিকে দেখছি না! তিনি কি সর্বদাই আফিসে থাকেন?

ব্রজর খেলার দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে মিস হ্যাম্পডেনের স্বর্ণসূত্র-কেশ-জালের মধ্যে সায়াহ্ন তপনের স্বর্ণরশ্মির লুটাপুটি খাওয়া দেখিতেছিল। তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর দিল—না থেকে করবে কি? খাতাপত্র ঘাঁটা ও অঙ্ক কষা ছাড়া আর তো কিছুই জানে না।

বলিয়া সঙ্গিনীর কৌতুকচঞ্চল সুনীল নেত্রের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল—বলুন দেখি, মানুষ কেবল হিসাব কষতেই জন্মেছে?

এথেলও মৃদু হাসিলেন, কিন্তু হাসিটা প্রসাদ-প্রসন্ন নয়, কহিলেন—তা জন্মায় নি, কিন্তু সকলেই যদি হিসাবকে বাঘ দেখে, তাহলে সংসার বে-হিসাবী হয়ে পড়ে।

মিঃ চ্যাটাজার জন্য এই কুমারীটির মাথাব্যথা ব্রজ পছন্দ করে না, মুখখানা সে ভারি করিল।

ঘরের বাহিরে—হাসিখেলা চলিতেছিল ; বাড়ীর মধ্যে অনতিবৃহৎ অফিস ঘরে দুইজন সহকারী লইয়া সেই স্নিগ্ধ সুন্দর অপরাহ্ণে মিঃ চ্যাটার্জী আয়-ব্যয়ের ত্রৈমাসিক ঠিক করিতে নিবিষ্ট।

'মিঃ চ্যাটার্জী' বলিয়া উঁহাদের দেখাদেখি নির্মলের নাম উল্লেখ করা গেল বটে, কিন্তু 'মিষ্টার' বলিতে বাঙ্গালী ছেলেদের যেমনটা বুঝায়, এই চাটুয্যে-মহাশয়ের সেই গুণগ্রামের বড় কিছু বর্তমান না থাকায় ইহাকে নিজ নামে উল্লেখ করাই ভাল। নেকটাই ওর মুখে সাহেবী হাসি কাশি রং চং কিছুই সে রপ্ত করিতে না পারিলেও একমাত্র সম্বল তার গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তরুণী মেয়েটির চোখে নির্মল সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও 'মিষ্টার' হইতে পাইয়াছে।

এই বাড়ীতেই মুখার্জী এবং হ্যাম্পডেন কোম্পানীর অফিস। বাড়ীতে লোক কম ; নীচতলাটা অফিসের কাজে লাগে। কাজ সারিয়া অফিসের ছুটি হইয়া গিয়াছে, নির্মলের অফিসের দুজন কেরাণী এখনও ছুটি পায় নাই!

রাশি রাশি কাগজপত্র ফাইল করিয়া সাজান ; আবশ্যক হিসাব নোট করিয়া খাতায় তোলা হইতেছিল।

সাড়ে-ছয়টা বাজিল। সূর্যাস্তের সোনা মিলানো লাল আলো তাদের কর্মরত ললাটের উপর স্মিতদৃষ্টি মেলিয়া জননীর স্নেহদৃষ্টির মত মৃদু অনুযোগে কহিতে লাগিল—কত খাটিবে? সারাদিনের কাজ শেষ করিয়া আমিই তো বিদায় লইতেছি, ঐ ঘন নিবিড় সেগুনগাছের ছায়ায় বিশ্রামে যাইব। সে অনুজ্ঞা বোধ করি নির্মলের কানে পৌঁছিল, কলমদানে কলম ফেলিয়া মাথা তুলিল। কেরাণী দুজন তখনও কার্যরত।

নির্মল তাদের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা সাড়ে নয়টা হইতে ইহারা কাজ

করিয়া চলিয়াছে, মনটা আর্দ্র হইয়া আসিল।—আপনারা বাড়ী যান ; আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, বাকিটুকু আমি সেরে নেবো।

সহৃদয়তার মত কাজ লইবার এমন সহজ পন্থা আর নাই! যারা ঈষৎ বিরক্তিবোধ করিতেছিল, ঊর্ধ্বতনের আন্তরিকতায় ক্ষণমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। বলিয়া উঠিল—আপনি তো সর্বক্ষণ খাটছেন, শেষ হয়ে যাক।

আপনাদের চেয়ে আমার বয়সও তো কম, ছেড়েই দিন, শেষ করে ফেলছি। এ রকম কতবারই হইয়াছে। যে বস্তু কেরাণী জীবনে একান্ত দুর্লভ ইহারা সেই উডুম্বর-পুষ্প সদৃশ মনিবের সহানুভূতির নিদর্শন এর মধ্য দিয়া পাইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার সহিত মাথা নোয়াইয়া চলিয়া গেল। নির্মল হিসাব কষা আরম্ভ করায় তাদের প্রসন্ন দৃষ্টির আশীর্বাদটুকু কুড়াইয়া লওয়া ঘটিল না। না ঘটুক,—ফিরিয়া পাওয়ার আশা করিয়া কেহ কর্তব্য করে না। পাইলে তৃপ্তি আসে, না পাইলে ক্ষোভ জাগে না।

বাড়ীখানা যেমন বৃহৎ তেমনই সুসজ্জিত। অধ্যবসায়বলে যাঁরাই অর্থোপার্জন করেন, তাঁরা প্রথমেই গৃহ-সম্পত্তির উপর আকৃষ্ট হন। তারপর কল্পনার প্রাসাদ বাস্তবে আনিয়া সেকালের লোকেরা বারমাসে তের-পার্বণে ব্রাহ্মণ-কুটুম্ব, আত্মীয়-ভরণে, কাঙ্গালী-ভোজনে, পুরাণকথনে দশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণের চেষ্টাও করিতেন। এখনকার এঁরা বুঝিয়াছেন পূজাপার্বণ এসব অনার্যপ্রথা—এ সমস্ত কোলারীয় দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতি আদিবাসীদের হইতে আসিয়াছে,—আর্য-সন্তানের পক্ষে অনাবশ্যক। লোভী-ব্রাহ্মণেরা ভোজন প্রীতিবশেই দেশের সর্বনাশকর জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া লোক ঠকাইয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিতেছিল,—ঠকা হইবে না! কাঙ্গালী-ভোজনে আলস্যের প্রশ্রয় পাপ! বাজে জিনিষে অর্থ ব্যয় না করিয়া তাঁরা হাল ফ্যাসনের গৃহসজ্জায় বাড়ীখানি পটের ছবি করিয়া তোলেন। মধ্যে মধ্যে এই সব ইন্দ্রালয়ে আধুনিক অমর-অমরীর পদার্পণে স্বর সমাজেরও প্রতিষ্ঠা ঘটে!—ইহাতে ধূর্ত ব্রাহ্মণেরা জব্দ হয়। এ সভার সুধা এবং সুখাদ্য পুরাতন পন্থী

পুরোহিত বংশধরদের নোংরা-হাতের স্পর্শে দূষিত হইতে পায় না, সে সকল তদপেক্ষা শতগুণে অভিজাত মহামান্য পিরু-খানসামার দ্বারা পবিত্রীকৃত। মুরলীধর এই শ্রেণীরই লোক ছিলেন।

নির্মল সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া সম্মুখের ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া দাড়াইল। ধীরা সর্বদাই বাপের কাছে থাকে, সে ঘরে ঢুকিয়া পড়া যায় না। একটা খোলা জানালার নিকট দাঁড়াইল। অবসর পাইতেই মনে অবসরের চিন্তাও দেখা দিবে, কবে যে সে তাদের কাছে যাইতে পাইবে? হায়! সে এখানে এই রাজভোগে ডুবিয়া আছে,—আর সেখানে মাতা-পুত্রীতে অধীন জীবনের শত লাঞ্ছনায় দিনপাত করিতেছে! হে ভগবান! এঁকে একটু ভাল করিয়া দাও! সে একবার তাদের কাছে যাইতে পাইলেই ত তাদের সকল দুঃখের অবসান হয়।

পশ্চাতে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হইল! এ কি তার কল্পনা? দূর নীলাম্বুধির ওপারে সুদূর পশ্চিম বঙ্গের পল্লীগৃহে পরিচিত রন্ধন চুল্লীর পার্শ্বে দীর্ঘ প্রতীক্ষার ক্লান্তিতে যে দীর্ঘশ্বাস নর্তনশীল নীলশিখার সরল ঊর্ধ্বগতি ভাঙ্গিয়া দিতেছে সে নিঃশ্বাস কি এতদূরেও ভাসিয়া আসে?

ফিরিয়া দেখিল, ধীরা। ঘরের মেঝেয় পুরু গালিচা পাতা, কখন সে প্রবেশ করিয়াছিল জানা যায় নাই, বিশেষ তার গতি অতি মন্থর, সকল অন্ধেরই বুঝি এইরূপ হয়।

সসম্ভ্রমে কহিল—আমি ওঘরে যেতে পারি কি?

ধীরাও তার অবস্থিতি জানিতে পারে নাই। সাড়া পাইয়া চমকিত হইল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার বিবর্ণ গণ্ডদ্বয় মনের কোন অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে ঈষৎ রক্তাভা লাভ করিল, কণ্ঠেও বিষাদের সহিত একটু আশার ঝঙ্কার পাওয়া গেল। চঞ্চল স্বরে কহিয়া উঠিল—আপনি এসেছেন! বাবা আজ ভাল নেই, কেমন যেন ছটফট করছেন, দেখবেন চলুন তো! ডাক্তার বললেন—ও কিছু না।

বলিতে বলিতে বালিকার সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। দুর্বলতার প্রবল আক্রমণ অনিবার্য বুঝিয়া সে নীরব হইল। ভগবান একদিক দিয়া

এবং সে আর এক দিক দিয়া নিজের অন্তরটাকে—জগৎ-ছবি তার কাছে যেমন আবৃত—তেমন করিয়াই ঢাকিয়া রাখে। অতিবড় সহানুভূতির পাত্র বলিয়াই যেন ঐ বস্তুটার সাক্ষাৎ পরিচয়ে আসিতে ভয় পায়। মুখের কথা তার এমনই কদাচিৎ যে, নির্মল এতদিনের ভিতর এতগুলা কথা কোন দিন তার মুখে শুনিতে পাইয়াছে মনে হয় না! তার এই চলিষ্ণুভাব তাহাকেও তাই ভীত করিল। সে ভাব ঢাকিয়া অভয় দিয়া কহিল—গরমটা আজ বেশি, সেইজন্যেই বোধ করি একটু কষ্ট হচ্চে!

তাঁর ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই ধীরাও মৃদু-সঞ্চারী গতিতে উহাকে অনুসরণ করিল। জন্মান্ধ চিরপরিচিত গৃহে চক্ষুষ্মানের মতই অসঙ্কোচগতি, কেবল জন্মগত অভ্যাসানুযায়ী ধীরা গতিশীলা।

১৫

প্রকাণ্ড বাড়ীর অসংখ্য ঘর কত বিচিত্র সাজে সাজিয়া নীরব স্তব্ধ পড়িয়া থাকে! দাসদাসীদের মার্জন-হস্ত এবং ডাক্তারের আসা-যাওয়ার পদস্পর্শ ভিন্ন এদের সহিত অন্যজন সংস্পর্শ বহুদিন নাই। এমন কয়টা ঘর পার হইয়া রোগীর গৃহদ্বারে আসিয়া উহারা দাঁড়াইল। ধীরা প্রবেশ করিতে রোগীর দৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইল; প্রশ্ন করিলেন—কে?

—আমি বাবা—বলিয়া ধীরা পিতার খাটের দিকে অগ্রসর হইল।

—আঃ! রাত্রিদিন এই বন্ধ ঘরে তুমি পড়ে থাক্‌বে! এত করে পাঠালাম; দু মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলে? বড় অন্যায় করচো।

—আমি এক্ষুণি যাচ্চি!—ধীরা পিতার কপালে হাত রাখিল—বাবা তুমি একটু ভাল আছ? তোমার কষ্ট হচ্চে না?—মুখখানা নত হইয়া ললাটের কাছে দুখানি কোমল ওষ্ঠাধর প্রায় নামিয়া আসিয়াছিল। দিনের মধ্যে এমন দশবারও আসে; কিন্তু এবার অপরিতৃপ্তই ফিরিল। মনে পড়িল, এ ঘরে তারা দুটি প্রাণী একা নয়; আরও কেহ আছে। আবার একবার পিতার

মুখে চোখে হাত বুলাইয়া সেইটুকুকে যেন নিজের মধ্যে ভরিয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। নির্মল এ দৃশ্য দেখিল। দেখিতে দেখিতে মনটা একান্ত উতলা হইয়া উঠিল। ওই নীরব স্পর্শের মধ্যে কি মহান পূজা অব্যক্ত রহিয়াছে। উঃ, কি গভীর নির্ভরতাপূর্ণ ভালবাসা মুমূর্ষু পিতার প্রতি লইয়া এ বালিকার প্রত্যেক অনুপলটি পর্যন্ত কাটিতেছে! ভগবান!— এ মেয়ের ভবিষ্যতের কথা তুমি ভাবিতেছ কি?

—কেমন আছেন?

—ঐ একই, বোসো। ধীরু!

—কি বাবা? আমিও কি বসবো?

—পাগ্‌লি! তুই যে রাত্রিদিনই আমার কাছে বসে আছিস। দু বৎসর —আজ এই বাষট্টি বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ দু বৎসর, এই ঘরের মধ্যে এমনি করেই যে তোর কেটে গেল! তবু বসার সাধ মিটলো না রে?

ধীরা দু-এক পা গিয়াই আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল; পিতার বাক্যে নির্মলের সান্নিধ্যস্মরণে লজ্জা পাইয়া মৃদু মৃদু কহিল—চব্বিশ ঘণ্টা কই থাকি? রাত্রে সারাক্ষণ কি জেগে থাকি!

মুরলীধর হাসিলেন—তুমি যা ঘুমোও, সে আর আমি জানি নে! ঘরে আলো দিতে বলে দেনা মা!

নির্মল তাঁর পায়ে হাত বুলাইতেছিল। পিতাপুত্রীর কথাগুলা তার মনে করুণার তুলিকায় শ্রদ্ধাসহানুভূতি প্রলিপ্ত হইয়া যাইতেছিল। রহস্যপূর্ণা এই অন্ধ-নারীর জীবন-ইতিহাসের যে গুপ্ত অধ্যায় তার সম্বন্ধে একমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে ব্যক্ত হইল, সেটুকু অতীতের ত্যাগশীলা নারীদের কাহারও হইতে তুচ্ছ নয়। উৎসর্গিত এই হৃদয়ের অক্লান্ত সেবার ইতিহাস যযাতি সন্তান পুরুর মতই নৈষ্ঠিক পিতৃপরায়ণতার একটি করুণ কাহিনী।

ধীরা লজ্জা পাইয়া ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া বলিল,—আলো তো তোমার চোখে সয় না বাবা?

—মধ্যে মধ্যে তোদের মুখগুলি না দেখে কি থাকতে পারি রে! নির্মল!

কাছে এসে কপালটায় হাত দাও। আঃ তোমার হাত কি ঠাণ্ডা—কপালটা জুড়িয়ে গেল! ধীরার হাত এমন ঠাণ্ডা নয়, কি করেই বা হবে চব্বিশ ঘণ্টা এই জ্বলন্ত গায়ে হাত দিয়েই রেখেছে যে! নির্মল! আমার যা কষ্ট কাউকে তা বলবার নয়। লোকে জানে আমি বড় সুখী, আমার টাকা আছে। তারা জানে না আমি তাদের কতখানি ঈর্ষা করি। হ্যাঁ সত্যকথাই বলছি—এখন সত্য ভিন্ন আর কিছু বলবার সময় তো নেই, সময় সময় এত অসহ্য বোধ হয় যে, আমার বাগানের মালি খানসামার সঙ্গে নিজের অবস্থা বদলে নিতে ইচ্ছা করে। কারু মুখে যদি হাসি দেখি তার সঙ্গে সর্বস্ব বিনিময় করতে প্রাণ চায়! কি বলবো? জীবন আমার অসহ্য, কিন্তু—মরণ? সে যে কি অসহনীয়, তা বলবার নয়। সময় আমার শেষ হয়ে এলো, দিন যে আর কাটবে, মনে হচ্ছে না! যে ভাবনা নিয়ে যেতে হবে, মরেও শান্তি পাবো না।

এ অভিব্যক্তি এ-লোকের, মুরলীধরের পক্ষে অপ্রত্যাশিত, নির্মল ভীত হইল।

—অসুস্থ বোধ করচেন? ডাক্তারকে ডাকতে বলি?

—ডাক্তার!—মুরলীধর হাসিলেন—ডাক্তার কি করবে? বহু চেষ্টা এ দুবৎসর ধরে করেছে বেচারীরা। এই আধমরা প্রাণটাকে ধরে রাখবার জন্যে তাদের যত্নের ত্রুটী নেই। না ডাক্তার নয়, আমার এ ভবরোগ শান্তির কাল নিকট হয়েছে সে আমি টের পাচ্চি, একমাত্র তুমিই এখন আমার শেষ আশা!

নির্মল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল। ভয় হইতেছিল, একি? প্রলাপ না, কি?

মুরলীধর কহিতে লাগিলেন—নির্মল, যাবার আগে—

—আমি বাপ হারিয়ে আপনার কাছে পিতার অধিক স্নেহ পেয়েছিলাম, আপনি ও-কথা বারবার কেন বলচেন?—

সে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল। তার নাসারন্ধ্র স্ফীত ও মুখ উত্তেজনায় আরক্ত। চোখে জল আসিতেছিল।—অকস্মাৎ সেই সবলচিত্ত দুর্বল রোগীও বড় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বোধ হইল তাঁরও কোটর নিবিষ্ট চোখের কোলে ফোঁটাকয়েক জল জমিয়াছে।

অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া কম্পিত হস্ত পার্শ্ববর্তীর নত মস্তকে স্থাপন করিলেন; অকৃত্রিম আশীর্বাদও বোধ করি বর্ষিত হইল! মানসিক উদ্বেগ দমন পূর্বক মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—যা অনিবার্য তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভাল, আমার শেষ কাজ সেরে নিতে চাই। ধীরা থাকে, বলবার সময় পাই নি, তোমায় আমি ব্রজর চেয়ে ভরসা করি, তোমাকেই তাই জিজ্ঞাসা করচি, আমি গেলে ধীরার কি হবে?

যে স্বরে এ জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হইল, বোধ করি পাষাণকেও কাঁদাইয়া ছাড়ে! বিশেষ যখন এই বিদায়োন্মুখ পিতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলচিন্তায় স্নেহাতুর চিত্তের কল্পিত দুশ্চিন্তার লেশও নাই, আছে উলঙ্গ সত্য? সন্তান সম্বন্ধে এত বড় দুশ্চিন্তা লইয়া কোন পিতা পরলোকের পথে বাহির হন নাই।

কি বলিবে সে? বলিবার আছে কি? শুধু উত্তর করিল,—ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।—এর চেয়ে বেশী বলা সম্ভব ছিল না!

রোগীর পাণ্ডু অধরে তীব্র দুঃখের জ্বালা হাসির আকারে প্রকট হইল। —একদিন যেতেই হবে? ব্রজর ব্যবহার তো দেখেচো? সে কি ওর মুখ চাইবে? না ওর বিবি-বউ ওর দুঃখ বুঝবে?

নির্মল চমকিল—ইনি বিবি-বউয়ের উল্লেখ করিলেন কেন?

মুরলীধর তেমনই আত্মবিস্মৃতভাবে কহিয়া যাইতেছিলেন—উইলে আমি ওকে ব্রজর সঙ্গে বিষয়ের অংশ সমান দিয়েছি। অফিস যতদিন চলবে তাতেও ওর একতৃতীয়াংশ বখরা থাকবে! ব্রজর সঙ্গে এই নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। সে বলে, একটা অন্ধের অত টাকার কি দরকার? কিন্তু কেন, কেন ও পাবে না? একটা মানুষের পক্ষে কি শুধু খেতে পাওয়াই যথেষ্ট? ও দান করবে, ভোগ করবে যদি ওর বিয়ে হয়, ঈশ্বরের কৃপায় যদি ওর সন্তান জন্মে তারা ভোগ করলেই ও সুখী হবে। কিন্তু আমি ওকে শুধু টাকা দিয়েই চলে যাবো, কে ওকে যত্ন করবে, ওর বিষয় রক্ষা করবে? ওর মুখ চাইবে?

এবার মুরলীধর কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। অনেকক্ষণ বকিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন। বলিবার কথা না পাইয়া নির্মলও স্তব্ধ রহিল।

এদিকে সারাদিনের গুমোট কাটাইয়া কখন মেঘ করিয়া কোন সময় ঝড় উঠিয়াছে, বন্ধ খড়খড়ির পাখিগুলায় ঝটাপটি করিয়া প্রাণপণে সার্সি ঠেলিয়া বায়ু গর্জিল, খড়খড়ির ফাঁকে বিদ্যুৎ ঝলকিয়া বজ্র হাঁকিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে এ সকরুণ অভিনয় বোধ করি প্রকৃতিরও অসহ্য হইয়াছিল।

—নির্মল!

নির্মল চমকিয়া উত্তর করিল,—আজ্ঞে?

—কার হাতে অভাগিনীকে দিয়ে যাব নিমু? কে ওর টাকার লোভে বিয়ে করে সতীন গঞ্জনা দেবে না? কে এমন মহৎ, যে যথার্থ দয়ার পাত্রীকে প্রকৃত দয়া করবে?

বড় কঠিন সমস্যা। নির্মলের বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতে লাগিল, শরীরের মধ্যে রক্তটা আনচান করিতে লাগিল। সে যে কি করিবে, কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইল না। তিনি যে কি বলিতে চান সে কথা না বুঝিবার ভান করা চলে না। বহুপূর্বেই এ অভ্যাস শতচ্ছলে মনে জাগিতে গেলেই তাড়া খাইয়াছে, আজও কি আর মনকে চোখ ঠারিয়া থামান চলিবে? সর্বশরীরে সে শিহরিয়া উঠিল। কে যেন ভিতর হইতে ডাক দিয়া বলিল,—এবার তোর কঠোর পরীক্ষার কাল আসিয়াছে। আতঙ্কে বাক্যস্ফুরণ শক্তি তার চলিয়া গেল, কে জানে, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়া হয়ত সে এখনই কি একটা সর্বনাশ টানিয়া আনিবে!—

মুরলীধর বোধ করি এভাব আশা করেন নাই। সুস্পষ্ট না বলিলেও তিনি যে তার কাছে কৃতোপকারের কি মূল্য চাহিতেছেন সে কথা অস্পষ্টভাবে সেই প্রথম দিন হইতেই তিনি আভাস দিয়া আসিয়াছেন। নির্মল সে ইঙ্গিত বুঝিয়া নিজেকে প্রস্তুত রাখিয়াছে, ইহাই ছিল তাঁহার কল্পনা। তাহাকে নীরব দেখিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন, অভিমানও দেখা দিল; ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন—তোমাকেই ভরসা ছিল, তোমার হাতে ওকে দিয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতেম, কিন্তু তুমিও বোধ করি আমার অন্ধ মেয়েকে ঘৃণা করলে!

তার কর্তব্যবিমূঢ়তায় যে এতবড় কদর্য ঘটিতে পারে নির্মল একথা ভাবে

নাই। সে চমকিয়া বলিল—ও কথা মনে করলে লজ্জায় আমি মরে যাবো! আশীর্বাদ করুন, এ রকম চিন্তাও যেন আমার মনে স্থান না পায়, ওঁকে আমি দেবী বলে মনে করি, ভক্তি করি, পূজা করি।—বৃদ্ধের মুখ ঘরের সবুজ আলোতেও ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, কহিলেন,—তবে ওকে বিয়ে কর। শ্রদ্ধা করা মানেই ওর অবস্থার প্রতি কৃপা—সেই তো ওর একমাত্র প্রয়োজন।

নির্মলের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, এত জোরে যে, মনে হয় বাহিরেও সে শব্দ অন্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে বাকি ছিল না। মুখ মাথা চোখ কান একসঙ্গে আগুন লাগার মত তাতিয়া উঠিয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। কথা বাহির হইল যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের স্বরের মধ্য দিয়া, কোনমতে বলিল,—আপত্তি ছিল না, কিন্তু দেশে আমি এক অনাথা বিধবার মেয়েকে বিয়ে করবার স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি, তাঁরা আমার আশায় বসে আছেন। একি ধর্ম হবে?—এই ধর্মাধর্মের সমস্যাই আপাততঃ তার কাছে ধীরা বা অপর্ণার চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছিল।

মুরলীধর এই উত্তরে অল্পক্ষণ ভাবিলেন। তাঁর মুখের সেই ক্ষণপূর্বের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া আসিল, চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁদের অবস্থা খুব মন্দ?

—খুব।

—মেয়ের বয়স?

নির্মল কিছুক্ষণ ভাবিয়া উত্তর দিল—বোধ করি ষোল সতের বৎসর।

—কে আছেন?

—মা, আর কেউ নেই। মা পিসিমার ওখানে—

—বুঝেচি! নির্মল! এই জন্যই তোমায় আমি এত করে চাচ্ছি, দয়ার তোমার অন্ত নেই, ভেবে দেখ, যাকে তুমি দয়াপরবশ হয়ে বিয়ে করছ, তা হতেও আমার ধীরা কত অংশে দয়ার পাত্রী, সে গরীব, কিন্তু ধীরার ধন-সম্পত্তির রক্ষাকর্তা না থাকলে ধীরার পক্ষে সে ধন থেকেও নেই। তার মা আছেন, মায়ের কোলের চেয়ে সন্তানের নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায়? ধীরার

মা থাকলে তার জন্যে আমি বেশী ভাবতেম না। ধীরার বয়স কুড়ি পার হয়ে গেছে। সে হিসাবেও ওর বিয়ে আগে হওয়াই উচিত। সবার চেয়ে বড়—পরের হাত ভিন্ন এক পা নড়বার শক্তি যার নেই, তার চেয়ে কৃপাপাত্রী এ সংসারে কে?

যুক্তিগুলা অকাট্য! এ সম্বন্ধে, নির্মল না করিতে পারে না। বিরুদ্ধ-পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টারদের পক্ষেও কঠিন হইত! ঘরভরা নিস্তব্ধতার বক্ষে আঘাত করিয়া মধ্যে মধ্যে বায়ু গর্জিয়া হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল, তুজনের কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। অনেকদিনের সৃষ্টিকরা একটা কিছু ভাঙ্গিতে গেলে ভাঙ্গাটা যে খুব সহজ হয় না, এ জ্ঞান ছিল বলিয়া মুরলীধর সহসা সেই সচিন্তিত বাহ্য-নীরবতা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন না।

ঝুন্‌ঝুন্ করিয়া সরু চুড়ির আওয়াজ আসিল, ধীরা ডাকিল—বাবা।

—মা, আয়।

নির্মলও সসংজ্ঞ হইয়া নড়িয়া বসিল।

—এই দেখ, কতক্ষণ বাইরে বেড়িয়ে এলাম। ও কি? তোমার গা কেন এত গরম? জর হয়েছে? হ্যাঁ, খুব গরম! আপনি দেখুন তো গরম নয়?

নির্মল নিজের ভাবনা ভুলিয়া সচমকে উঠিয়া রোগীর কপালে হাত দিল,—তাই তো! গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে।

১৬

সকালেও জর রহিল। ডাক্তার এজন্য প্রকৃতিদেবীকে দায়ী করিয়া নূতন মিক্সচার ও পিল ব্যবস্থা দিলেন,—রাত্রি-নাগাদ জর ছাড়িয়া যাইবে।

ধীরার এ সান্ত্বনায় আস্থা হইল না। রাত্রেও তিনি বলিয়াছিলেন, সকালে জর পাওয়া যাইবে না। এমন সময় ব্রজ আসিয়া নির্মলকে কহিল, শিকারে যাবে তো চল।

নির্মল কহিল—আজ আমি তো যেতে পারব না, আপনারও না গেলে ভাল হতো না? জ্বরটা তো ওঁর ছাড়ে নি।

—ডাক্তার বলছেন সর্দি জ্বর, ও কিছুই না, অথচ এই নিয়ে তোমরা যা কাণ্ড করছ, যেন বাতশ্লেষ্মার বিকারই বা হয়েছে! ধীরা না হয় করুক, তুমিও দেখচি তাকেও যে টেক্কা দিচ্চো। যাবে না ত? বেশ থাকো—কপালে নেই!

নির্মল বিষণ্ণ হাসি হাসিল,—থাকগে।

—বয়ে গেল! এথেলকে আমি বলেছিলাম, ওকি কখন এসব করেছে যে রস পাবে এতে।—ফিরিবার জন্য চরণ উঠাইল, তার মুখে যে ভাবটা ফুটিল তাহা বিজয়ানন্দের।

নির্মল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—তিনি আমায় যেতে বলেছিলেন?

—আমার মতন কালা-আদমী তো তুমি নও; না বলবেনই বা কেন?—অপ্রচ্ছন্ন ঈর্ষার উচ্চ হাসি হাসিয়া সে সশব্দে বাহির হইয়া গেল। নির্মল ব্যস্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ভাগ্যে এ ঘরে কেহ উপস্থিত নাই।

কে? দাদা? ওঃ আপনি? আসুন না!

—কেন? কেন?—কোন কিছু—

—হ্যাঁ বাবার জ্বর বাড়ছে। চাকরদের কেবল পাশ ফিরিয়ে দিতে বলছেন। কি হবে? কি করি?

এতদিনের পরিচয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম কালই সে ধীরাকে তাহার সহিত কথা কহিতে শুনিয়াছে। আর আজ, তাহার মধ্যে স্বাভাবিক ধৈর্য-মর্যাদা গাম্ভীর্য কিছুরই যেন স্থান ছিল না। গভীর আতঙ্কের বন্যা সমস্তই ভাসাইয়া দিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিঃসহায়া এই অন্ধ বালিকা, এই অনাত্মীয় যুবকের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে। নিজের যার কোন সামর্থ্যই নাই, একান্ত দুঃসময়ে তাহাকেই ব্যাকুল অনুনয়ে প্রশ্ন করিতেছে—সে কি করিবে?

নির্মলও ভয় পাইল। আবার জ্বর বাড়িতেছে! কিন্তু সে ভাব লুকাইয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিল—ভয় কি, জ্বর আবার কমে যাবে। ডাক্তার কখন এসেছিলেন?

—তিনটেয় এসেছিলেন, তখন জ্বর কম ছিল। তাঁকে ডাকতে বলি?

—তাই বলুন, আমি ওঁর কাছে যাই। ব্রজদা হয়ত এখনও বাড়ী আছেন, তাঁকেও খবর দেবেন।

—আপনি শিগ্‌গির যান—বলিতে ঠোঁট কাঁপিয়া কথা বাধিয়া গেল। সহানুভূতিপূর্ণ বেদনায় বারেক চাহিয়া নির্মল দ্রুতপদে চলিয়া আসিল। অন্ধ বালিকার অতলস্পর্শ গভীর দুঃখ বোধ করি সে নিজের প্রাণে একান্তভাবেই অনুভব করিল। করুণা-কাতর চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিতে বিলম্ব করিল না।

নির্মল দেখিল—এই কয়ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রোগী অর্ধমুদিত-নেত্রে মধ্যে মধ্যে মস্তক-সঞ্চালন করিতেছেন; থাকিয়া-থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন; আবার মধ্যে মধ্যে স্থির থাকিতেছেন। কপালে হাত দিয়া দেখিল উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে! সন্তর্পণে রোগীর কাছে বসিলেও রোগী চাহিয়া দেখিলেন—কে? ধীরা এলি! আয় মা! আমার বুকে মাথা রেখে আমার মধ্যে মিশে থাক, আয় মা আমার? আয় আয়, আয়—

—বাবা! আমি নির্মল।

—নির্মল! ওঃ তুমি? তুমি কি আমার ধীরার হাত ধরে এসেছ? দুজনে এসেছ? ওকে তুমি নিয়েছ তো?

আবার সেই কথা! মনটা গুটাইয়া ছোট হইয়া গেল। যে পূজায় যে দেওয়ায় পরার্থতার গন্ধ নাই, যে দান নিজ আত্মার কল্যাণার্থেই দেওয়া, অসীম প্রাপ্তির অংশতঃ পরিশোধ মাত্র, তাতেও এত দ্বিধা।

মুরলীধর এবার সুস্পষ্ট ভাবেই চাহিয়া দেখিলেন। শরীরের নিম্নার্ধে কলকব্জার বিকৃতিতে যে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, এবার এই প্রবল জ্বরের তাড়নায় সেখানে উপদ্রব ঘটিলেও খুব বড় আক্রমণ ঘটে নাই। একখানি হাতে তার হাত ধরিয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন—স্বার্থপরতা করছি বাবা? কি করি যাদু! যেদিন বাছা আমার শরীরভরা রূপ, হৃদয়ভরা মহত্ত্ব নিয়েও পৃথিবীতে দুঃখী-কাঙ্গালের অধম হয়ে এসেছে, সেদিন ভগবান নিজেই যে

অ শার মনে স্বার্থপরতার বীজ বুনে দিয়েছেন। গরীবের মেয়ের অভাব টাকা দিয়ে পূর্ণ করা যায়—দশ বিশ হাজার টাকা তুমি ইচ্ছে করলে ঢেলে দিতে পারো, কিন্তু ওর যা চাই, সে তো টাকায় কেনা যায় না।—উদারমনের অকৃত্রিম সহানুভূতি, সে তো টাকায় মেলে না, নিমু!

ধীরা প্রবিষ্ট হইল। তার মুখের সেই নিদারুণ হতাশাঙ্কিত বিবর্ণতা চোখে পড়িয়া নির্মলকে একান্ত অপরাধী করিয়া তুলিল। সে সবলে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া প্রশ্ন করিল—ডাক্তার আসছেন?—মুরলীধরের নিকট হইতে উদ্ধার পাইয়া আপাততঃ বাঁচিল।

—তাঁর মোটরের হর্ণ শুনতে পেয়েছি। দাদা চলে গেলেন।

শেষ কথাটা একটা সুদীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই শুনাইল। পিতার রোগবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়ার পরও ব্রজ যে আমোদ করিতে চলিয়া গিয়াছে, নির্মল তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু রোগী পাছে বুঝিতে পারেন তাই সে নীরব রহিল। ডাক্তার আসিয়া যথারীতি রোগী দেখিয়া বাহির হইয়া গেলে নির্মল সঙ্গে গিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিল নিউমোনিয়ার একটু প্যাচ দেখা দিয়াছে, এ শরীরে ও বয়সে ভাবনার কথা বই কি!

নির্মল বিশেষরূপেই আঘাত পাইল। এত শীঘ্র যে এমন কিছু ঘটিতে পারে, এ ধারণা একটু আগেও তার ছিল না। অস্তোন্মুখ সূর্যের প্রতি অন্ধকার-ভীত শিশু যেমন ব্যগ্রচক্ষে চাহিয়া থাকে তেমনি করিয়া তার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যথিত চিত্ত তাঁহাকে যে আঁকড়াইয়া ধরিল। সে চিন্তিতচিত্তে ফিরিতেছিল, পশ্চাতে কণ্ঠধ্বনি শুনিল—দাঁড়ান—ফিরিল, ধীরাই ডাকিতেছিল।

—ডাক্তার কি বললেন?

নির্মল কথাটা ঘুরাইয়া জবাব দিল—বললেন, জ্বরের জন্য বিশেষ ভয় নেই।

ধীরা একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, কথাটা বিশ্বাস করিবে কি না বোধ করি তাহাই ভাবিল, তারপর নিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—সত্যি ভয় নেই?

অন্ধের নিকট অনেক জিনিষ লুকান চলে, কেবল নিজের মনটাকে সেই দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখা দায় হয়। নির্মল একেই এই

আকস্মিক দুঃসংবাদের আঘাত সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তার উপর এ প্রত্যভিঘাত দুঃসহ হইয়া উঠিল। গাঢ়স্বরে—ভগবানকে ডাক, তিনি ভাল করে দেবেন।—বলিয়া চোখ মুছিল। ধীরা হাতড়াইয়া দেওয়াল ধরিল।

—তুমি ওঁর কাছে যাও। আমি ওষুধগুলি আনতে পাঠিয়ে এখনই আসছি। —বলিয়া নির্মল দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তার এই বড় শোচনীয় অবস্থা চোখে দেখিয়াও তাহাকে সান্ত্বনা দিবার অবসর পাইল না।

রোগীর অবস্থা সবেগে মন্দের দিকেই ছুটিতেছিল। রোগী এদিক ওদিক করিতেছেন, পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিতেছেন, অনেক দিনের রক্তহীন মুখ জ্বরের প্রকোপে রক্তিম দেখাইতেছে। ধীরা অভ্যস্ত শান্ত-গতিতে আসিয়া মাথার বালিস, বিছানার প্রান্ত হাত দিয়া ঝাড়িয়া দিল, তারপর অভ্যাসমত মাথার চুলে নিজের ছোট আঙ্গুলগুলি চালনা করিতে আরম্ভ করিলে সেই স্পর্শে রোগী চাহিয়া দেখিলেন—কে? নিমু?

—না বাবা! আমি!

—তুমি? ধীরা?—কতক্ষণ আছ মা?

—এইতো এই মাত্র এলাম বাবা! বাবা তুমি কেমন আছ? কিছুই কি কমে নি?

—উঃ! না রে মা না এ একেবারেই কমবে। ওরে মা আমার! যদি যেতে হয় তোকে কার কাছে রেখে যাব রে মা! ওরে কার কাছে? তার চেয়ে তোকে বুকে নিয়ে একসঙ্গে চলে যাই!

নির্মল সন্তর্পণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, দেখিল, ধীরা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। হাত দুখানি যথাস্থানেই রহিয়াছিল, কিন্তু অঙ্গুলির গতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হাহাকার করিয়া সেই প্রসারিত বক্ষে লুটাইয়া আর্তনাদ করিয়া বলিতে চাহিতেছিল, তাই নিয়ে চলো বাবা! নিয়ে চলো! আমায় তুমি ফেলে যেও না। কিন্তু চিৎকার করিয়া কান্না ছাড়িয়া নিঃশব্দ রোদনও আজ তার পক্ষে কি কঠিন! চোখের দৃষ্টির মত বুঝি সে চোখেও জল ছিল না! শুষ্ক তপ্ত রুক্ষ মরু-বালুর মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র নির্ঝর

শুকাইয়া যায়, তেমনি তার এই অন্তহীন অন্ধকারের পাষাণতলে অশ্রুর নির্ঝর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই স্নেহ-প্রসন্ন মুখ সে কোনদিনই চোখে দেখে নাই, কিন্তু এই যে সকল দুঃখ ভুলানো, সকল অভাব জুড়ানো সান্ত্বনাশীতল স্পর্শ আর ওই অমৃত গলানো বাক্যসুধা—এইটুকুই যে এ অন্ধের সারা পৃথিবী আর চন্দ্র সূর্য, দিবারাত্রি বিশ্বজগৎ, অন্ধনেত্রের আলো, দুর্ভাগ্য জীবনের একক অবলম্বন। ঐটুকু হারাইলে, কি লইয়া সে এতবড় অন্ধকারময় জগৎ সংসারে বাঁচিয়া থাকিবে ?

একভাবেই রাত্রি কাটিল। ধীরা সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সারারাত্রি পিতাকে ছুঁইয়া বসিয়া রহিল। ভগবান যে তাহাকে ইহা ব্যতীত সকল ক্ষমতার বাহিরে রাখিয়াছেন।

জ্বরের ঘোরে রোগী ক্রমাগতই 'ধীরা ধীরা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু বাহ্য চেতনা অনেক সময়েই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসায় ধীরা যখন তাঁর মুখের উপর মুখ নত করিয়া ডাকিতেছিল--বাবা! বাবা! বাবা!—তখন তিনি চোখ মেলিয়া তার যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়াও দেখিতে ছিলেন না। সাড়াও দিতে পারেন নাই।—তার বোধ হইতেছিল—পিতা যেন তার নিকট হইতে ইহার মধ্যেই দূরে, বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন! যেন সেখান হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁর সাড়া পাওয়া গেলও এখানকার আকুল আহ্বান সেখানে পৌছায় না! গভীর আতঙ্কে প্রাণ তার অবসন্ন হইয়া আসিল।

প্রাতস্সূর্যের সঙ্গে সকল রোগ কমিয়া যায়—রোগী একটু স্থির হইলেন।

আর সকলে চলিয়া গেল, নির্মল ও ধীরা উঠিল না। রোগী ঘুমাইয়াছেন। যদিও নিদ্রা গাঢ় নয়। তন্দ্রা-আবল্যের সমাবেশে ক্লেশময়। তথাপি এ অবস্থায় সেও অপ্রত্যাশিত। নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল—আপনি এইবেলা একটু ঘুমিয়ে নিন না।

ধীরা মাথা তুলিল, শব্দানুসরণে ফিরিয়া মৃদুতর স্বরে প্রশ্ন করিল—বাবা কি করচেন ?

—ঘুমিয়েছেন।

—ঘুম, ঠিক তো?

সে আজ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এ পৃথিবীতে একমাত্র যাঁর উপর তার সমস্ত নির্ভর; সেই তিনিই যখন তাকে ফাঁকির ঘরে বসাইতে প্রস্তুত, তখন আর কাহার পরে সে ভরসা স্থাপন করিবে? বুঝিয়া নির্মল ব্যথা পাইল। আশ্বাস দিয়া উত্তর করিল,—হাঁ, ঘুম বই কি! শুনলেন না ডাক্তার বললেন, নাড়ী বেশ ভাল।

ধীরা দৃষ্টিহীন নেত্র নির্মলের দিকে মেলিয়া দীর্ঘশ্বাসের মত উচ্চারণ করিল—ওরা ও-রকম বলে।

এতদিন সে তাঁদের কথার উপর প্রাণপণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পিতার আরোগ্য বিষয়ে কৃতনিশ্চয় ছিল, আজ তার পরম নির্ভরতার সেই ভিত্তি সবেগে টলিয়া উঠিয়াছে যে!

—আপনি একটু বাইরে যান, কাল থেকে একভাবে বসে আছেন, উনি জানতে পারলে কি ব্যস্তই হবেন ভাবুন তো!

নির্মলের অনুযোগে যে একান্ত স্নেহার্দ্রতা ছিল, উহা অনুভব করিয়া ধীরার চোখের পাতা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া আসিল, ক্ষণপরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল,—আপনার হয়ত রাত্রে খাওয়া হয় নি? আপনিই যান না। আমি থাকি।

গত সন্ধ্যা হইতে এ বাড়ীতে আহারাদির কথা মনেও পড়ে নাই, কিন্তু এইটুকু পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ করিবার মত দুর্বল শরীর নির্মলের নয়, কহিল—আমার এজন্যে কিছু যায় আসে না।

—তাহলে, দুজনেই থাকি।

বেলা আটটা অবধি একভাবেই কাটিল। ডাক্তার নাড়ীর গতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; বলিলেন—হঠাৎ ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে—

নির্মল এই অবসরে স্নানাদি সারিবার জন্য বিদায় লইল। ধীরাকে অনুরোধ করিলে প্রথমে উত্তর দিল না, দ্বিতীয় বারে বিরক্ত হইয়া কহিল,—দরকার নেই।

ব্রজ মধ্য রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া এই কতক্ষণ বিছানা ছাড়িয়াছে। বারান্দায় নির্মলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বোধ করি পিতাকে দেখিতেই আসিতেছিল।

—খবর কি কর্তার ?

—একটু ভাল—বলিয়া নির্মলও দাঁড়াইল, ব্রজ হয়ত আরও কিছু জানিতে চাহিবে, কিন্তু ব্রজর কৌতূহল প্রবৃত্তি তত সজাগ নয়, সে নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল—আমি তো জানি ও কিছু নয়, বুড়ো মানুষের অমন একটু হয়েই থাকে। যাক আর একটু ঘুমুই গে—ওঃ এমন সাক্‌সেসফুল পার্টি প্রায়ই হয় না,—সব্বাই এন্‌জয় করেছে—তোমার কপালে নেই !

নিশ্চিন্ত চিত্তে চটিজুতার শব্দ করিতে ক‍িতে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল। নির্মলও নিজের সত্যবাদিতায় বিরক্তিবোধ করিতে করিতে গম্যস্থানোদ্দেশ্যে গমন করিল। এই মন্দের-ভাল না বলিলে হয়ত পিতাপুত্রে সাক্ষাৎটা ঘটিতে পারিত !

১৭

যতশীঘ্র সম্ভব স্নানাহার সারিয়া রোগীর ঘরে গিয়া নির্মল দেখিল, তিনি তখনও ঘুমাইতেছেন। একজন শুশ্রূষাকারিণী একখানা খাতায় ঔষধ পথ্য টেম্‌পারেচারের চার্ট প্রভৃতি লিখিয়া রাখিতেছিল। ধীরা বাপকে ছুঁইয়া হাতে গড়া পুতুলের মতই বসিয়া আছে। উঠিতে বলা নিরর্থক জানিয়া বিরত হইল। মনে মনে বলিল, থাক্ যতক্ষণ পারে কাছেই থাক !

এখানে এখন আবশ্যক নাই, নির্মল নিকটেরই একটা ঘরে ঢুকিয়া আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল, রাত্রের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। ডাক্তার বলিয়াছেন—যদি জ্বরের সঙ্গে উপসর্গ বৃদ্ধি পায় বিপদের সম্ভাবনা আছে।

এই ঘর এক সময়ে মুরলীধর বাবুর বিশ্রামকক্ষ ছিল। এখনও ইহা সেই পূর্বাবস্থাতেই রহিয়াছে। দেওয়ালে সামনা সামনি দুইখানি বৃহৎ তৈলচিত্র। একখানি মুরলীধরের অপরখানি যে ধীরার মায়ের—তাহা তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্যে

জানা যায়। প্রভেদ শুধু প্রফুল্ল নেত্রের সজীব দৃষ্টিতে। নির্মল সেই চোখের দিকে চাহিতেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিয়া দৃষ্টি নত করিল। তিনি যেন শুধু আজ স্বামীর সহিত বিচ্ছেদের অবসান আশাতেই উৎফুল্ল নহেন, কন্যাসম্বন্ধেও যেন বড় আশ্বাসপূর্ণ আশীর্বাদ-দৃষ্টি সে সেই চোখে প্রত্যক্ষ করিল। যেন সে দৃষ্টি বলিল—বেশ করেচ—এই তো মনুষ্যত্ব।

সে নির্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল।

সেদিনের সেই প্রথম অভিব্যক্তির পর হইতে এমনই উদ্বিগ্ন উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটিতেছে যে, কোন কথা বিচার করিবার অবসর ঘটে নাই। প্রথম হইতে যে কথাটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতে অর্দ্ধ-ব্যক্ত ছিল এখন তাহা অতিস্পষ্ট। তিনি তার কাছে কৃতোপকারের দান চাহিতেছেন।—সে দাবী হয়ত খুব অসঙ্গত নয়! কে না ইহার প্রত্যাশা করে? অবস্থা ভাবিয়া সহানুভূতিতে মন গলিয়া পড়িতেছে। তাই নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া নিজের উপর খুসী হইতে পারে নাই। এই জন্মান্ধ, স্বল্পভাষিণী, আত্মদুঃখ-ভারাবসন্না ধীরার চেয়ে অপর্ণা স্ত্রী-হিসাবে শতগুণেই যে ঈপ্সিত সন্দেহ নাই, কিন্তু দয়া-হিসাবে তার চেয়েও বোধ করি এরই পাওনা বেশী! সে যদি ধীরার অভিভাবকত্ব চাহিয়া লয় সে ও অপর্ণা ইহাকে দেখাশুনা করিবে,—এই সর্ত্তে লেখাপড়া যদি করিয়া দেয়, মন্দ হয় না কি? অপর্ণাকে ত্যাগ করিতে গেলে বুক ধ্বসিয়া পড়িবে! সঙ্কল্প-ভঙ্গ এবং আত্ম-বলি দুইটা কঠিনকার্য করিবার মত বল তার মনে আছে কি? আজ যদি সুযোগ আসে, সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সব কথা তাকে বুঝাইয়া দিয়া এই প্রার্থনাই করিবে। তিনিও হয়ত ইহাতে অসম্মত হইবেন না। সে ও অপর্ণা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়া প্রাণপণ সেবা-যত্নে ধীরাকে ভুলাইয়া রাখিবে, সোদরার স্নেহ, দেবীর পূজা তাহাকে, হ্যাঁ, পূজাই করিবে! সে যে তাকে অন্তরের সঙ্গেই শ্রদ্ধা করে। কিন্তু অপর্ণাকে? যে দয়া ধর্মের দোহাই সে মনকে দিয়া আসিয়াছিল, আজ আর শুধু সেই মনোবৃত্তিটিকে সর্বময় করিয়া রাখিলে মনকে আঁখিঠারা হয়, সে অপর্ণাকে আপন ভাবিয়া মনোরাজ্যের সিংহাসনখানাই দিয়া ফেলিয়াছে, সে তাহাকে

ছাড়িতে পারিবে না। পর্দার রিংগুলা মৃদুরবে বাজিয়া উঠিল, দেখা দিল অপূর্ব দৃশ্য! কপাটের উপর হাত রাখিয়া সবুজ পর্দার সম্মুখীন হইয়া দাড়াইয়াছে ধীরা। এ ঘরে অপর কাহারও থাকা সম্ভব এ কথা হয়ত তার মনে হয় নাই। একখানি সাদা শাড়ি যেমন তেমন করিয়া পরা, কাল স্নানের পর চুলবাঁধাও হয় নাই, সেই রুক্ষ চুল কপালে, বুকে, যেখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। মুখের দিকে চাহিতেই নির্মলের বোধ হইল যেন কয়-ঘণ্টায় তার উপর দিয়া যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে। আর সে যুগ শান্তির যুগ নয়—বিপ্লবের। পরদুঃখকাতর চিত্তে সেই নীরববেদনাবিদ্ধ স্তব্ধ মুখ তীব্র আঘাত করিল। সে উঠিয়া নিজের অবস্থিতি জ্ঞাপনোদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করিল—জেগেছেন কি?

—একবার জেগেছিলেন, ডাক্তার দেখে যাবার পর আবার ঘুমিয়েছেন। আপনি এখানে আমি জানতাম না।—বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

—না, না, আমি অনেকক্ষণ জিরিয়েছি, আপনি সোফাটাতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন। আমি ওখানে যাচ্ছি।

ধীরা ঘরে ঢুকিয়া একখানা আরাম কেদারায় অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল, দাড়াইবার শক্তি ছিল না। নির্মলের প্রস্তাবে কলের মত উত্তর করিল, আচ্ছা—কিন্তু উঠিবার চেষ্টা করিল না। প্রকাণ্ড কেদারাখানার মধ্যে তার ক্ষুদ্র দেহ প্রায় ডুবিয়া গিয়াছিল, দুটি হাত পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া শূন্যের দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া সে এমন ভাবে বসিয়া রহিল যে, তাহাকে একটা প্রাণ-হীন মূর্তি ব্যতীত অন্য কিছু মনে হইল না। চলিয়া আসিবে মনে করিয়াও এই জড়তা দেখিয়া সরিয়া আসিতে অসমর্থ হইল। সে যদি কাঁদিত, ব্যাকুল হইত, অপরকে এত চিন্তিত করিত না, এতবড় ভয়টাকে সে নিজের বুকে চাপিয়া এই যে অগ্নিগর্ভ স্তব্ধ ভূধরের ন্যায় গুমিয়া রহিল; ইহাতে অতর্কিত বিদারণের ভয় আর নাই। ভয়ের সঙ্গে এই সহিষ্ণুতার মূর্তিকে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে কার না মাথা নুইয়া পড়ে? সে মিনতি করিয়া কহিল—একটু ঘুমিয়ে নিন, অসুখ হলে লাভ কি?

ধীরা নীরবে উঠিয়া ঘরের একধারে যে সোফাখানা ছিল, তাহার উপর শুইয়া পড়িল, চারিদিকে এত কোচ কেদারা, টুকিটাকি জিনিষপত্র—তার গতি বাধিল না। দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেই নির্মলের স্মরণ হইল—এ ঘর তার পিতার বসিবার ঘর; হয়ত জীবনের অধিকাংশ কালই এই ঘরে তার কাটিয়াছে। এইবার সে চলিয়া যাইবার জন্যে অগ্রসর হইল—আপনি যাচ্ছেন! চলুন তবে আমিও যাই—অকস্মাৎ ভয়বিহ্বল কণ্ঠে এই কথা বলিয়া সে ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি একলা থাকতে পারব না।

নির্মল অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এতদিন সে তাহাকে দেখিতেছে, এতখানি কাছাকাছি সর্বদা রহিয়াছে; কিন্তু তার সেই অভেদ্য পাষাণমূর্তির অভ্যন্তরে যে এমন একটি ভয়নির্ভরশীলা বালিকাজীবন লুকান ছিল, সে দিকটা ত এ পর্যন্ত সে দেখিতে পায় নাই। সে-যে নিজেকে আজ কি অসহায় ভাবিতেছে, কিসের যে নিদারুণ আতঙ্কে তার প্রাণ কাঁপিতেছে, কোন অনির্দেশ্য বিপদের ছায়ায় মন ভয়ে ছমছম করিতেছে; মনে হইতেছে—যেন একটা ভীষণামূর্তি মৃত্যুদূত দুই কঠোরবাহু বিস্তার করিয়া নিঃশব্দ উল্লাসে অগ্নিনেত্রে চাহিয়া তার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তার অন্ধকার হৃদয়তলেও যেন সেই বজ্রজ্বালাময় দৃষ্টিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া তার সর্ব দেহ মনে সে যে কি নির্মম শিহরণ আনিতেছে, সে সবই যেন এই একটুখানি অভিব্যক্তির মধ্যে এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পরিস্ফুট হইল। মনে হইল, যাকে সে পূজার প্রতিমা বোধে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আত্মতৃপ্ত হইতেছে সে সত্যই তেমন এক পাষাণ প্রতিমা নয়, আশা-নিরাশার সংঘাত সংকুলা পরনির্ভরশীল সামান্য মানবী মাত্র। সমস্ত মানবীয় উপাদানেই সে গঠিত, ফিরিয়া সে পূর্বের আসন গ্রহণ করিল এবং স্নেহ-সান্ত্বনায় পূর্ণ সস্নেহে কহিল—আমি আছি, তুমি ঘুমাও।

ধীরা এ প্রস্তাব অনুমোদন করিল না—করিবার শক্তিও ছিল না, একটা গভীর শ্বাস মোচন করিয়া শ্রান্তভাবে চোখ মুদিয়া শুইয়া পড়িল। নির্মল অনেক-ক্ষণ পরে নিজের গভীরচিন্তা হইতে জাগ্রত হইয়া একবার তার দিকে চাহিয়া

বুঝিল—তখনও সে ঘুমাইতে পারে নাই। তাই আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া জানালার বাহিরে অনির্দেশ্যভাবে চাহিয়া সে নিজের উদ্দাম স্রোতোবাহিত চিন্তাধারাতেই প্রত্যাবৃত্ত হইল। জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিনতম পরীক্ষার কাল আসিয়াছে!

—ডক্টর। কোনমতেই কি আপনি এঁর জীবনের আশা করতে পারেন না?

—না, মিঃ চাটার্জী! আশা করি না, এমন কথা তো বলি নি, তবে এ খুবই নিশ্চিত যে, আশা খুব অনিশ্চিত, সে এত যে প্রায় আশাহীন!

—আচ্ছা, কদিন বাঁচা সম্ভব, তাকি আন্দাজ করতে পারেন না?

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিলেন—জ্বর যখন আবার এতটা বেগে বাড়ছে তখন কিছুই নিশ্চয়তা নেই। এখনও চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে পারে জ্বরটা না ছাড়া পর্যন্ত।

নির্মল গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোগীর ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ক্লান্তস্বরে রোগী ডাকিলেন—ধীরা!

—আমি রয়েছি,—বলিয়া নির্মল তাঁর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অগ্নিতপ্ত ললাটে শীতল করতল স্থাপন করিল। রোগীর দুঃখে যন্ত্রণার আর্তচিহ্ন, স্বর ঘন কম্পিত। কহিলেন—ধীরা, ধীরা কই?

—সে ওঘরে ঘুমাচ্ছে। ডেকে আনি?

—না, ঘুমাক। নির্মল! বড় যন্ত্রণা! আর বাঁচলেম না! তুমি রইলে—ধীরা রইলো, তাকে দেখো।

নির্মল তাঁর ললাটের স্ফীত-শিরার উপর সুগন্ধি বারিসিক্ত বস্ত্রখণ্ড স্থাপন করিতে করিতে ধীরস্বরে কহিল—আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা এক্ষণি করা চলে নাকি? আপনার সাক্ষাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মুরলীধর চমকিয়া পূর্ণ-বিকশিতনেত্রে বক্তার মুখের দিকে চাহিলেন, যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—বিয়ে! তোমার? ধীরার? তবে আজই হোক, কাল হয়ত সময় থাকবে না।

নির্মল একটু থামিয়া উত্তর করিল—তাই হবে, কুলীনদের এ রকম হত।

বিহারী চায়, ছেলের জমিদারী থাকিবে; নগদ টাকা কেহ গণিয়া দেখিতে দেয় না, আর কোম্পানীর কাগজ দেখায় না, ছেলেটি অন্ততঃ বি এ. ক্লাসের ছাত্র হইবে; গায়ের রং গৌর হইবে, মুখখানি হাসিভরা—মেজাজ শান্ত, প্রকৃতি অমায়িক। ডাগর চোখের দৃষ্টিটুকু দুধারের জানালার প্রতি উদাসীন। ছেলেটি চশমা পরিবে না, কোঁকড়া চুলে সিঁথি চিরিবে না, সিগারেট খাইবে না, বাসরে সে সঙ্গীতরসজ্ঞা শ্যালিকাবৃন্দের নিকট গালি খাইবে, অমায়িকতার জন্য উচ্চশ্রেণীর নিকট প্রশংসালাভ করিবে। এমন ছেলে কিন্তু চোখে পড়ে না। হয়ত ছেলে বি. এ. পড়ে, জমিদারের ছেলে, গায়ের রঙেও জলুশ আছে, দর হাঁকিবার জন্য বাপও বর্তমান! নয়ত ছেলে চশমা পরে, টেরি কাটে, শিস দিয়া গান গাহিয়া সমবয়সীর সহিত বাজে ইয়ারকি দেয়, বিহারীর চিত্ত বিমুখ হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনে।

বহু পাজি দেখিয়া যাত্রা ব্যর্থ করিয়া আজ সে মহেন্দ্রযোগে শ্রীবিষ্ণু স্মরণে বাহির হইয়াছে। সর্বসিদ্ধিপ্রদ ধ্রুবযোগ। হ্যারিসন রোডের রাস্তায় চলিতে চলিতে যে খবরটা মিলিল, তেমন সর্বদা মিলে না। ছেলেটি জমিদারের বটে, রূপেও ময়ূর-ছাড়া কার্তিক, বাপ-খুড়ার লেঠা নাই, সবই ভাল, কেবল পাশ মোটে একটা!, তা বয়সও তেমন কাঁচা। তবে তো এই-ই তার দিদিমণির বর! কিছুমাত্র দ্বিধা না রাখিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল।

সে যখন বামনঠাকুরের কাছে সংবাদ লইতেছিল, একটি তরুণ পাশ কাটাইয়া বাড়ী ঢুকিল এবং তাদের কথাবার্তা শুনিবার পর মৃদু হাসিয়া উপরে উঠিয়া গেল। নিজের ভাবে ভোর বিহারী লক্ষ্য করিল না।

বিহারী যখন হঠাৎ সেই অপরিচিত তরুণদলে আসিয়া পড়িল তখন সেখানে একদল সমবয়স্ক মেসের ছাত্র ডোমিনো খেলিতেছিল। খেলিতেছিল বটে, কিন্তু মন তাদের খেলার মধ্যে ছিল না। সকলেরই ঠোঁটে ঠোঁটে চাপাহাসি, চোখে চোখে ইঙ্গিতের আদান-প্রদান চলিতেছিল। তাহারা চাপা গলায় কিসের যেন পরামর্শ আঁটিতেছিল—বিহারীর আগমনে কয়েকটি

জিহ্বা নীরব হইয়া গেল। পরক্ষণে এক সঙ্গে প্রশ্ন উঠিল—কি চান মশাই?

বিহারী যেমন নিশ্চিন্ত সাহসে সিঁড়ি উঠিয়াছে, একসঙ্গে এতগুলি যুবকের খরদৃষ্টির দ্রষ্টব্য হইতেই তার সেই অকুণ্ঠিত উৎসাহ ঈষৎ দমিয়া গিয়াছিল। অনেকবার সে এই দলের হাস্যাস্পদ হইয়া ফিরিয়াছে। চৌর্য-চেষ্টার লক্ষণও নাকি তার নিরীহ মূর্তির মধ্যে দেখা গিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ হইয়াছিল। তা ভিন্ন পুলিশের গোয়েন্দা সন্দেহ তো অনেকেই করিয়াছে। সে সব কথা স্মরণে সে থমকিয়া গেল। হয়ত সাগরছেঁচা-মানিক সদৃশ জমিদার-পুত্রটি এবারও তার অবিমৃষ্যকারিতার পাথারে তলাইয়া যায়! কিন্তু না, তা হইলে চলিবে না—এই সামনের ফাল্গুনে দিদিমণির বিবাহ দেওয়া চাই-ই। সাহসভরে সম্মুখীন হইয়া একনিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—আজ্ঞে, আমি কুসুমগঞ্জের জমিদার বাবু, বিনয় বাবুর কাছে এসেছি।

একটি যুবক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—তাই নাকি, তবে তো আপনি আমার কাছেই এসেছেন, আমিই বিনয় কুমার—কুসুমগঞ্জের জমিদার।

অপর একজন হাতের দান ফেলিয়া বিহারীর কাছে আসিয়া কহিল,—আপনার কি কাজ বলুন তো? আমারই নাম বিনয়!

অপর ব্যক্তি ঐ কথা শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল—তোমাদের যা বিনয়, তা ব্যাভারেই প্রকাশ হচ্চে! ওহে ভদ্রলোক! ওদের কথায় কান দিও না, ওরা তোমায় ক্ষেপাচ্ছে! বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমারই নাম মশাই—যা বলতে চান বলুন। সেই ঘরে যতগুলি ছেলে ছিল, ফরসা, ময়লা, শ্যামলা, চশমাচোখে, সবাই মিলিয়া মহারোলে উঠিয়া আসিয়া বিহারীকে বেষ্টন করিল। পরস্পরকে গালি দেয়, ঘুসি মারে, কান ধরিয়া সরাইয়া দেয়, আর চেঁচামেচি করিয়া বলিতে থাকে,—বিনয়কুমার তুই কিরে গাধা! ওগো ঘটকঠাকুর! আমিই বিনয়।

বিহারী দেখিল এই ছেলেগুলির—সকলের মধ্যে বিনয়ের একান্তই অভাব! মনে মনে নাকে খত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, এমন কর্ম আর করিবে না। এক নলোদ্দেশ্যে আসিয়া তার পঞ্চ নলের পরিবর্তে, পঞ্চদশ নল জুটিয়া গেল যে!

এদের একজনের সঙ্গেও সে তার দিদিমণির বিবাহ দিতে প্রস্তুত নয়। গম্ভীর গলায় কহিল—না মশাই আপনাদের মধ্যে যিনিই বিনয়বাবু হোন তাঁর সঙ্গে আমার দরকার নেই, আমি চললেম। এমন ব্যাপার জানলে আসতাম না।

চারিদিক হইতে তুমুল বিদ্রূপ হাস্য উত্থিত হইল, কেহ হুর্‌রে বলিয়া চিৎকার করিল, কেহ—রাই পায়ে ধরি, বিনয় করি, ফিরিও না মানভরে—বলিয়া গান হাঁকিল।

—কি মশাই! ব্যাপার কি? কাকে খুঁজছেন?—বলিতে বলিতে পাশের ঘর হইতে একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল। এ বাড়ীর কাণ্ড দেখিয়া বিহারীর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। আর একটা নূতন আপদ মনে করিয়া সে সিঁড়ির দিকে দ্রুত চলিল। ছেলেটি উহাকে অনুসরণ করিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিল—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে শুনলাম, সব্বাই মিলে আমি বিনয় বলে চিৎকার করছে! আপনি কি বিনয়কে খুঁজছিলেন না কি? আমায় বিশ্বাস করতে পারেন; তবে বলতে পারি নে, সে আর কোন বিনয় কি না? আমার নাম বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাড়ী কুসুমগঞ্জে—প্রেসিডেন্সি কলেজের ফার্ষ্ট-ইয়ারের ছাত্র আমি।

কথাগুলির মধ্যে রহস্যগন্ধ পাওয়া গেল না। বিনয়ের যোগ্য স্বর বটে। বিহারী পিছন ফিরিয়া দেখিল—গৌরকান্তি নধরগঠন যুবক, তার মাথায় টেরি কাটা নাই, চোখদুটি চশমা হীন, গায়ে ছিটের সার্ট, পরণে কাঁচীর ধুতি—ছেলে ভাল।

আশ্বস্ত হইয়া বলিল—আমি বাকুল থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলাম কিন্তু এ বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। লেখাপড়া শেখা-ছেলেরা এমন ব্যবহার করতে পারে, এ জ্ঞান আমার ছিল না। একটা শিক্ষা হল।

ছেলেটি অপ্রতিভ হইল।—মুখ নীচু করিয়া চটি জুতা দ্বারা মাটি ঘসিতে

ঘসিতে মুহুর্মুহু কহিল—পাঁচজন এক বয়সি জুটলে জ্ঞানগম্য থাকে না, তাই তো আমার সঙ্গে ওদের বনিবনা নেই।

পল্লীগ্রামে 'ঝিউড়ি-ছেলে' অর্থাৎ মেয়েদের স্বাধীনতার আদিও নাই—অন্তও না। তাঁদের অগম্যস্থান পল্লী-জগতে দেখা যায় না। ঘাটে মাঠে বাটে এবং এমন কি হাটেও—তাঁদের শুভাগমন। এ দেশের মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা নন। স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব দেখিয়া যাঁরা আকুল, তাঁরা পল্লীজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে যত্নবান হইলেই সহজে অভীষ্টলাভ করিতে পারেন! সকালে উঠিয়া গ্রামের মেয়েরা বধূরা বাসিপাট সারিয়া কাঁখে কলসি, কাঁধে গামছা, বাটীর বাহির হইবেন—মাঠ পথ ভাঙ্গিয়া বাড়ী বাড়ী দল বাড়াইতে বাড়াইতে কোথাও ঝরিয়া পড়া পাকা আমের উপর দিয়া, রাশীকৃত পাকা তেঁতুল আমড়া পদদলিত করিয়া, বনফুল তুলিয়া লতাগুল্ম ছিঁড়িয়া এই নারীবাহিনী হাস্যে-রহস্যে প্রভাত-বায়ু ও স্তব্ধ-আকাশ পূর্ণ করিয়া জলে নামিবেন। দিক-চক্রবাল ছাড়িয়া যখন সূর্য যাত্রাপথের অর্ধাংশে হীরা মানিকের বাতি জ্বালিয়া ডুব সাঁতারে ডুব মারা মুখগুলি খুঁজিতে থাকেন—তখন তাঁদের ঘরের কথা মনে পড়ে। অফিস-ইস্কুলের তাড়া নাই; ছোট ছেলেরা পান্তাভাত নুনতেলমাখা বড়ি পোড়া খাইয়া পাঠশালে গিয়াছে, মেয়ে-বউদের ভিতর যারা ছেলেমানুষ তাদেরও ঐরূপে প্রাতরাশ সুসম্পন্ন, রান্নাবান্না যতক্ষণে হয়—হইবে; সে পক্ষে—না বাহিরে না পেটে—তাগিদ আছে। হাস্য-কৌতুক, সাঁতার ও সঙ্গীতে বাধা ছিল না। মাঠের পথে বধূগুলিও গলা ছাড়িয়া গানের মহলা দেয়, সঙ্গে থাকে সমবয়সী জা এবং ননদের দল—নিন্দা করিবে কে?

কিন্তু এহেন পল্লী-স্বাধীনতা সত্ত্বেও কয়েকটি জিনিষ পল্লীগ্রামে নিন্দনীয়। গান গাহিলে দোষ হয় না; বই পড়িলে জোর নিন্দা হয়। গাঁয়ের যুবতী-মেয়েরা গাঁয়ের যুবাপুরুষদের সামনে দিয়া খালিমাথায় হাসিখুসী করিতে করিতে যত্র তত্র বেড়াইতে সমর্থা; কিন্তু বধূরা স্বামীর সম্মুখে দিবালোকে মুখ দেখাইতে অনধিকারিণী। তাঁদের গান—মাঠে লুকাইয়া শোনা চলে;

কিন্তু গভীর রাত্রে বদ্ধঘরের দরজা দিয়া স্বামীর সহিত কথাবার্তার মৃদু শব্দ বা আলোর আভাস বাহিরে না আসিতে পায়!

অপর্ণাকে বিনয়কুমার যখন স্বচক্ষে দেখিতে চাহিল, বিহারী যত না দমিয়াছিল, শতগুণ দমিলেন—সৌদামিনী। একে এতবড় মেয়ে ঘরে রাখার অপরাধে খোঁটায় খোঁটায় প্রাণ তাঁর বাহির হইতেছে তার উপর যদি সাহেব-বিবির মত শুভদৃষ্টির পূর্বে বরকন্যার দৃষ্টি-বিনিময় গ্রামের ভিতর ঘটিতে দেন, এখানে তিষ্ঠান দায় হইবে! কু-দৃষ্টান্তে সমাজের মাথা খাইতে দেওয়া চলে না। বামা-ঝি আড়ালে দাঁড়াইয়া বিহারী-সৌদামিনীর আলোচনা হইতে তথ্যসংগ্রহ করিয়া রায়গৃহিনীর কর্ণে এই অত্যাশ্চর্যসংবাদটা প্রচার করিলে চণ্ডীমূর্তিতে তিনি বাঁড়ুয্যে-বাড়ী অবতীর্ণা হইয়া যা খুসী বলিয়া—হায়া-লজ্জাবিহীনা কনের মাকে তিরস্কার করিয়া গেলেন। বলিলেন—এ সব করতে হয় নিজের ঘরে গিয়ে করো, আমাদের দেশের নাম খারাপ করো না। ঘেন্না-পিত্তি আর রইলো না। মা মা! মেয়ের রূপ আছে বলেই কি বারাণতে হবে!

রায়গৃহিণী মনের সাধে পাড়ায় ঘুরিয়া প্রচার করিলেন—বাঁড়ুয্যেদের সৌদামিনী ধাড়ী-মেয়েটাকে বিবিদের মত বর ধরিতে বিহারীর সঙ্গে কলকাতায় পাঠাইতেছিল; তিনি জানিতে পারিয়া কত সমঝাইয়া নিবৃত্ত করিয়াছেন।

সৌদামিনী ছলছল চোখে বলিলেন,—কাজ নেই মামা, ওদের জবাব দিয়ে দাও। আমি তোমায় পই পই করেই বলেছি যে, ওসব বড় নজর করতে যেও না। আমাদের ও কপাল নয়!

কিন্তু এতদূর আশা-স্বর্গে উঠিয়া পাতালে নামা বিহারীর কর্ম নয়! এত চেষ্টায় তার দিদিমণির যোগ্য বরটি মিলিল, তাও পাঁচজনের হিংসায় হাতছাড়া হইবে? সে কর্তার কাছে গেল।

রাধিকাপ্রসন্নের মুখ বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। তেজারতীকার্যে বিহারীর অনবধানতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, সে মন দিয়া আদায়পত্র করে না, রাত্রি-দিন বায়ে বায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিহারী মুখ চুণ করিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে নিজেকে সঙ্কোচের সময় না দিয়াই বলিয়া ফেলিল,—একটি খুব

ভাল পাত্তর পেয়েছিলেম; সে ছেলেটি নিজের চোখে একবার কনে দেখতে চায়।

রাধিকাপ্রসন্ন অকস্মাৎ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিলেন, বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন—কনেটি কাদের?

ঢোক গিলিয়া বিহারী উত্তর করিল—এই্ আমাদের অপর্ণা।

—বটে!—তা গাউন টেপ-জুতো মোজা কিনে এনেছ?

প্রশ্নের অর্থ না বুঝিয়া বিহারী মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল। এটুকু বুঝিল, কথাটা বিলক্ষণ বাঁকা! কর্তা একটু পরিষ্কার করিয়া দিলেন; কহিলেন, বলি মেমসাহেবের মেয়েকে গাউন-টাউন না পরালে, সাহেব ঘরের সামনে বার করবে কি করে? বেহারি! তোর বাহাত্তুরে ধরেছে? বিয়ের আগে বর কনের দেখা হিঁদুর ঘরে হয়?

রোখের মাথায় বিহারীর মনেও সাহস দেখা দিল, সে খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—ভাল ছেলে, বড় জমিদার, একপয়সা নেবে না। এত সুযোগ যদি একবার মেয়ে দেখালে পাওয়া যায়—

—যদি মেথরের বাড়ী ভাত খেলে একঘড়া মোহর দেয়, খাবি?

তুলনাটা নিতান্ত অযৌক্তিক জানিলেও বিহারী বুঝিল, আশা নাই, তত্রাচ এক একজন মানুষ পিপীলিকার জাত—বারংবার অকৃতকার্য হইলেও উদ্দেশ্য টলে না, বরং কাদার তালের মত ঘা খাইয়া দৃঢ় হয়, বিহারীও সেই দলের। এত করিয়া সে যে একাধারে কার্তিক-গণেশের আবিষ্কার করিয়াছে, সে বস্তু সে হারাইতে রাজী নয়। অপর্ণার দিকে চোখ পড়িতে অবাক হইয়া গেল। বয়সের ধর্ম এবং অবস্থার পরিবর্তন—দুয়ে মিলিয়া সর্বাবয়বে কি দ্রুত পরিবতনই আনিয়াছে,—শীতের কুয়াসাকাটা রৌদ্রে ফুটিয়া-ওঠা নব-বসন্তের গোলাপটির দিকে যাঁরা ক্ষণকাল এমনই নিমেষহীন নেত্রে চাহিয়া থাকিয়াছেন,—শুধু তাঁরাই বুঝিবেন। ভরা গালে আপনা হইতে যে দাড়িম্ব-বীজের রক্তাভা ফুটিয়া উঠিতেছে, আলতা মাখাইয়াও সে রঙের নকল করা যায় না। কণ্ঠে—ললাটে সুমসৃণ মর্মর কাটিয়া যেন পালিশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বিহারীর রূপমুগ্ধ হইবার বয়স নাই, থাকিলে সে হয়ত মোহিনীমূর্তি-দর্শনে দেব-সমাজের ন্যায় মোহপ্রাপ্তই বা হইত!—কোনমতেই এ মুখখানা একবার চোখের সামনে তুলিয়া ধরা অপেক্ষা তার সঙ্কল্প দৃঢ় হইল।

বিহারী হাল ছাড়িবার লোকই নয়; ছেলেটিকে পুষ্করিণী হইতে ফেরার পথে একটি গাছের ঝোপে লুকাইয়া রাখিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। অপর্ণা এই পথে জল লইয়া আসিবে।

ভরা কলসী হেলাইতে-দুলাইতে ছলাৎ-ছলাৎ করিতে করিতে আসিয়া অপর্ণা দেখিল, বিহারী চোরের মত আমগাছের কাছে দাঁড়াইয়া। হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—বেহারীদা কি মনের দুঃখে বনবাসী হলে না কি?

বিহারী উৎসাহিত হইয়া কহিয়া উঠিল—তা ভাই, বুড়ো হচ্ছি, বনে যাবার সময় তো হলো। অপর্ণা বলিল—যে তোমাদের দেশের লোক এখানে বাস না করে বনে যাওয়া ভাল—যাও যদি আমায় সঙ্গে নিও।

বিহারী নিজের অজ্ঞাতসারে অধীর দৃষ্টি ঝোপের দিকে নিক্ষেপ করিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—তা দিদি! যাবার সময় খবর পাবে, এখন বাড়ী যাও।

—আচ্ছা, বেহারীদা! আমার বিয়ে হলো—না হলো, তাতে ওদের অত মাথাব্যথা কিসের বলতে পারো?—আমরা তো কারু—বিহারীদা! ছিঃ!—জ্বলন্ত চক্ষে সে বারেক বিহারীর পানে চাহিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া গেল,—কিন্তু সে যে অগ্নিগর্ভ বোমার মত ঐ—বেহারীদা! ডাকে তাহার ধিক্কার দিয়া গেল—বিজয়ী বিহারীর বিজয়ানন্দকে তাহা স্পর্শও করিল না। নিজের কৃতকার্যতায় তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এ লজ্জাকে সে পুরস্কারের মত গ্রহণ করিল। বিনয়কুমার সমস্ত রাস্তা বিহারীর পাশে পাশে চলিয়া আসিল, কিন্তু বিহারী যতবারই বড় মুখ করিয়া কথাটা পাড়িতে চায়, সে চারি পাশের দৃশ্য—ক্ষেত্রের শস্য ইত্যাদি পাঁচকথায় আসল কথা চাপা দেয়। বিস্ময়ে—ক্ষোভে—নৈরাশ্যে বিহারী খেই-হারা হইয়া পড়ে। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিল অপর্ণাকে দেখিয়া জমিদার-নন্দনের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তাই কথা যোগাইতেছে না! স্টেশনে পৌঁছিয়া দোকানে সে দিদিমণির ভাবী

বরকে পেট ভরিয়া জল খাওয়াইয়া দুঃখ প্রকাশ করিল—এ ক্ষোভ যেদিন বাড়ী এনে আমার দিদির পাশে বসাবো—সেইদিনই ঘুচবে।

বরটি একটুক্ষণ কি ভাবিল,—তারপর একপাশে বিহারীকে ডাকিয়া লইয়া তাহার হাতে গাড়ীভাড়া মায়-জলখাবার বাবদ কয়েকটি টাকা দিয়া বলিল—মশাই, অপরাধ নেবেন না। নিজের কাজের জন্য এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছি, সেদিন কি মতিচ্ছন্ন ধরলো—শুধু শুধু আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলাম! আজ যা দেখে এলাম—চিরদিন স্মরণ থাকবে! এমন গন্‌গনে আগুনের সঙ্গে পরিহাস করতে আসছি জানলে কখন এতবড় অন্যায় করতেম না। আপনাকে সেদিন বামুন-ঠাকুরের কাছে নিখুঁত ভাল জমিদার-পুত্রের খবর নিতে শুনে—কার জন্যে এত বড় দাবী—তাই দেখবার কৌতূহল ও একটু তামাসার লোভে আমিই এই ফন্দিটি ওদের শিখিয়েছিলাম। আমি বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নই—নলিনীকান্ত মিত্র।—প্রণাম। পারেন তো মাপ করবেন।

ট্রেন আসিল, বিহারীর কুয়াসাচ্ছন্ন চোখের সামনে ছাড়িয়াও গেল।

১৯

দিনকতক এই ব্যাপার লইয়া দেশে একটু হুলস্থুল পড়িয়া স্বাভাবিক নিয়মে থামিয়া গেল; কিন্তু বিহারী বা অপর্ণা—সেদিনের কথা সহজে ভুলিল না। দেশের লোক গোয়েন্দাগিরিতে সুদক্ষ, সত্য সংবাদ কাহারও অবিদিত ছিল না। কিন্তু আপনাপন রুচি অনুসারে এই ঘটনাটাকে পরিবর্তিত করিয়া যদৃচ্ছ গল্প রটনায় বাধা কিসের? সৌদামিনী বিরক্ত হইলেও বিহারীর আন্তরিকতায় মনে মনে আশীর্বাদ না করিয়া পারেন নাই। এ পৃথিবীতে একটা মানুষ যে, এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্যভাবে তাঁদের শুভার্থী, ইহাতে তাঁর নৈরাশ্যকঠিন প্রাণটা যেন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ঘটনার পর কিছুদিন পর্যন্ত লজ্জায় বিহারী ঘটকালি করিতে বাহির

হয় নাই, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, রাধিকাপ্রসন্নের তীব্র খোঁটা এবং পাড়ার লোকের তীক্ষ্ণ শ্লেষের উত্তাপ যেমন জুড়াইয়া আসিতে লাগিল, জমা-খরচ কাটিয়া সুদ কষায় বিহারীর হিসাবে ভুল বাড়িতে থাকিল। রাধিকা-প্রসন্ন গালির মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, চতুর্দশপুরুষ পর্যন্ত সে আস্বাদনের তিক্তরস হাড়ে অনুভব করিতে লাগিলেন, বিহারীর তিরস্কৃত উড়ন্ত মনটা কিন্তু কিছুতেই নিজেকে চিরপুরাতন অভ্যাসের গণ্ডীতে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। এমন করিয়া কিছুদিন গেলে আবার একদিন ময়লা উড়ানি টানিয়া বিহারী বাড়ীর বাহির হইল। তা আদর্শ খর্ব করিতে পারিবে না, পণের টাকাও বাদ দিবে—ইহাতে ভাল পাত্রে মেয়ে দেওয়ার চেষ্টা আকাশ-কুসুম! এই ফুলের ফসল বিহারী যথেষ্ট আবাদ করিল; কিন্তু সবই ঝরিয়া পড়িল—ফুল ফুটাইতে পারিল না। যাহারা মেয়ের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিত্বের লোভে মেয়ে দেখিতে আসিয়াছিল, মেয়ে দেখিয়া তাদের চক্ষুস্থির হইয়া গেল! কেহ ভদ্রভাবে, কেহ বা অভদ্র ভাষায় জবাব দিয়া গেলেন। কেহ বলিলেন,—ছেলের সঙ্গে মানাইবে না। কেহ কহিলেন—মেয়েটি নিয়ে গেলে একটি আঁতুর-ঘরও বাঁধতে হবে, আঁতুর-খরচাটা তো ধরে দেবেন না।

বিহারীর মুখে আসে, তা না হয় ছেলের মায়ের আঁতুর-খরচাটাও আমাদের হিসাবেই ফেলবেন! কিন্তু সহসা বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া দিদিমণির মুখখানি ক্ষুব্ধ হৃদয়ের পরতে পরতে জাগিয়া উঠে। যেন দুটি বাঁকাভুরু ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া রাঙ্গা-ঠোঁটের অভিমান-স্ফুরণের মধ্য হইতে ধ্বনিত হয়—এমন লোকের বাড়ী তোমরা আমায় পাঠাতে পারবে বেহারীদা?

…ওরে না, রে, দিদি না! আর যে যা পারে পারুক, বিহারী তোকে প্রাণ থাকতে দুঃখের মুখে ধরে দিতে পারবে না—তার জন্য তাকে যা বলবে শুনতে প্রস্তুত আছে।

সংসারে ফরমাইস দিলে কি না পাওয়া যায়? বাঘের দুধ চাহিলে মিলে—তো ফরমাইস মত বর মিলিবে না? নগদ ও অলঙ্কারে হাজার তিন টাকা তা ভিন্ন বরাভরণ, নমস্কারী, ফুলশয্যা, রূপা ও কাঁসাপিতলের দানসামগ্রী আর

খাট বিছানা এই সর্তে এক বি-এল পাশকরা উকিল বর পাওয়া গেল। ছেলেটি অবশ্য সোণার চশমা চোখে দেয়—তা তার জন্য চশমাওয়ালা কোন সাহেব বা বাঙ্গালী দোকানদারের বিল তাঁরা পাঠান নাই! মাথায় সিঁথি কাটে, পান খায়, চুরুট ফোঁকে, এবং জমিদারীর আয়ও নাই। বাপের সামান্য পেন্‌সন্ আছে, নিজের ডিপ্লোমা আছে, সুশ্রী চেহারা আছে, আর—আল্‌পাকার চোগা চাপকান গরদের পাগড়ী আছে। মনে একটু খুঁৎ রাখিয়া বিহারী ছেলেটিকে পছন্দ করিল। সৌদামিনীর কাছে বলিল—সব ঠিক! এবার কেবল দুটি হাত এক করে ফেলা।—মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে সৌদামিনী হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মনের মধ্যে তিনি ঠিক দিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাঁর এই আয়-পয়-হীন অভাগা মেয়েটি শিশু জীবনের অত বড় দুর্দৈব কাটাইয়া বাঁচিয়া উঠিবে, এ সন্দেহ বিধাতা-পুরুষের মনে না থাকায়, তিনি বোধ করি ইহার বর গড়িতে ভুলিয়াই গিয়া থাকিবেন! যেখানে একটু আশা করিতে যান—কোথা দিয়া কার যেন কর্ম্মনাশা হাত বাহির হইয়া আশার মাথায় মুগুর মারে, সে আঘাত সামলাইতে অনেকখানি সময় লাগে। তা ছাড়া বিহারী যখন আপনা হইতে এই প্রকাণ্ড বোঝা কাঁধে লইয়াছে, তখন অনর্থক ব্যস্ত হইয়া লাভই বা কি?

বিহারীর মুখে সফলতার কথায় জমিদার-নন্দনের প্রদত্ত আক্কেল বিহারীর স্মৃতিপথ হইতে মুছিয়া গিয়াছে কি না—সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ হইল। ভোলা রোগটি যে বিহারীর বিলক্ষণ আছে, সে কথাটা তাঁর অবিদিত নয়,—বিশেষ উৎসাহিত না হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—কে?

সৌদামিনীর কণ্ঠে আগ্রহের আভাস থাক না থাক, বিহারীর আসিয়া গেল না—সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিল—ছেলেটি মা, একটি রত্ন! বাংলা বিহার উড়িষ্যার মধ্যে এমন ছেলে তুমি আর পাবে না। এই যে পাঁচ পাঁচটা পাশ করেছে তা, মনে একরত্তি দেমাক্ নেই। সেদিন দেখলাম, এক মিনসে জেলে একটা মাছ নিয়ে এসেছে, তা যেমন চৌকাঠে পা দেওয়া অমনি—কেদারা ছেড়ে উঠে—তাকে কত মিষ্টি কথা! তা পানওলা শাকওলা—যে

কেউ পানটা আনাজপাতিটা দিয়ে যায় কক্ষনো কাউকে না বলতে জানে না! বিনিকড়িতে ঐ শাকটা সবজিটা নিয়ে তাদের কাজটি করে দিচ্চে—অতি অমায়িক ভাব!

সৌদামিনীর অধরপ্রান্তে যে হাসিটুকু ফুটিল সেটুকুর মধ্যে আনন্দাভাসের চেয়ে করুণার আভাসই পাওয়া গেল; কিন্তু তাহা বিহারীর আনন্দের ব্যাঘাতক হইল না। মন তার ভরিয়া রহিয়াছে, নিজের ঝোঁকেই সে বকিয়া চলিল। দু-চারদিন এই পাঞ্চর্যশালী বরের খবর শুনিয়া শুনিয়া একদিন অপর্ণা বিরক্ত হইয়া বলিল—বেহারীদা বড় আদেখলে! সংসারে কেউ যেন পাঁচটা পাশ করে নি!

—অ্যাঁ বলিস কি দিদি!—বিহারী আকাশ হইতে পড়িল। এই পাঁচহাতিয়ার বাঁধা বরটির সম্বন্ধে যে কনের মনপ্রাণ অপূর্ব আনন্দরসে ভরিয়া না উঠিতেও পারে, এ বিশ্বাস বিহারীর মনে এক নিমেষের জন্যও স্থান পায় নাই। সে এই মুখরা নির্লজ্জা কনের স-তাচ্ছিল্য মন্তব্যে হতভম্ব হইয়া গেল।

অপর্ণা বলিল—ভারী তো উকিল—ভারী তো পাশ! আমাদের পলাশডাঙ্গার বাবুদের বাড়ীর ছেলেরা অমন কত পাশ করেছে। তোমাদের যেমন বন গাঁয়ে বাস—তাই শিয়ালও এ দেশে রাজা।

কথাটা বিহারীকে বিঁধিল। অপর্ণার জন্য সে যে বর এত খুঁজিয়া বাহির করিল, তেমন পাশ করা সে ঢের দেখিয়াছে? সে যে এত তুচ্ছ করিয়া তাহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিবে ইহা বিহারীর ভাল লাগিল না। ব্যথাহত চিত্তে বসিয়া আবার নিজের পেঁটরা খুলিল। একটি পাঁচরঙ্গা বনাতের বটুয়াতে বিহারীর পুঁজিপাটা। ইতিমধ্যে রেলভাড়া, মেসের, বাসার উড়ে চাকর, বামুনের ঘুস প্রভৃতিতে একতৃতীয়াংশ খরচ হইয়া গিয়াছে, আজ আবার তাহা হইতে আরও কিছু পুঁজি খসাইয়া বাড়ীর বাহির হইল। স্থির করিল—এ ছেলে এখন হাতেই থাক, এর চেয়েও ভাল পাত্র আর একবার খুঁজে দেখি। দিদিমণি ঠিক বলেছে! আজকাল উকিলের দর নেই, মাছের—পানের—শাকের—চাইতেও উকিল সস্তা! কেবল বর-হিসাবেই যা দর চড়া।

সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে। অতি-বস্তুটা যে ভাল নয়, এ সম্বন্ধে চির-প্রসিদ্ধিই ইহার প্রমাণ। বিহারীর এই অতি পছন্দর দায়ে অপর্ণার বিবাহের যে সুযোগটুকু দেখা দিয়াছিল, সেই শুভলগ্ন ব্যর্থ হইয়া গেল। সে যাহাকে অতি কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, তাহারা মেয়ে দেখিয়া অবাক হইয়া ফিরিয়া গেল। থোঁতামুখ ভোঁতা করিয়া আবার যখন বিহারী উকিল পাত্রটির দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল তখন সেখান হইতে আর অমায়িক ভাব প্রকাশ পাইল না। ছোটলোক প্রভৃতি অনেকগুলি মিষ্ট শব্দে কর্ণ পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাকে চোরের অধম হইয়া ফিরিতে হইল। এ ধাক্কা কাটাইয়া উঠিতে বিহারীর সামর্থ্যে কুলাইল না। এই ব্যাপারে সে ভাঙ্গিয়া পড়িল। উকিলপাত্রটি যে বিলম্বে সন্দিহান হইয়া গোপনে অনুসন্ধান লইয়াছিলেন—সে সংবাদ সে জানিত না।

সেদিন রোষে ক্ষোভে আত্মধিক্কারে পরিপূর্ণ বিহারী বাড়ী ফিরিয়া বিছানা লইল। মুখ ফুটিয়া সৌদামিনীর নিকট একথা ব্যক্ত করিতে পারিল না। কিন্তু এ অভিনয় তো নূতন নয়। সৌদামিনী দেখিয়াছেন যেদিনেই কোন স্থানে হতাশ হইয়া আইসে সেইদিনই বেহারামামার উদরের ফাঁক বুজিয়া যায়। মাথা ধরে, পেট কামড়ায়। সেদিন বিহারীকে বাড়ী ফিরিয়া ব্যাপার-মুড়ি পড়িতে দেখিয়া সৌদামিনীর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সত্য সত্যই কি ইহার কপালে বিবাহ লেখা নাই না কি? উঠিতে পা উঠিতেছিল না; তথাপি কোনক্রমে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—বেহারীমামা!

—কেন মা? এই যে আসুন, আমায় ডাকলেই হত; আবার কষ্ট করে নিজে—

বিহারী তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিল এবং পরক্ষণে নামিয়া দাঁড়াইল। তার মুখের দিকে চাহিতেই সৌদামিনীর সন্দেহ মিটিয়াছে।

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। বিহারীর মন এ ঘটনায় আত্মাপরাধের ভারে ভারী হইয়া রহিয়াছিল, সে কেবলই নিজের মূঢ়তাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছিল—আমার দোষেই এমন সম্বন্ধ হাতের

কাছে এসেও ভেঙ্গে গেল, এ আমারই লোভের ফল, ছি—ছি কেন এমন করলাম!

সৌদামিনী সে খবর জানিতেন না, জানিলেও বোধ করি তাঁর কন্যার ভাঙ্গা-রাশি এবং নিজের ভাঙ্গা-কপাল ছাড়া আর কাহাকেও দুষিতেনও না।

সৌদামিনী কথা কহিলেন; কণ্ঠ স্বরে বিহারীর লজ্জা-ক্ষুণ্ণ চিত্ত চতুর্গুণ বেদনা বোধ করিল, বলিলেন—ওকে নিয়ে আমি কি করি বেহারীমামা! ও কেন মলো না! তাহলে তো আর এত—

বিহারী সহসা আহত সিংহের মত গর্জিয়া মাথা তুলিল—

—একি কথা বলো ছোট মা! বালাই! ষাট! লোকে যা খুসী বললেই বা, তা বলে কি ও কথা তোমার মুখে সাজে? মা না তুমি! মেয়ে জন্ম যখন হয়েছে আজ না হয় কাল বে হবেই। রাশটা একটু ভাঙ্গা—সময় হলেই হবে মা!

'মায়ের মুখের গালি লাগে না' বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, অপর্ণার পক্ষে আজ সে গালি আশীর্বাদেরই কাজ করিল। বিহারীর সমস্ত নিরুদ্যমতা এই আঘাত খাইয়া কোথায় যেন সরিয়া গেল। সে আবার মনে জোর করিয়া কল্পনায় অনেক ভাঙ্গা-গড়া করিতে বসিল কিন্তু সৌদামিনীর চিত্তকে সে আর বৃথা আশার পুলক দিয়া উল্লসিত করিতে পারিল না। এবারকার এ আঘাত তাঁর ভগ্ন-শরীর বহিতে পারিল না।

কনকনে শীতের হাওয়া, মুখুজ্যেদের পুকুরে মৃণালের উপরকার পদ্ম চাকিগুলি কালো এবং পুকুরপাড়ের সজনা গাছের আলো-করা সাদা ফুলের রাশিতে গন্ধের হিল্লোল তুলিয়া বহিয়া যাইতেই সৌদামিনীর ঘুস-ঘুসে জ্বর ও কাশি প্রবল মূর্তি ধারণ করিল।

তখন পৌষ পার্বণের আসন্ন-আনন্দে পল্লীভবনগুলিতে ব্যস্ততার সীমা নাই। প্রত্যেক গৃহস্থ-গৃহে স্বতন্ত্র করিয়া ঢেঁকিশাল আছে সেখানে বড় বেশী ঘটা। দুপ্‌দাপ্‌, খুট্‌খাট্‌ শব্দে সারা দুপুরই ঢেঁকিতে পাড় পড়িতেছে, সামনে বসিয়া একজন ভিজা চাল নিড়াইয়া দিতেছে, একজন চূর্ণ বস্তু কুলায় লইয়া ঝাড়িতেছে, কোথাও নারিকেল ছেলা, কোথাও তিল মাজা বড়ি দেওয়া—

কোনখানে বা বাউনি বাঁধার জন্য খড়ের দড়ি পাকাইতে গৃহিণী বধূ ও কন্যাগণ ব্যতিব্যস্ত। চাষাদের বাড়ী বাড়ী অন্নকূট পর্ব চলিতেছে। ধানসিদ্ধ, ধান-শুকানো, ধানভানা, গোলা মরাই নিকানো—মেয়ে-পুরুষের সমান কাজ। এই কর্ম-জগৎ হইতে অবসর লইয়া সহসা একদিন সৌদামিনী শয্যাশায়িনী হইলেন। গ্রামের কবিরাজ নাড়ী টিপিয়া বলিয়া গেলেন—রোগ আরোগ্য-আশাহীন। দুঃখময় জীবনের শেষ পরিণাম যাহা হয়, এও তাই অর্থাৎ—যক্ষ্মা।

২০

সংসারে অপর সকল জিনিষের মতই দুঃখেরও একটা স্তর আছে। নাম হইতেই ইহার প্রাকৃতিক পরিচয় পাওয়া যায়, দুঃখ মাত্রেই দুঃসহ,—সংসারের একটি নাম 'দুঃখম্'। তাই সংসারীমাত্রেই দুঃখিত, সংসার দুঃখময়। কিন্তু দুঃখ সর্বত্র একই ভাবাপন্ন নয়! কোন কোন দুঃখ সহ্য শক্তির অন্তর্ভুক্ত, আবার এমনও দুঃখ আছে—সে সম্বন্ধে শব্দশাস্ত্র মানবাভিধান সম্পূর্ণ মূক! দুঃখ জিনিষটা এতই ভয়াবহ, যে ইহা হইতে মুক্তি লাভার্থই পৃথিবীর সমুদয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক যে কিছু উন্নতি। 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ—জিজ্ঞাসা'। দুঃখত্রয়ের (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক) অভিঘাত না থাকিলে বোধ করি জিজ্ঞাসাও কোন দিন কাহারও চিত্তে উঠিত না।

এই দুঃখের আত্যন্তিক-নিবৃত্তির জন্যই বুদ্ধ নির্বাণ খুঁজিয়াছিলেন, শঙ্করের 'সোঽহম্' ধর্মপ্রচার এই একই উদ্দেশ্যে—ইহার সপক্ষে ভগবানের নিষ্কাম-কর্মের বিজয় ঘোষণা। এই দুঃখই জীবের পরম শত্রু, আবার ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ। সংসারে দুঃখ না থাকিলে সুখের সীমা থাকিত না,—অথবা সুখের নামও থাকিত না, চরম দুঃখই নাকি পরম শান্তির মূল!

ধীরার দুঃখ যে কি, তাহা কেমন করিয়া কে বলিবে? অন্ধের দুঃখ আর চক্ষুষ্মানের দুঃখে কি যে প্রভেদ, বিশ্লেষণ করিবার শক্তি কাহার আছে?

কোথা দিয়া সময় কাটিয়াছে কিছুরই ঠিকানা নাই! যেমন এ কদিন কাটিতেছে বুঝি ঠিক সেই রকম?—বুঝি বা অন্ধের যেমন চিরদিন কাটিয়াছে তদপেক্ষাও অন্ধকার! বুঝি কি হইয়াছে,—কাটিয়াছে কিংবা কাটে নাই তাহাতেও যায় আসে না। তারপর আবার কি ঘটিল? কিছু কি ঘটিয়াছিল? অথবা, কিছুই বুঝি ঘটে নাই? কি ঘটিবে? কি ঘটিবার আছে!

ঘরে সেদিন নিশ্চয় অনেক লোক ছিল। রোগী একভাবে থাকিতে সমর্থ ছিলেন না—বুঝি থাকিতে দেওয়াও হয় নাই—কাহারা তাঁহাকে সরাইয়া শোয়াইতেছিল, খাওয়াইতেছিল, নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিল, মুহুর্মুহুঃ যন্ত্রের—বাষ্পপরিচালনার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল, বিভিন্ন গন্ধও ঘরের বাতাসে ঘুরিতেছিল। ধীরা ভাল করিয়া কিছু জানিতে বা বুঝিতেও পারে নাই, সে যেমন তেমনি পিতাকে স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল। পিতা আজ সারাদিন তাহার সহিত একটা কথাও কহেন নাই। তাঁর ঔষধ খাওয়ানোর সময় ঔষধের গ্লাস ধীরা তাঁর হাতে একবারও দেয় নাই, বেদানারসের ও দুধ খাওয়া কাচের বাটি সে আজ স্পর্শও করে নাই, সারা দিনরাত্রির ভিতর সে তাঁর একটি কথা পর্যন্ত শুনিতে পায় নাই! পূর্বদিন তবু মধ্যে মধ্যে চমকিয়া চমকিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছেন,—এই যে বাবা আমি—বলিয়া সে মুখের উপর মুখ রাখিলে, হাতের মধ্যে হাতটি দিলে একবার সেটি চাপিয়া—মুখ চোখে চুমা খাইয়াছেন, অন্ততঃ চেষ্টাও করিয়াছেন, —কিন্তু আজ?—সেই যে গত সন্ধ্যায় নির্মল তাঁর কাছে কি নিশ্চিন্ততার মন্ত্র পাঠ করিল, সেই হইতে তাঁর অশান্ত অর্ধমৃত চিত্ত—যেন কি এক মন্ত্রৌষধির মহাশক্তিতে একেবারে শান্তিসাগরে তলাইয়া গেল! এত চেষ্টায় শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া পরিচালনার সহায়তা না করিলে হয়ত বা এতক্ষণ সেই মৃদু ক্ষীণ নিশ্বাসটুকুও সেই পরম প্রশান্তিমধ্যে বিলীন হইয়া যাইত।

পাশের ঘরে উচ্চকণ্ঠের কথাবার্তা শোনা গিয়াছিল। কাহারা ইহার নায়ক এবং বিষয়ই বা কি, জানিবার জন্য ধীরার মোহাচ্ছন্ন চিত্তে কৌতূহলের লেশও ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে বিবদমানগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দ্বার

ঠেলিয়া ভারী জুতার শব্দ করিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিল এবং অধীর উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—বাবা!

মুমূর্ষুর বুঝি সে কঠোর আহ্বান ক্ষীণ জীবনীশক্তি মধ্যে গ্রহণ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল। ধীরা তখনই পিতার জ্বর-তাপবিযুক্ত, অর্দ্ধস্থির, অর্দ্ধশীতল দেহে একটা শিহরণের অশান্ত ভাব অনুভব করিল, অর্দ্ধ-চেতন চিত্ত যে শুধু এইখানেই স্থির জাগ্রত, তাই এখানের এতটুকু ব্যত্যয় জানিতেও বাকি থাকে না।

—বাবা! তুমি নাকি ধীরার বিয়ে দিয়ে যাচ্ছো? মানে কি? মৃত্যুকালে এ ছেলেখেলা কেন? এ সত্যি, না ষড়যন্ত্র, এইটে আমি তোমারই মুখে শুনতে চাই।

তীব্রস্বরে প্রতিবাদ উঠিল। আবার কিছুক্ষণ কি সব জোর জোর কথাবার্ত্তার পর গোটাকয়েক জুতা-পায়ের এবং খালি পায়ের ধ্বনি বিছানার নিকটস্থ হইয়াছে জানা গেল।

—তুই সরে যা দেখি—বলিয়া কেহ ধীরাকে ঠেলিয়া দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়াই উত্তেজিত উচ্চ কণ্ঠে আবার ডাকিল,—বাবা!

ধীরা সরিল না, নড়িল না,—তবে মনটা তাহার নাড়া পাইয়া ঈষৎ সজাগ হইয়া উঠিল,—তাই সে চিনিল এ কণ্ঠ তার দাদার।

রোগীর স্বল্পচেতনাও বুঝি এই নির্ম্মম রূঢ়তায় বড় ব্যথা পাইয়াছিল, যে আঘাত মূর্চ্ছিতকে সংজ্ঞা ফিরাইয়া দেয়, সে আঘাত কি নিদারুণ! ওষ্ঠাধর দু-তিনবার কাঁপিবার পর অতি মৃদু শব্দ বাহিরে আসিল,—ব্রজ!

—তুমি ধীরাকে নির্ম্মলের হাতে দিয়ে যাচ্ছ? ওর বিয়ে দিচ্ছ? ওই কাণা মেয়ের বিয়ে!

—ব্রজবাবু! ব্রজবাবু!—

—তুমি থামো নির্ম্মল! এসব আমি ভাল বোধ করছি নে, আমি বুঝে নিতে চাই! বলে যাও, এ সত্যি কিনা?

—কি? ব্রজ?—

—এই বিয়ে ?

—হ্যাঁ! বাবা নিমু! মা আমার! তোরা সুখে—সুখে—সুখে থাক—ব্রজ!—তুমি তুমিও—

—আমার পরে ত তোমার কতই দরদ! সর্বস্ব তোমার ওই কাণ মেয়ে! বেশ, তুমি ওকে ওর হাতে গছিয়ে ত দিয়ে চললে, কিন্তু দুদি বাদে যদি ওকে ও লাথি মেরে তাড়িয়ে ছায়, আমার কাছে কিন্তু ঠাঁই হবে না, সেটা, তুমি জেনেই যাও। কেন ? আমি কি ওকে দেখতাম না ?

—ব্রজবাবু! এ সব বিচারের এ সময় নয়! আমি ডাক্তার, আমি আপনাকে নিষেধ করতে অধিকারী, ওঁর মুখেই ত শুনলেন, এখন আপনি যান। নির্মল বাবু আর দেরি করবেন না, আমরা সকলেই মুমূর্ষুর নিকট প্রতিশ্রুত,—এমন কি, ঐ ডাক্তার-সাহেব সুদ্ধ আপনাদের বিবাহের সাক্ষী থাকতে ওঁর কাছে অঙ্গীকার করেছেন।

আবার সেই সশব্দ চরণের প্রত্যাগমন ধ্বনি শ্রুত হইল। ব্রজ পিতার সহিত শেষ দেখা সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া গেল।—অনেকক্ষণ ঘরটা স্তব্ধ রহিল শুধু একটি অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি—তাহা খট্টালীন ব্যক্তির যন্ত্রণা পূর্ণ কষ্টশ্বাসের। কিছু পরে একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল—সু-সু-সুমতি হোক!

ডাক্তার নাড়ী টিপিলেন, যে ডাক্তারেরা গ্যাস ভরিতেছিলেন, তাঁদের ত্বরা করিতে বলিলেন, চামচ-গ্লাসের শব্দ পাওয়া গেল। রোগীর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিবার পরই একটা ক্ষুদ্র যন্ত্র মৃদুধ্বনির সহিত নিকটস্থ টেবিলে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু অন্য বারের মত এবার সেই সঙ্গে রোগীর শরীর কুঞ্চিত বা প্রসারিত হইল না!

কে আসিয়া ধীরার হাত ধরিল। ধীরা বাধা দিতে গেলে কহিল—বিলম্বে সব ব্যর্থ হবে। এসো, সময় নাই।

ধীরা বাধা দিল না,—যে ডাকিল,—যে তার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল,—সে কে ? তাও সে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল না, সে তাকে যেদিকে লইয়া গেল, কলের পুতুলের মত সেইদিকেই সে চলিল।

তখন কত রাত্রি? রাত্রি কিংবা দিন? এই আত্মবিস্মৃতা বালিকার নিকট হইতে সময় জ্ঞান লুপ্ত না হইলে সে এতক্ষণ নিজেকে কোনমতেই এখানে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইত না। সে এখন স্বপ্নের মানুষ, জীবন্ত সত্তা তার মধ্যে বর্ত্তমান নাই।

এমন করিয়া কত ঘণ্টা কাটিয়া গেল? অগ্নি জ্বলিল, আহূতি প্রদত্ত হইয়া উহাকে আনন্দ চঞ্চল করিতেছিল—সে শব্দও পাওয়া গেল,—অর্দ্ধ-জড়,—অর্ধ মানবী এই বালিকাকে হাতে ধরিয়া কেহ তুলিতেছিল, চলাইতেছিল,—আবার যথাস্থানে বসাইয়া দিতেছিল। স্রোতহীন নদীজলের ফুলের মতন সে সেই একই স্থানে নড়িতেছে, ফিরিতেছে, কখন বা অচল হইয়া আছে। সপ্তপদী সমাধা হইয়া গেল? ধীরা কি তার পক্ষের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারিয়াছে? কে জানে!

—এইবার বাবাকে প্রণাম করে, আশীর্বাদ নিইগে; এস ধীরা?

আকৃষ্ট হইয়া ধীরা তেমনি স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় হস্ত-গ্রহীতার অনুসরণ করিয়া পিতৃকক্ষে প্রবিষ্ট হইল।

—একবার চেয়ে দেখুন! একটিবার দুজনকে আশীর্বাদ করে বলুন, তৃপ্ত হয়েছেন?—

—একি ডাক্তার বাবু! দেখুন, দেখুন, শীঘ্র আসুন। একি হলো! একি হলো! আপনারা কি করছেন?—বাবার পা এত ঠাণ্ডা কেন? হাত—উঃ!—এ কি সমস্তই যে কনকনে ঠাণ্ডা।—কই? কোন সাড়া ত নেই? নিঃশ্বাস কি পড়ছে না! এ—কি হলো! এ—কি হলো—

—আর কি, সব ফুরিয়ে গেছে!

—একটু—আর—একটু—আর দু এক মুহূর্ত্তেও রইলেন না।—রাখতে পারলেন না আপনারা? একবার বলতে পারলাম না,—শুনে যেতে পারলেন না, যে, তাঁর—

—বাবা! বাবা!—তুমি নেই!—সত্যি তবে তুমি নেই!

তীক্ষ্ণধার বরফের শীতলতর ছুরিকা অতি ধীরে ধীরার অর্দ্ধশীতল হৃদপিণ্ডে

বসাইয়া ধীরহস্তে কে যেন টানিয়া তুলিতে লাগিল। তার বক্ষনিম্নে—শব্দহীন, স্পন্দহীন, স্তব্ধ হিমবক্ষ!—সে বক্ষে আজ আর শোণিত চলাচলের সঙ্গে অপরিসীম উত্তপ্ত-স্নেহের উষ্ণতার এতটুকু অবশেষও নাই। তুষারখণ্ডেরই ন্যায় তাহা সকল বিকারবিবর্জিত এবং শীতলও তেমনই। গভীর অন্ধকারে পরিপূর্ণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের সৌরতাপহীন দারুণ শৈত্যে ভরিয়া উঠিল। এ অন্ধকার গাঢ়—গাঢ়তর—গাঢ়তম। এরপর এই শব্দস্পর্শময়ী ধরণীও কোন অতলে তলাইয়া গেল!

ধীরা প্রথম কয়দিন সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় রহিল। বারেবারেই ডাক্তারেরা তাহার অদূর-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মুখ গম্ভীর করিতে লাগিলেন, যে, সেই শুষ্কমাল্য-ভ্রষ্ট যূথিকাটির ন্যায় শয্যাবিলীন ক্ষীণাঙ্গী বালিকার পরিম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বারম্বারই নির্মলের চোখের পাতা অশ্রুভারে ভারি হইয়া আসিতেছিল! আহা! এমন করিয়াই সে শুখাইয়া যাইবে! সে যে অতি বড় বিশ্বাসের সহিত মুমূর্ষুর জীবন-মণিটুকুর রক্ষণভার প্রাপ্ত হইয়াছে, দুটো দিনও কি সে বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারিবে না? উদ্বেগ-শঙ্কিত গভীর স্নেহের সহিত নির্বাণোন্মুখ প্রদীপটিতে সে প্রাণপণে তৈলনিষেক চেষ্টা করিতে লাগিল।

অবশেষে আরোগ্য লক্ষণ দেখা দিল, ব্রজ রোগের খবর পাইয়াছিল রোগীকে চোখে দেখে নাই, দেখা হইলে নির্মলকে বলিল—বাঁচলো ভালই হল! ভেবেছিলাম, ধীরা মরলে—তুমিই যে ডাক্তারদের হাত করে তাকে মেরে ফেলেছ, আমায় হয়ত তারই মামলা বা করতে হয়!

এ অপমান কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষে সামান্য নয়!—নির্মলের মুখও ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই নিজের সেই প্রথম রেঙ্গুনে আসার দৃশ্য তার মনে পড়িয়া যাওয়ায় মুহূর্তে সে নিজেকে সংযত করিয়া লইল। এই ব্রজর পিতাই সেই মৃত্যুর অধিক কলঙ্কসাগর হইতে—শুধু তাহাকেই নয় তার মৃত-জনককে, তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ বংশটাকে দ্বিধামাত্র না করিয়া টানিয়া তুলিয়াছিলেন, সে কথা তাহাকে কোন কিছুই ভুলাইতে পারে না।

—বাবার উইল দেখেছ? না দেখে থাকো শুনেছ নিশ্চয়, আমিও দেখি নি, শুনেছি। উকিল মশাই আমায় দেখালেন না। শ্রাদ্ধের দিন সবার সাক্ষাতে নাকি সে উইল পড়া না হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। শুনেছি, তিনি নাকি তোমাকে আলাদীন করে দিয়ে গেছেন! যীরা বাঁচুক আর মরুক—তাঁর অর্দ্ধেক টাকা আর ব্যবসার মধ্যে দু আনা, তোমার! সর্ত কেবল ওর জীবদ্দশায় তুমি আর কাকেও বিয়ে করতে পারবে না। উঃ তোমার বড় ক্ষতি তাতে, ভারী তো একটা কাণি আর তোমার মত বড়লোককে কত আটকে রাখবে। বাঃ ভোজবাজী দেখালে বটে।

নির্মল পাংশুমুখে চলিয়া আসিল, প্রতিবাদ করিল না। ভিতর হইতে তার কৃতজ্ঞতামুগ্ধ চিত্ত সবলে ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছিল, কার উপর রাগ করিবে? তোমার পর যার বিশ্বাস ভালবাসার অন্ত ছিল না, মহত্ত্বের যার সীমা নেই এ যে তার ছেলে।

শুধু এই মেয়েটির ভারই নয়—এই বিখ্যাত ধনীব্যক্তির মরণের যত কিছু ঝুঁকি সবই নির্মলের মাথায় পড়িল। অফিসের নূতন বন্দোবস্তে কিছু পোহাইবার মত হাঙ্গামা আছে, অংশীদার সাহেবরা লোক মন্দ না হইলেও এবং হিসাবী লোক মুরলীধরের বন্দোবস্ত অপক্কতা দোষ-দূষিত না থাকিলেও ব্রজ তো সোজা-পথের পথিক নয়, সে একটা গণ্ডগোল না পাকাইয়া কেমন করিয়া থাকিবে।

তারপর শ্রাদ্ধাদি হিন্দুর অবশ্যকরণীয় কাজ আছে। ব্রজ পিতার শেষকৃত্য করিতে সম্মত হয় নাই। কাচা পরিতে হইবে না, এই সর্তে অবশেষে গাড়ী চড়িয়া শবানুগমন করে। পুরোহিত আপত্তি তুলিতে রাগিয়া বলিল—তা হলে যাবোই না! মড়ার সঙ্গে সঙ্গে শকুনির মত হেঁটে চলা আমার পোষাবে না।

ভয়ে ভয়ে ভট্টাচার্য কহিলেন—ব্রজবাবু! এটা নেহাত শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য আর এমন সময়ে মৃতজনকে সম্মান দেখানোর জন্যও তো—

—কেন? গর্হিত কিসে? ইংরাজদের যে মড়া নিয়ে যায়—মোর্ণাররা প্রায় সবাই গাড়ীতেই ফলো করে, তাদের কি গতি হয় না? আপনাদের শাস্ত্র একটা নুইসেন্স!

ব্রজ পিতার বড় আশার জ্যেষ্ঠপুত্র, সে পিতার জন্য কাচা পরিল না; হবিষ্যের মালসা পোড়াইল না, কম্বল শয্যা দূরের কথা। তাই বলিয়া এ অপবাদও তাহাকে দেওয়া যায় না, সে তাঁর জন্য কিছুই করে নাই, —করিয়াছিল বই কি! বাড়ী ফিরিয়া সাবান জলে স্নান সমাপনান্তে সার্জের কালো স্থট পরিল, হ্যাটে কালো ফিতা লাগাইল, কালো বুট পায়ে দিল এবং তখনই প্রাইভেট ক্লার্ককে ডাকিয়া কালো-কিনারাযুক্ত চিঠির-কাগজ লেফাফার অর্ডার করিল! সাহেবরা তাদের মা-বাপ মরিলে যা যা করেন, সেও তাহাই করিল। যদি তাঁদের বাপ মায়েদের স্বর্গদ্বার ইহাতে রুদ্ধ না থাকিয়া থাকে তবে তার পিতারই বা থাকিবে কি? অথবা যদিই থাকে সেজন্য ব্রজ দায়ী নয়।

২১

এথেল এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে আসিল। শোকের কালটা এথেলের চিন্তাতেই ব্রজর সবচেয়ে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আগমনে আশা-স্বর্গে কল্পনার বাতি জ্বলিয়া উঠিল। নিশ্চয়ই এই রূপসী তরুণী তার আবেদন প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়াছে!

এথেল সেই কালো পর্দা কালো ভেলভেটের কেদারা টেবিলের কালো আচ্ছাদনযুক্ত ঘরটার চারিদিকে বিস্মিত নেত্রপাত করিয়া সম্মুখস্থ কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত মূর্তির পানে সকৌতুকে তাকাইল। চতুর্দিকের কৃষ্ণচ্ছায়ায় তার ধূসর পিঙ্গল নেত্র পর্যন্ত কালো দেখাইতেছিল—আপনাদের তো শোকচিহ্ন কালো নয় মিঃ মুখার্জি! আমি দেখেছি, আপনাদের দেশে বিশুদ্ধ সাদা বেশ পরতে হয়, আপনি কেন পরেন নি?

ব্রজ তাহাকে বসিতে আমন্ত্রণ করিয়া হাসিয়া উত্তর করিল—কালের চিহ্ন কালোতেই তো পরিস্ফুট!

এথেল অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি করিল—আমার বাবার সঙ্গে আপনাদের দেশের একজন পণ্ডিতের কথা-প্রসঙ্গে শুনেছি, তিনি বলেন, শোকের ম্লানতা মনকে

কালো করে, তাই তা হতে তাকে টেনে রাখবার জন্য, মোহের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ না করবার জন্য, বিপরীত গুণের অশন বসন ব্যবহার এদেশের রীতি।

ব্রজ সেই অজানা হামবড়া পণ্ডিতের উপর যৎপরনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়া উঠিল, ওর কোন মানে হয় না। আপনাদের নিয়মই বিজ্ঞান সম্মত।

—কেন?—সহজ সরলতার সহিতই কিশোরী প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু ব্রজ উত্তর খুঁজিতে অনেকখানি মাথা চুলকাইল, পরে কহিল—তা না হলে অতবড় সভ্য দেশে এ প্রথা চলতো না।

এথেল কহিল—যাই হোক, নিজের দেশাচার পালন করাই আমার মতে উচিত। কাদের পক্ষে কি ভাল সে কেই বা জানে? আপনার বোন কেমন আছেন?

ব্রজকে দুঃখিত বুঝিয়া প্রসঙ্গান্তর আনিল।

—ধীরা? ভালই আছে। আপনি সারাদিন কি করছেন? নূতন নভেল যদি দরকার থাকে ত অনুগ্রহ করে আদেশ দিলেই—পৌছে দেবো।

—অনেক অনেক ধন্যবাদ! প্রয়োজন হলে জানাবো। আপনার বোন এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিশ্চয়ই খুব আঘাত পেয়েছেন? এ অবস্থায় বেঁচে ওঠাই তাঁর পক্ষে কঠিন। আপনি সর্বদাই হয়ত তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন?

ব্রজের মুখচোখ ক্রোধ-পরুষ হইয়া আসিল। এই অহেতুক দয়ার আবশ্যকতা সে খুঁজিয়া পাইল না।—ও কি গ্রহ! কোথায় কার একটা অন্ধ-ভগিনী রোগে শোকে বিছানায় পড়িয়া গুমিতেছে, তাহাতে তুমি—বিদেশী ষোড়শী সুন্দরী —তোমার কি? তুমি আসিয়াছ, দুইটা মুখরোচক গল্পগুজব করিয়া যাও গোলাপ পাপড়ি ঠোঁট দুখানি হাসির আলোয় ফুটাইয়া তোল, সঙ্গে সঙ্গে পিপাসী বুলবুলের অধীর প্রাণ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠুক!

বিরক্তি-গোপন সচেষ্ট স্বরে উত্তর দিল—হ্যাঁ তা আপনি কি শোনেন নি বাবা যে মিঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে গেছেন।

ব্রজ এবার নিজেকে খুঁজিয়া লইবার অবকাশ পাইল ধীরা এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। সে অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

—শুনেছি বই কি! এ বিষয়ে মিঃ চ্যাটার্জী খুব মহত্ব দেখিয়েছেন। চলুন না, আমি একবার তাঁকে দেখে আসি।—যেতে পারি কি?

মিঃ চ্যাটার্জীর প্রশংসিত কীর্তি উল্লেখ-মুগ্ধা এই মহিলাটির বিশেষ ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তার চাতুরীপূর্ণ উদ্দেশ্যের দিকটা দেখাইয়া দিতে অধীর চিত্তকে ব্রজ আজ দমন করিল। মিঃ চ্যাটার্জীকে ভস্ম করিবার ইচ্ছা আসিবামাত্র স্মরণ হইল উহা না করিলেও চলে, ইংরাজের আইন বড় কড়া এবং নিজের বাপকে সে যতটা অর্বাচীন ভাবিত ঠিক ততটাই হয়ত তিনি ছিলেন না। এখন ভয়, ধীরা এই সময় হঠাৎ মরিয়া গিয়া ফ্যাসাদ না বাধায়! নির্মল এখন ধীরার দৌলতে তাহারই কাছাকাছি বড়লোক।—প্রকাশ্যে বলিল, ধীরাকে দেখবেন? সে ত শুনেছি এখনও উঠতে হাঁটতে পারে না।

—সত্যি? বড় দুঃখের বিষয়। আমি যদি তাঁর ঘরেই তাঁকে দেখতে যাই, তাতে কি আপত্তি আছে?

ব্রজ বিস্ময় বোধ করিল—না, তা নয়—তবে আপনার সে রোগীর ঘর সহ্য হবে কি? না, না, আপনার কষ্ট হবে!

এথেল একটু হাসিল। অত্যন্ত মৃদু বিদ্যুতের একটি অস্থায়ী রেখার ন্যায় সেই হাসি সেই গোলাপ-কুঁড়িটি ফুটাইয়া তুলিয়া দ্রষ্টার বক্ষশোণিতে বিপুল আবেগের আলোড়নও আনিয়া দিল, কহিল,—আমি বোয়ার যুদ্ধের সময় আমাদের কনভেণ্টের সিসটারদের সঙ্গে 'রেডক্রশ' সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলাম, আপনাকে বলি নি? রোগীর ঘর ত সুস্থ ব্যক্তির আসল স্থান!—আসুন না, আমায় আজ একটু শীঘ্র ফিরতে হবে।

ঘরে শুধু ক্ষমার মা ভিন্ন অপর কেহ ছিল না। আজকাল নির্মল বড় একটা এঘরে থাকে না। ইচ্ছা করিয়া সে আসে না, তা নয়, আসিবার অবসর তার নাই। শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্তী হইতেছে, এ ছাড়া যা কিছু এ বাড়ীতে খাটিবার খাটাইবার কাজ সবই তারই উপরে ন্যস্ত। রাত্রি জাগিয়া না খাইয়া ভাবিয়া খাটিয়া তার চেহারা বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। মুখের দিকে চাহিবার কেহ

নাই, তাই এতটুকু বিশ্রামের জন্য অনুযোগ শুনিতে হয় না। তবু ইহারই ভিতর বার দুই-তিন আসিয়া সে স্ত্রীর খবর বার্তা লইয়া যায়।

কাহার স্ত্রীর? হ্যাঁ, তারই—ধীরা এখন তাহারই স্ত্রী! কিন্তু সকলে এ খবর জানিলেও তার মন এখনও ভাল করিয়া জানিতে পারে নাই, মাতৃবক্ষচ্যুত সদ্যোজাত শিশুর মত অসহায় যাহাকে—নিজের বক্ষছায়ায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে, সে তার কে? সে তার আশ্রিত—বড় বিশ্বাসের সহিত তাহার নিকট গচ্ছিতা তার এই পুরুষজীবনের দায়িত্বরূপ বর্মদ্বারা অতি সুকুমার এই জীবনটুকু সে ঢাকা দিয়া রাখিতে সম্পূর্ণ বাধ্য, তা ভিন্ন ইহার উপর তার অন্য কোন কিছুই দাবী নাই।

ডাক্তারদের বসিবার জন্য কেদারা ছিল, এথেল ঘরে ঢুকিলে—ব্রজ সঙ্গিনীর দিকে একখানা সরাইয়া দিতে যাইতেই সে রোগীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, দেখিয়া ব্রজ বিরক্তিভরে অধর দংশন করিল। মেয়েটি যেন কি! যা সে যত্ন করিয়া করিতে যায়, তাই যেন দুহাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলে!

শুষ্ক ম্লান মুখখানিতে ধীরে ধীরে শীতল করতল বুলাইয়া স্নেহস্নিগ্ধ হ্যাম্পডেন-কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ, ধীরা?

এ স্পর্শে ধীরা একটু যেন বিচলিত হইল। এই প্রাণস্পর্শী সহানুভূতির সূক্ষ্ম প্রভাব এ যে অভ্রান্ত সত্য। ধীরা শব্দাঃ সরণে দৃষ্টিহীন নেত্র ফিরাইল। অল্পক্ষণ পরে প্রায় অস্পষ্টস্বরে উচ্চারণ করিল—ভাল।'

—বড় সুখী হলেম। আমি প্রত্যহ ডাক্তারের কাছে তোমার খবর পাই। তিনি বলেন তোমার স্বামীর সেবার গুণেই তুমি এবার বেঁচে গেছ।

স্বামী। তার স্বামী? আবার স্বামী কোথা হইতে আসিল? তার কেহ আছে বলিয়া ত মনে পড়ে না! তার চিরপরিচিত জগতে আজ যে মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে! তার কি কেহ আছে? স্নেহ করিবার, সেবা করিবার বাঁচাইয়া রাখিবার কোন একজন? না না, তার কেহ নাই, কেহ নাই।

নির্মল বড় সন্তর্পনে বড় ভয়ে এই নীড়ভ্রষ্ট, আহতপক্ষ পাখীটিকে পাতার তলায় শোয়াইয়া শুশ্রূষু চিত্তে দূর হইতে চাহিয়া থাকে। হাতের ছোঁয়া দিয়া

সে যেন এর নরম পালকগুলি ঝরাইয়া ফেলিবার ভয়ে সঙ্কুচিত। বিষণ্ণ-করুণা দুইনেত্রে ভরিয়া ভারাতুর মেঘের ন্যায় সজল দৃষ্টিতে শ্মশানসৈকতের মত স্তব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সে মুখের ভাষাহীন ব্যক্তি-বিহীন নিদারুণ শোকের রূপ সে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, তাহাতে তার সান্ত্বনার ভাষা স্নেহাভিব্যক্তির ইচ্ছা স্বতঃই বাধিয়া যায়। যে শোকের কতটুকুই বা হইতে সে নিজের এই বিধাতার সর্ব কল্যাণের দানে পরিপূর্ণ পুরুষ জীবনকেই মুক্ত করিতে পারিতেছে না, কেমন করিয়া তাহার পূর্ণ প্রশমন চেষ্টার বাতুলতা দেখাইবে?

২২

ব্রজ যেদিন হ্যাম্পডেন সাহেবের নিকট তাঁর জামাতৃ-পদ প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত পেশ করিতে সাজিয়া বাহির হইতেছিল; সেই সময়ে সে বাড়ীর বেয়ারা একখানা কার্ড দিয়া গেল। রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ।

বারান্দায় পা দিতেই এথেল এবং নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হোয়াইটকে একসঙ্গে দেখা গেল। দুজনকার মুখেই কি এক আনন্দ সলজ্জ আভা। ব্রজর বুকটা কে যেন জাঁতাকলে পিষিয়া ধরিল। সুযোগ মিলিবামাত্র কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই বলিয়া ফেলিল, আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।

এথেল সংযতভাবে কহিল—আমারও নিজের বিষয়ে একটা কথা এখনো আপনাকে বলা হয় নি। আমিই আগে বলি,—আপনি শুনে খুশী হবেন, মিঃ হোয়াইট এবং আমি বিবাহের জন্য আজ বাগ্‌দত্ত হয়েছি। আশীর্বাদ করবেন যেন তাঁকে সুখী করতে পারি। আমরা ছোট থেকেই পরস্পরের বন্ধু; তাই আমার সুখের অংশ আপনাকে নিজেই দিচ্ছি।

ব্রজ স্তব্ধ হইয়া রহিল।—ঘরের তীব্র আলো বারান্দায় পড়িয়াছিল, গৃহ হইতে সমবেত হাস্যকৌতুক লহরে লহরে ভাসিয়া আসিতেছিল। বাহিরের

বাতাসও তেমনই হাস্যচঞ্চল। মানুষের এবং প্রকৃতির মধ্যে কোথাও বিষাদের চিহ্ন নাই!

জড়িতকণ্ঠে ব্রজ কহিল,—আর আমি? আমি যে আশৈশব তোমায় যখন প্রথম দেখি তখন থেকেই তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসে আসছি। এথেল! আমায় কি তুমি সত্যই ভালবাস নি?

এথেল নতমুখে কহিল—বন্ধুর মত ভালবেসেছি, আপনি ত আমার স্বজাতি স্বধর্মী স্বদেশী নন। অন্য রকম সম্বন্ধ আপনার সঙ্গে আমার পক্ষে—আর আপনার পক্ষেও—যে অসম্ভব, এ কথা আপনি হয়ত ভুলেছিলেন; আমি সে ভুল করি নি।

ব্রজ স্ট্যাণ্ডে রাখা টুপী লইয়া চলিয়া আসিল। বলিয়া আসিল—অসুস্থতা-বোধ করিতেছে।

শ্রাদ্ধের ভিড় চুকিয়াছিল। অফিসের নূতন ব্যবস্থাও সমাপ্তপ্রায়। ব্রজর বিদ্রোহ-ঘোষণা যেমন জোয়ারের মত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তদপেক্ষাও ভাঁটার টানে সরিয়া গেল। সে মনের মধ্যে বৈরাগ্য লইয়া শান্তমূর্তিতে শয্যালীন রহিল। কোথাও বাহির হয় না, কাহারও সহিত দেখা করে না,—বলে শরীর অসুস্থ। বাড়ীর ডাক্তার দুবেলা ষ্টেথস্‌কোপে বুক দেখেন, টেমপারেচার দেখেন, দেখিতে না জানিলেও নাড়ী দেখেন; কিন্তু তার পাথরের মত সবল শরীরে রোগের চিহ্ন খুঁজিয়া পান না।

নির্মল যেদিন নিজের ভাবিবার মত সময় পাইল, সর্বাগ্রে অপর্ণার কথা ভাবিল। মুরলীধরের মৃত্যুর পূর্বে প্রতিক্ষণের অবসরটুকুই যে সে একটিমাত্র সুখের স্মৃতিদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছে, সেই অভ্যাসমত আজও একমাত্র সুখের চিত্র স্মরণে আসিয়াছিল।

কিন্তু মুহূর্ত পরে পরমুহূর্তে বৃশ্চিক দংশনের মতই একটা তীব্র জ্বালা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, অপর্ণার মুখ মনে করিবার অধিকার আজ আর তাহার নাই,—সে স্বেচ্ছায় সে সুখ জন্মের মতই ত্যাগ করিয়াছে। —সমস্ত ব্যাপারটা একবার আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

ঘটনাচক্র সত্যের অম্লান আলোকে সুস্পষ্টভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, কিছুই স্বপ্ন বা ভ্রান্তি নহে, যথার্থই সে নিজের সেই প্রার্থিত সুখ হইতে নিজেকে বঞ্চনা করিয়াছে, অপর্ণা আজ তার কেহ নয়, সেও তাদের পরের চেয়েও পর!

কেন সে এমনি করিল? সে তার নিকট সত্য-বন্দী ছিল না? শুধু ত নিজের স্বার্থই নয়, এ যে মহাপাপও! সে যে আজ অনাথা অসহায়া বিধবার নিকট বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু একমাত্র ভগবানই জানেন, কোন্ পাপ বড়, অকৃতজ্ঞতা, না বিশ্বাসঘাতকতা?

ডাকের চিঠি আসিয়াছিল। নির্ম্মলের যখন সে দিকে দৃষ্টি পড়িল, নজর পড়িল বাঙ্গালা-অক্ষরে ঠিকানা দেওয়া একখানি পোষ্টাফিসের সাধারণ লেফাফার বিবর্ণ মূর্ত্তির উপর। মোহরে পলাশডাঙ্গার ছাপ।

যে হস্ত পত্রাবরণ মোচনকালে কাঁপিয়া কার্য ব্যাঘাতক হইতেছিল, পত্রের লাইনগুলার বক্রতাও ইহারই অনুরূপ আরও একটা প্রবলতর হস্ত কম্পনের নির্ভুল সাক্ষ্য দিতেছিল,—কাগজখানায় তড়িৎ শক্তি ছিল না কি!

সে পত্র সৌদামিনীর, পত্র এইরূপ :

শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপন—

পরে বাবা নির্মল, বহুদিন যাবৎ তোমার প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া আছি। তুমি যে তোমার এই কাঙ্গালিনী মায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছ এ কথা তো বাবা আমার প্রাণ থাকিতে বিশ্বাস হয় না! আমি ছেলেবেলা হইতে তোমায় দেখিতেছি, তোমার পবিত্র হৃদয়ের কথা আমার উত্তম রূপই জানা আছে। বাবা! যদি অসম্ভব না হয় তবে যত শীঘ্র পারো অতি অবশ্য ফিরিয়া আসিবে। আমার শরীর বড়ই ভগ্ন,—কোন্ দিন হয়ত মরিয়া যাইব অপর্ণাকে তোমার হাতে না দিয়া গেলে মরিলেও আমার গতি হইবে না।—

সম্প্রতি এখানে একটা ভয়ানক গুজব উঠিয়াছে যে, তুমি না কি ওখানে তোমার আশ্রয়দাতার মেয়েকে বিয়ে করিতেছ! এতবড় বিশ্বাসঘাতকীয় নীচ কাজ যে, তোমার দ্বারা সম্ভব নয়; আমি তা প্রাণের মধ্য হইতে জানি।

লোকে ত বুঝে না যে তাদের খেয়ালের কথায় মানুষের যে বুকটা ভেঙ্গে যেতে পারে; তাই তারা যা খুসী রটায়! আশাকরি বাবা তুমি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছ। এই পত্রোত্তরে দারুণ উৎকণ্ঠার হস্ত হইতে আমাকে সত্বর মুক্ত করিবে। আমার সর্বান্তঃকরণের অসংখ্য আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদিকা

তোমার জন্মদুঃখিনী বামুন-পিসি, (অপর্ণার মা)।

পত্রখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িল। নির্মল চারিপাশের দেওয়ালগুলারই একটার মত আড়ষ্ট হইয়া রহিল, তেমনই স্তব্ধ তেমনই সাদা।

তার সম্মুখে আর একটা ভীষণ মুহূর্ত আসিয়া পড়িয়াছে! যাহাকে সে সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়া আপন করিয়াছিল, তার নামে তাহারই সম্মানজ্ঞানে পরিপূর্ণ অনুমিত গৌরবের ভার সমস্ত জাগতিক দুঃখ দারিদ্র্যকে তুচ্ছকারিণী জননী আজ তাহার চিরদিনের সমুদয় মর্যাদাকে দূরে ঠেলিয়া আর্ত ব্যাকুলতায় বিশ্বাসের দাবী তুলিয়াছেন। তাঁরা যে অযোগ্য পাত্রে সে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, শুধু এই কথা তারই মুখে শুনিতে চাহিয়াছেন,···নিজেকে এই অপরাধ মুক্ত করিবার পক্ষে তাহার কি বলিবার আছে?

কাগজ টানিয়া প্রকাণ্ড চিঠি সে একটানে লিখিয়া খণ্ডে খণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিজের সাফাই গাহিতে অনেক কথাই লিখিতে হইয়াছিল। পরম উপকারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট না হইলেও সে সব কথার মধ্যে দোষারোপের সুরই কি ঝঙ্কার দেয় নাই? যিনি নিজের পুত্র হইতেও তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাকে সে অন্যের চক্ষে নত করিয়া অপরাধের বোঝা লঘু করিতে চায়?

ধীরার প্রতিও ইহাতে অবিচার করা হইবে। লোকে জানিবে, সে দায়গ্রস্ত হইয়াই এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতাকে গ্রহণ করিয়াছে, স্বেচ্ছায় করে নাই। ভগবান! মানুষকে মানুষের মতনই সহ্য করিতে দাও, বিদ্রোহী করিও না।

অনেক কাটাকুটির পর সংক্ষিপ্ত পত্র পাঠাইল।

রোগ হইল মায়ের ; তার তাল পড়িল অপর্ণার মাথায়। রাধিকাপ্রসন্ন কবিরাজের মন্তব্য শুনিয়া খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ কবিরাজ যখন রোগিণীর দুই হাতের কব্জি সংকীর্ণ অঙ্গুলী দিয়া টিপিতে টিপিতে অর্ধমুদিতনেত্রে চর্বিত-উচ্চারণে উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সেই মুহূর্তে চমকিয়া উঠিয়া অপর্ণা পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। আদালতে দাঁড়াইয়া পরমাত্মীয়ের ফাঁসির হুকুম শোনা আর এ কথা শোনায় প্রভেদ নাই, সে জ্ঞান এই বয়সে অনেক অভিজ্ঞতার সহিতই তাহার হইয়াছিল। দাতে ঠোট চাপিয়া সে নিথর হইয়া রহিল—না কাঁদিল, না কান্না চাপিতে উঠিয়া গেল।

রাধিকাপ্রসন্ন ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—মিছে কথা! যক্ষ্মা আমাদের চৌদ্দপুরুষে নেই। কোথা থেকে আসবে? তোমার ভুল হয়েছে কবিরত্ন!

রোগিণী গাত্রদাহে ছটফট করিতেছিল, তাহাতে কি? হরিস্মরণ কবিরত্নের কথা মিছে! তাঁহার ভুল! মুখ রাঙ্গা করিয়া কবিরাজমহাশয় উত্তর করিলেন—আজ্ঞে না মশাই, ভুল এ পর্যন্ত কখনও করি নাই। চরক যক্ষ্মারোগের অনেক প্রকার কারণ দেখাইয়াছেন, যক্ষ্মারোগও বহুপ্রকার, এবং বাত-পিত্ত-কফাদির বিকারভেদে লক্ষণাদিও বিবিধ। রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি বহুবিধ রোগ আমাদের শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এ রোগিণীর শ্বাস, কাশ, মজ্জাগত জ্বর, মুখশ্রী, নাড়ীর গতি প্রভৃতি এক বাক্যেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে ; ভুল করিব কেমন করিয়া? উত্তরাধিকারিত্ব ভিন্ন এ রোগের আগন্তুক কারণও অনেক প্রকার। আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে—অতিশ্রম, অপরিশ্রম, অত্যন্ত মানসিক কষ্ট, দূষিত বাষ্পাদিগ্রহণ, কুভক্ষ্য ভক্ষণ, অশুদ্ধ পানীয় পান ইত্যাদি।

রাধিকাপ্রসন্ন এদিকের যুক্তি দৃঢ় দেখিয়া অপর্ণার পানে সকোপ দৃষ্টি ফিরাইলেন—তাইতো। উদ্বেগের অন্ত কি! এমন গুণের কন্যে গর্ভে ধরেছেন যখন, তখন ওর যক্ষ্মা হবে না, তো হবে কার? বয়সের গাছপাথর নেই—

কানমতেই একটা বর জোটে না! বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে! এইবার মাকে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থুবড়ি বসে থাক্। সাধে কি দুচক্ষে দেখতে পারি নে!

অপর্ণার আজ এ আঘাতের প্রত্যভিঘাত করিবার শক্তি ছিল না। এর কথাটাই যে সত্যের আঘাত। সে-ই ত মাকে মারিয়া ফেলিতে বসিয়াছে! তার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আজ সেই চিন্তাজ্বরে জরজর দেহেই না এই রাজক্ষয়ের উৎপত্তি! মাথা হেঁট করিয়া সে এই বিষদিগ্ধাঘাত সহ্য করিল। তার সমস্ত মন প্রাণ তখন মানুষকে ছাড়িয়া বহু ঊর্ধ্বে বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্জলিত করিতে ছুটিয়া গিয়াছে যে। কি দোষে কোন ত্রুটিতে তাহার প্রতি আজ এত বড় নির্ঘাত দণ্ডাদেশ? এতই কি অপরাধ মাথায় লইয়া সে এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে যে, চিরদিনই তাহার সহিত তিনি বঞ্চনা করিতেছেন? যা হিন্দুঘরের সকল মেয়েরই অবশ্য প্রাপ্য, সেই বিবাহ—কাণা হউক—খোঁড়া হউক—বুড়া হউক—একটা যেমন তেমন বর; তার ভাগ্যে এটুকুও তিনি জোগাইতে পারিলেন না? শুধু এইটুকুতেই হয়ত মায়ের এই সুখশান্তিহীন দুঃখের জীবনটাকে আর একটু দীর্ঘ এবং কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত করিতে পারিত। তার তখন এমন ইচ্ছা হইতেছিল যে, মায়ের প্রতি এই একমাত্র শেষ-কর্তব্য সমাধা করিতে সে লোকের দোরে দোরে ঘুরিয়াও আপনাকে বেচিয়া আসে। সেই যে ছলে ছুতায় বিহারীকে তার বিবাহ চেষ্টায় বাধা দিতে চাহিয়াছে, যদিও বিহারী তাহাতে দৃকপাতও করে নাই—তথাপি এখন তার নিজের মনে আত্ম-ধিক্কার উঠিল। যন্ত্রণা-নিপীড়িত বুকে মোচড় দিয়া ব্যাকুল প্রাণটা উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল—আমিই মাকে মেরে ফেললাম আমিই মারলাম!

সেইদিন বিধাতার সহিত সমান হিসাবে আরও একব্যক্তিকে সে তার দুর্ভাগ্যের জন্য বিশেষ করিয়া দায়ী করিয়াছিল। এই একজনকে সে এ পর্যন্ত মনের মধ্য হইতে ক্ষমার ছাড়পত্র লিখিয়া দিতে পারে নাই; এবার সেই অক্ষমণীয় অপরাধীর প্রতি বজ্রদিগ্ধ অভিমানের আগুন শতগুণ বর্ধিত-বেগেই জ্বলিয়া উঠিল। সে—নির্মল।

জীবনের প্রথম প্রভাতে হৃদয় মুকুল যখন বিকাশোন্মুখ, তখন সেই শান্ত কুমারীজীবনের অচপল মনোদর্পণে যে ছায়া একবার ফুটিয়া উঠে তাহা জলবিম্ব ন্যায় মুহূর্তে বিলীন হইতে পারে না। অর্দ্ধস্ফুটিত হৃদয়পদ্মে প্রভাত-রবির তরুণ রশ্মি বারেক খেলাইয়া সে তপন যদি সারাদিনের মত মেঘ-ঢাকাই হন, তথাপি সে ক্ষণিকের আশা-স্পর্শকে অভাগী কমলিনী পুষ্পজীবনের সফল কামনার কেন্দ্র না করিয়া কি থাকিতে পারে? কিশোরী অপর্ণা তেমনই স্ফুটনোন্মুখ জীবনে যে প্রত্যাশিত সুখের আশায় একটি বৎসর যাপন করিতে পাইয়াছিল, তাহারই স্মৃতি চিত্তে তার সব চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর ঘরে—বিশেষ হিন্দুবাড়ীতে কুমার কুমারীর মধ্যে পূর্ব্বরাগের সুযোগ নাই, ইহাকে পূর্ব্বরাগ বলা যায়ও না, যদি নির্ম্মল' তাদের দুঃখে গলিয়া অযাচিতভাবে এই বিবাহসম্বন্ধ পাতাইয়া না বসিত, তাহা হইলে এসম্বন্ধে কোন দাবী যে থাকিতে পারে, ইহা বোধ করি মাতা-পুত্রী কাহারও মনে ঠাই পাইত না। হিন্দুঘরের কোন বালিকাটি তাঁর ভবিষ্যৎ-স্বামীর উদ্দেশ্যে নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়কুসুমটুকু উৎসর্গ করিয়া না রাখে? সেই দেবতাটি যতদিন অনির্দ্দিষ্ট থাকেন, ততদিন এ পূজাও তাঁদের নিরাকার-উপাসকের ন্যায় নিরাধারেই অবস্থিতি করে, কিন্তু যে মুহূর্তে অবলম্বন পায়, তখন হইতেই সেই গুরুদত্ত ইষ্টমূর্ত্তি প্রত্যক্ষরূপে বাহ্য জীবনে চিরাধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। শোণিত-সূত্রে প্রাপ্ত ধারার মধ্যে থাকিয়া অপর্ণা যখন সেই অমূর্ত্ত-দেবতাকে সহসা প্রত্যক্ষ করিতে পাইল, তখন অনন্যচিত্ত কুমারী-চিত্ত সে ছবি বুকে না ধরিয়া কেমন করিয়া শূন্য থাকিবে? মাতা তাহাকে ইঙ্গিতেও কোন কথা জানিতে দেন নাই, কিন্তু হায়! নারীস্বভাবসুলভ কৌতূহলই যে তার সর্বনাশের মূল হইয়াছিল, সে যদি সে কাল-পত্র না পড়িত!

যাক, সে ভাবনা আর কেন? মনের সঙ্গে তার ত রফা হইয়াই গিয়াছে, দুর্জ্জয় অভিমানে এক মুহূর্তেই সে নিজের বক্ষে ক্ষুরধার কৃপাণ ফলক ইতঃপূর্বেই ত বসাইয়া দিয়াছে, সেই শেষপত্রে এ জন্মের সকল সম্বন্ধই ত শেষ হইয়া

গিয়াছিল, যাহাকে সে তার কৌমার-জীবনের দেবতা বোধ করিয়া শুধু ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াই আসে নাই ;—দয়ালু বলিয়া, উদারচিত্ত ভাবিয়া ভক্তিতে শ্রদ্ধায় নিজেকে যার পদতলে বিকাইয়া দিতেও গৌরববোধ করিয়াছে, সে একজন হীনচিত্ত বিশ্বাসঘাতক মাত্র! যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক একত্র হইয়া এই কথা বলিত, হয়ত সে তাহার সম্বন্ধে এত বড় অপবাদ বিশ্বাস করিত না, পৃথিবীর বিরুদ্ধেই নিজেকে উদ্যত করিয়া তুলিত, কিন্তু হায়, এত বড় সত্যটাকে ত কোনমতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে যে নিজের হাতে লিখিয়া এ কথা—তার কলঙ্ক কাহিনী নিজেই প্রচার করিয়াছে। জগৎ মিথ্যাবাদী নয়, নিজেই সে প্রবঞ্চক, ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক। যদি তার এতটুকুমাত্র আত্মসম্মানবোধ থাকে, তবে পূর্বকথা ভুলিতেই হইবে। তাহাকে সে যে কোনদিন ভালবাসিয়াছিল, সেই লজ্জার স্মৃতিটাকে সম্পূর্ণরূপে মুছিতে হইবে। এজন্য যা করিতে হয়, করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু হায় রে! নাই বলিলেই সাপের বিষ থাকে না, এ কথা কি সত্য? হরকোপানলে এতবড় অমিতপ্রতাপ মদন ভস্ম হইয়া গিয়াছিল, আর তার চেয়েও এত বড় একটা অভিমানের অগ্নি এই সুখে ভরা দুঃখের স্মৃতিটুকু আজও তো কই ছাই করিতে পারিল না?

কতবার অবমানিতচিত্ত নিজেকে তিরস্কার করিয়াছে, মনকে বুঝাইয়াছে কুমারী বেলায় বিয়ের কথা কত লোকের সঙ্গেই ত হয়, এ এমন বেশী কি? কিন্তু এ যে কি তার অবুঝ মন! যেমনই বিহারী আলনায় চাদর রাখিয়া গলা ঝাড়িয়া তার মাকে ডাকিয়া বলে পাত্তর দেখে এলাম মা! ছেলে তিনটে পাশ ইত্যাদি, ইত্যাদি, অমনই একরোখা মন গো হইয়া বলিয়া উঠে, ছিঃ সে যেমন করল, তুইও তাই করবি? তা হলে আর বিশ্বাসঘাতককে কি শাস্তি দেওয়া হল?

কোথায় বা সেই বিশ্বাসঘাতক, কেই বা তার এই নীরব অভিমানের সূচীবোধ করিবে! তথাপি চির-ব্রহ্মচারিণীর জীবন কাটাইয়া সে এই অযথা আচরণের নিগূঢ় প্রতিশোধ কল্পনা করে, সেই উদ্দেশ্যে যেন তাহার

সর্বান্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া উঠে। মা তার বিবাহের জন্য যতই অস্থির হন তার মন তেমনি সুস্থির হয়!

কিন্তু আজ আর নিজের কথা ভাবিবার অবসর নাই। তারই বিবাহের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া মা দেহ পাত করিয়াছেন, এবার প্রাণটাও ছাড়িবেন। এমন সন্তান-জন্মও হইয়াছিল, নিজে সুখী হইয়া চিরদুঃখিনী জননীকে শান্তি দিবে, তাও পারিল না!

রাধিকাপ্রসন্নর অপ্রসন্ন মেজাজ সাজ্যাতিক হইয়া উঠিয়াছে। নাতিনীর উপর এ যাবৎ যত অবিচার করা হইয়াছিল, সে সবের স্মৃতি বিসর্জনের বাজনার শব্দে জাগিয়া উঠিয়া আহতচক্র ভীমরুলের মত তীব্র রোষে তীক্ষ্ণ হুল ফুটাইতে থাকিল। তাহারই মর্মন্তুদ জালায় অস্থির হইয়া সেই বিষই তিনি ঝলকে ঝলকে উদগীরণ দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন! যে স্বভাবতঃই বিষকণ্ঠ আরো বেশি গরল কোন আধারে সে ধারণ করিবে?

সৌদামিনীর শয্যাগ্রহণের দিন অপর্ণা গালি খাইয়াই রহিল, বিহারী এবং রোগিণীও ও বিষয়ে বঞ্চিত হইল না। রাধিকাপ্রসন্নকে বিছানার পাশে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সৌদামিনীর মনটা বড়ই কেমন করিয়া উঠিল। প্রতিশোধস্পৃহা সে মনে ত কোনদিনই ছিল না, তাই তাঁর জন্য দাদাবাবুর আঘাত কল্পনা করিয়া তিনি কুণ্ঠানুভব করিতেছিলেন।- কিছু একটা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কি বলিবেন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বিব্রতভাবে বলিয়া ফেলিলেন এর জন্য আর দুঃখ কি দাদাবাবু! মরণ তো আমার পরিত্রাণ! মেয়েটাকে আপনার পায়ে দিয়ে যাচ্ছি ; ওকে

—চমৎকার! আমার প্রতি তোমার বড় দয়া দেখচি! বেশ! তোমার ঐ ধাড়ি মেয়েকে আমি গলায় মাদুলি করে বেঁধে রাখবো নাকি? আমার ত আর খেয়ে কাজ নেই! উঁহুঁ, সে পারবো না। ও যা করতে হয় ল্যাঠা চুকিয়ে যেতে পার ভাল, না পার তোমার ঐ সোহাগিনী মেয়ের এক পাথর করে ভাত যোগাবো সে শর্মা আমি নই।

সৌদামিনীর দাদাবাবুর বকুনি খাওয়া ইদানীং সহিয়া গিয়াছে। মনে

আর ইহাতে পূর্বের মত অভিমান জাগাইয়া তুলে না, কখন কখন বরং হাসি আসে। আজ আর দাদাবাবুর ক্রোধকে তাঁর সঙ্কোচ ছিল না,— তিনি যে আজ সবার উপরেই জয়পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছেন। মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি আজ সবার উপরেই করুণাদৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন, এখন ত আর অভিমানের সময় নাই। মানাভিমান চুকাইয়া পাওনা দেনার, না পাওনার দাবীদাওয়া শোধ করিয়া যাওয়ার যে কাল আসিয়াছে। বৃদ্ধের গোপনব্যথা অনুভব করিয়া বুঝি সুদূর পথযাত্রিনীর মনে বিচ্ছেদ কাতরতাও জাগিতেছিল? দাদাবাবুর কথায় ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন—ভগবান যে ওকে আপনার পায়ে দিয়ে যাবার জন্যই আমায় এমন করে স্রোতে ঠেলে ঠেলে এনে ফেলেছিলেন। ওর ভার না নিয়ে ত আর উপায় নেই দাদাবাবু!

- হ্যাঁ, উপায় নেই না কচু! কিসের জন্য নেই শুনি? দেবো বেটিকে ঘাড় ধরে বার করে

রাধিকাপ্রসন্ন কথাটা রোখ করিয়া বলিলেন বটে, কিন্তু ভাষার তেজের মত গলার স্বর সতেজ ছিল না। এ ভর্ৎসনায় ভর্ৎসিতকে রাগ করিতে দেয় না, ভর্ৎসনাকারীর জন্য কান্নাই পায়। সৌদামিনী চোখ নত করিলেন; অপর্ণা কাঠের মত বসিয়াছিল, উঠিয়া গেল।

২৪

মাসখানেক কবিরত্নের 'কুষ্মাণ্ডখণ্ড' 'কশান্তক বটিকা' ইত্যাদি খাইয়া সৌদামিনীর চর্মসার-শরীরে যেটুকু বলাধান হইতেছিল, প্রথম ফাল্গুনের বাতাসের সঙ্গে বিহারীর প্রাণান্ত-চেষ্টার ফলে অপর্ণার বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হওয়াতে চতুর্গুণ শক্তি যেন বাড়িয়া গেল। প্রথমে খাটের উপর, তারপর ঘর ছাড়িয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া বসিতে পারিলেন! আশাতেই মানুষের সব; শরীরে যত বড় ব্যাধিই থাক, মনে যদি আশা থাকে তবে সবই সহ্য হয়।

রাধিকাপ্রসন্নের বাড়ীতে দুইটি ব্যাপার - এক বিবাহ এবং আর একটা ইহা

[illegible]— মৃত্যু ; দুইটাই একত্র আসন্ন হইয়া আছে। তা থাকিলেই বা কি ? -তাঁর উহাতে কিছু আসে যায় না। তেজারতি ব্যবসার নি-খিরকিচ —নিকট হিসাবটি রাখা, একটু আধটু হরিনাম, আর তরকারী ফসলের একটু দেখা শোনা এবং বিহারীর টিকি দেখিতে পাইলে তার চতুর্দশ-পুরুষকে সাদর সম্ভাষণ, ইহা যথাপূর্বই চলিতেছে। আজকাল না কি বিহারী হুগলী ঘর করিতেছে, কাজেই সময়ের জিনিসটা একটু মুখে দিতে ত লোভ হয় ? -ফর্দের মধ্যে বেদানা আঙ্গুরের হিসাবটা একটু ভারি হইয়া পড়ে কিন্তু পাতের গোড়ায় সেগুলা দেখা দিলেই বামহস্তে ঠেলিয়া দিয়া কর্কশ চীৎকারে সকলকে চমকাইয়া দেন, ওঁরা চান বুড়োটা রুগীয়ে পড়ে রুগীর পথ্যি গিলে মরে ; আর ওঁরা নিশ্চিন্দি হয়ে টাকাগুলো ভোগ করেন !- -বিহারী ভেকা হইয়া থাকে ; অপর্ণা টেপাহাসির সহিত মার কাছে সেগুলা পুরা কাহিনীর সহিত দাখিল করিয়া দেয়। যদিও এসব জিনিষ মুখে তুলিতে স্মৃতির কণ্টকে ঠোঁট গলা বুজিয়া আসে তথাপি ঐ গালিটুকুর মাধুর্যে সকল মেওয়ার সদ্ব্যবহার করার লোভ তপঃক্লশা তপস্বিনী ত্যাগ করিতেও পারেন না, এযে কতবড় স্নেহের দান আজও কি বুঝিতে ভুল করিবেন।

এমন করিয়া যমকে ফাঁকি দিতে দিতে গোটাকতক দিন কাটিতে লাগিল। মানুষের মনের কথা বল কেন ? যতদিন মৃত্যু দূরে থাকে তাহাকে ডাকা-ডাকির অন্ত থাকে না, মনে হয়, ঐ বুঝি সবাই চলিয়া গেল, আমারই যাওয়া ঘটিল না ! কিন্তু যেমনই নিমন্ত্রিত-রথী রথ লইয়া দেখা দেন, অমনই নিমন্ত্রণের লোভে ঢিলা পড়িয়া যায়। একটা অজানা ভয়, কি এক সন্দেহ মনটা ছমছম করিয়া তোলে। পরিচিত জগতের বাহিরে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোন সে দেশ ? গাঁয়ের কুটীরের বাহিরেই যে মানুষ প্রবাসী সে অচেনা রাজ্যের প্রজা হইতে যাওয়া কি সোজা কথা ! সেখানের সঙ্গে যত কারবারই থাক, যাত্রাকালে অনেকেরই উন্মুখ চিত্ত পিছু হটিতে থাকে। সেজন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। সে ঘরকন্নার ঘটি বাটিটাতেই কত না মায়া, আর আজন্মের এই দেহ ! তা হউক না ঘরখানা ভাঙ্গা, ঘটিটা ফুটো এবং দেহখানা জীর্ণ !

সৌদামিনীরও বোধ করি এইবার মরিতে বসিয়া, বাঁচিবার সাধ দেখা দিয়াছিল, মনকে বুঝাইতেছিলেন—আমার আবার মৃত্যুভয় কি? মরিলেই ত হাড় জুড়ায়! কিন্তু আবার একসময় মনটা যেন খুঁৎ খুঁৎ করিয়া বলিতেছিল—অনেক দুঃখ ত সহিলি, এখন বাঁচিলেও তবু দুদিন মেয়ে-জামাই নিয়ে স্বস্তি পেতিস! বিশেষ, দাদাবাবু যে তাঁর মৃত্যুতে বিশেষ আঘাত পাইবেন ইহা সৌদামিনীর কাছে আর ঢাকা ছিল না। বৃদ্ধের প্রতি মমতা হইতেছিল।

এবার নিতান্তই অপর্ণার বিবাহের ফুল বুঝি ফুটিল! একটি শুভদিনে বরপক্ষ মেয়ের হাতে গিনি দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। বরের আশীর্বাদ পূর্বেই হইয়াছিল। এখন এই কয়টা দিন কোনমতে নিজের শরীরটাকে ঠিক রাখিতে পারিলেই হয়।

বর বড়ঘরের ছেলে, বংশ বুনিয়াদী, তবে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের বালীচূণ খসিয়া প্রতিমার অনাগমন ঘোষণা করিতেছিল, পুষ্করিণী সংস্কারাভাবে পঙ্কিল, গৃহেও বহুপরিবার, কিন্তু নামডাক এখনও মন্দ নয়। ছেলেটিও চলনসই, দেখিতে শুনিতে ভাল, ডাক্তারী পড়িতেছে, পাত্র অর্থ মন্দ দিতে হইবে না। তা ভিন্ন ভবিষ্যতের ভরসাই এই ধনশূন্য ধনীদিগের ঘরে অপর্ণার স্থান করিয়াছিল।

রায়গৃহিনী সুপারি কাটিতে-কাটিতে ফাদি-নথের মধ্য দিয়া হাসিয়া কহিলেন—আহা বাছা প্রাণটা ধড়ে থাকতে থাকতে যে জামাইটি ঘরে আসচে এই তোমার ভাগ্যি। তোমার তো বাছা নাতির বয়সের পুতি। মেয়ের সময়ে বে দিলে এতদিনে নাতনির ব্যাটা কোলে করে যেতে পারতে।

অপর্ণা এই সহানুভূতিতে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেও মুখ সামলাইল, সে কনে; এখন হইতে তাহাকে লজ্জা করিতে হইবে। বিশেষ এবার সে বিবাহের জন্য নিজেই সবাপেক্ষা উৎসুক।

কিন্তু অপর্ণার বিবাহে নিজের দেওয়া অভিশাপ নিজের হাতে খণ্ডন করিতে বোধ করি লজ্জা বোধ করিতেছিলেন। এ অবস্থায় এ বিবাহে বাধা দিবার যে ব্যবস্থা চরম, তাহাই হইল। রাধিকাপ্রসন্ন একদিন সামান্য অসুস্থবোধ

করিয়া বিছানায় শুইলেন ; এবং যে শয্যা হইতে উঠিলেন সে শয্যা তাঁর মৃত্যুশয্যা হইল !

কবিরত্ন গম্ভীরমুখে মাথা নাড়িলেন ; সৌদামিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন ; বিহারী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সে আজ সর্বহারা হইতে বসিয়াছে।

প্রতিবেশী বিজ্ঞগণ ইহাদের মত মূঢ় নহেন, মনে ব্যথা বাজিলেও তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা ভুলেন নাই, পূর্ণসংজ্ঞা থাকিতে থাকিতে গঙ্গাযাত্রার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। এতগুলা স্বজাতীয় বন্ধুর মধ্যে থাকিয়া ঘরে-মরার অপবাদে যেন দশে না দূষিতে পারে ! তখনই চারিদিকে বৃহৎ ব্যাপারের সোরগোল পড়িয়া গেল ; ডাকাডাকি হাঁকাহাকি, হায় হায়, আহা আহা—চীৎকার, শব্দ বকাবকি, অনেক রকম স্বর-লহরীর মাঝখানে কান্নাচাপা-দীর্ঘশ্বাসে যেন পাড়াটা থমথমিয়া উঠিল। এই মরণ-পথের যাত্রীটি এ গ্রামের অনেকেরই মহাজন। সুদ সম্বন্ধে ইঁহার কড়াকড়ি প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও খাতকদের এ কথাও অজ্ঞাত নয় যে, বাকিসুদের হিসাব আনা-পাই ধরিয়া লইয়া ছাড়ের সময় সে হিসাব হইতে পাঁচসাত গণ্ডাতেও উঠিতে বাধিত না। তা ভিন্ন রাত-ভিত যখন প্রয়োজন টাকা ধারের দুঃখ এ গ্রামে আজ পর্যন্ত কেহ পায় নাই।

যাত্রাকালে সৌদামিনীকে কাছে ডাকিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া সেই হস্ত চুম্বন করিলেন। শান্ত মধুর হাসিয়া কহিলেন—বড় দুঃখ হচ্চে না ? ভেবেছিলি তোর মায়ের মতন তুইও জব্দ করবি। কেমন, না ? কেমন মজা ত হল ? বড় সেয়ানা না ? তোদের চেয়েও যে সেয়ানা ওপোরে বসে হাসছে, তার খবর রাখিস ?—সৌদামিনী প্রথমে ভাঙ্গিয়া পড়িলে পুনশ্চ স্নিগ্ধ হাসে কহিলেন—সুবিধে করতে পারলি নে, শালি ! হেরে ভূত হয়ে গেলি। অপর্ণার মাথায় হাত দিয়া, আশীর্বাদ করিলেন ; কহিলেন, —কপালে নেই অন্নপূন্নো ! তোর বিয়ের ভোজটা খেয়ে যেতে পেলাম না। না হোক, আমার শ্রাদ্ধের দিনে তুই বাছা তেমনি ছাইছাই রান্না দুটো রেঁধে বামুনদের খেতে দিস ! সেই যেমন ভেটকি মাছের ঘণ্ট যাচ্ছেতাই করে

রাঁধতিস, জ্রেত-ভোজন ঠিক যেন তেমনটি হয়! দেখিস ঠকাসনে, বামুনের মুখেই ত এখন থেকে খাবো। ফাঁকিটি চলবে না!

বিহারী শিশুর মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। তাহাকে কোন সাহায্যেই পাওয়া সম্ভব হয় না, সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দিকে পূর্বের মতই বিদ্রূপ মিশ্রিত বিরক্তির সহিত ফিরিয়া তাকাইলেন—আ-মলো! নেমক-হারামটা চিরকালই কি একরকম? কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। মিথ্যে কেঁদে কেন মরছিস বিহারি! তোর আর লোকসানটা কি হচ্ছে শুনি? দিব্যি করে শ্রাদ্ধের দিনে একপাতা গরম লুচি খাবি; হবিষ্যির হাঁড়ি চড়াতেও হবে না—কিচ্ছুই না। আয় উঠে আয়—কাছে আয়!—

বিহারী দ্বিগুণবেগে কাঁদিয়া ফুলিতে ফুলিতে আজ্ঞা পালন করিল। চোখের জলে সমস্তই তার ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। কর্তা পিঠের উপর দুর্বল হাতটি রক্ষা করিলেন; বলিলেন—থাম থাম, নচ্ছার পাজি! এত বড় ছোট লোক ব্যাটা! হাড়ী ডোমের মত হাই হাই করে কেঁদেই ম'লো! বলিতে চোখে একটু জলও দেখা দিল।—দামিনি! তোর সেই ইতর চামার বাপ-ব্যাটার কাছে এইবার চললুম রে! দেখি, এবার পাজি-বেটা ঠেকার-করে আমার মেয়ে কেড়ে নিয়ে কদ্দুরে সরে যায়।

কবিরত্ন নাড়ী দেখিয়া বিশেষ কোন সাংঘাতিক ইঙ্গিত করিলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই ত্রিবেণীর মুক্ত সঙ্গমাভিমুখে বাকুলের ব্রাহ্মণপাড়ার অধিবাসীর পাড়া ঝাঁটাইয়া প্রায় সকলেই বাহির হইয়া গেল।

২৫

আকাশে এক আকাশ জলজ্বলে নক্ষত্র, মায় আলোকোদ্ভাসিত পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া ঘুমাইলাম—ঘুম ভাঙিয়া দেখি কোথায় চাঁদ, কোথায় তারা? অশনিভরা কালো মেঘের বুক তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের ছবি কাটিয়া কাটিয়া কুচাইতেছে। ঠিক যেটি কল্পনা করা যায়, তাহাকে ব্যতিক্রম করাই সংসারের ধর্ম।

করিয়া বিছানায় শুইলেন ; এবং যে শয্যা হইতে উঠিলেন সে শয্যা তাঁর মৃত্যুশয্যা হইল !

কবিরত্ন গম্ভীরমুখে মাথা নাড়িলেন ; সৌদামিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন ; বিহারী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সে আজ সর্বহারা হইতে বসিয়াছে।

প্রতিবেশী বিজ্ঞগণ ইহাদের মত মূঢ় নহেন, মনে ব্যথা বাজিলেও তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা ভুলেন নাই, পূর্ণসংজ্ঞা থাকিতে থাকিতে গঙ্গাযাত্রার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। এতগুলা স্বজাতীয় বন্ধুর মধ্যে থাকিয়া ঘরে-মরার অপবাদে যেন দশে না দূষিতে পারে ! তখনই চারিদিকে বৃহৎ ব্যাপারের সোরগোল পড়িয়া গেল ; ডাকাডাকি হাঁকাহাকি, হায় হায়, আহা আহা—চীৎকার, শব্দ বকাবকি, অনেক রকম স্বর-লহরীর মাঝখানে কান্নাচাপা-দীর্ঘশ্বাসে যেন পাড়াটা থমথমিয়া উঠিল। এই মরণ-পথের যাত্রীটি এ গ্রামের অনেকেরই মহাজন। সুদ সম্বন্ধে ইঁহার কড়াকড়ি প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও খাতকদের এ কথাও অজ্ঞাত নয় যে, বাকিসুদের হিসাব আনা-পাই ধরিয়া লইয়া ছাড়ের সময় সে হিসাব হইতে পাঁচসাত গণ্ডাতেও উঠিতে বাধিত না। তা ভিন্ন রাত-ভিত যখন প্রয়োজন টাকা ধারের দুঃখ এ গ্রামে আজ পর্যন্ত কেহ পায় নাই।

যাত্রাকালে সৌদামিনীকে কাছে ডাকিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া সেই হস্ত চুম্বন করিলেন। শান্ত মধুর হাসিয়া কহিলেন—বড় দুঃখ হচ্চে না ? ভেবেছিলি তোর মায়ের মতন তুইও জব্দ করবি। কেমন, না ? কেমন মজা ত হল ? বড় সেয়ানা না ? তোদের চেয়েও যে সেয়ানা ওপোরে বসে হাসছে, তার খবর রাখিস ?—সৌদামিনী প্রথমে ভাঙ্গিয়া পড়িলে পুনশ্চ স্নিগ্ধ হাসে কহিলেন—সুবিধে করতে পারলি নে, শালি ! হেরে ভূত হয়ে গেলি। অপর্ণার মাথায় হাত দিয়া, আশীর্বাদ করিলেন ; কহিলেন, —কপালে নেই অন্নপূন্নো ! তোর বিয়ের ভোজটা খেয়ে যেতে পেলাম না। না হোক, আমার শ্রাদ্ধের দিনে তুই বাছা তেমনি ছাইছাই রান্না দুটো রেঁধে বামুনদের খেতে দিস ! সেই যেমন ভেট্‌কি মাছের ঘণ্ট যাচ্ছেতাই করে

রাঁধতিস, শ্রেত-ভোজন ঠিক যেন তেমনটি হয়! দেখিস ঠকাসনে, বামুনের মুখেই ত এখন থেকে খাবো। ফাঁকিটি চলবে না!

বিহারী শিশুর মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। তাহাকে কোন সাহায্যেই পাওয়া সম্ভব হয় না, সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দিকে পূর্বের মতই বিদ্রূপ মিশ্রিত বিরক্তির সহিত ফিরিয়া তাকাইলেন—আ-মলো! নেমক-হারামটা চিরকালই কি একরকম? কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। মিথ্যে কেঁদে কেন মরছিস বিহারি! তোর আর লোকসানটা কি হচ্ছে শুনি? দিব্যি করে শ্রাদ্ধের দিনে একপাতা গরম লুচি খাবি; হবিষ্যির হাঁড়ি চড়াতেও হবে না—কিচ্ছুই না। আয় উঠে আয়—কাছে আয়!—

বিহারী দ্বিগুণবেগে কাঁদিয়া ফুলিতে ফুলিতে আজ্ঞা পালন করিল। চোখের জলে সমস্তই তার ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। কর্তা পিঠের উপর দুর্বল হাতটি রক্ষা করিলেন; বলিলেন—থাম থাম, নচ্ছার পাজি! এত বড় ছোট লোক ব্যাটা! হাড়ী ডোমের মত হাই হাই করে কেঁদেই ম'লো! বলিতে চোখে একটু জলও দেখা দিল।—দামিনি! তোর সেই ইতর চামার বাপ-ব্যাটার কাছে এইবার চললুম রে! দেখি, এবার পাজি-বেটা ঠেকার-করে আমার মেয়ে কেড়ে নিয়ে কদ্দুরে সরে যায়!

কবিরত্ন নাড়ী দেখিয়া বিশেষ কোন সাংঘাতিক ইঙ্গিত করিলেন। দশ-মিনিটের মধ্যেই ত্রিবেণীর মুক্ত সঙ্গমাভিমুখে বাকুলের ব্রাহ্মণপাড়ার অধিবাসীরা পাড়া ঝাঁটাইয়া প্রায় সকলেই বাহির হইয়া গেল।

২৫

১

আকাশে এক আকাশ জ্বলজ্বলে নক্ষত্র, মায় আলোকোদ্ভাসিত পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া ঘুমাইলাম—ঘুম ভাঙিয়া দেখি কোথায় চাঁদ, কোথায় তারা? অশনিভরা কালো মেঘের বুক তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের ছবি কাটিয়া কাটিয়া কুচাইতেছে। ঠিক যেটি কল্পনা করা যায়, তাহাকে ব্যতিক্রম করাই সংসারের ধর্ম।

সৌদামিনীর যেমন চিরদিন ঘটিয়া আসিয়াছে, মৃত্যুকালে তার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেমন করিয়া? মরণের মুখে এতবড় বাধা পাইয়া মৃত্যুপথবর্তিনীর কি যে অবস্থা তাহা অব্যক্ত! এই বিধাতার অভিশপ্ত ছাইপড়া বিবাহের সম্বন্ধেও সংশয় বড় কম জাগে নাই।

মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধাধিকারী অবর্তমান। হুগলী-বালীতে সবেমাত্র একজন ত্রিরাত্রাশৌচের দূর সম্পর্কীয় দৌহিত্র সন্তানের কথা বিহারীর জানা ছিল। সে কোনমতে শরীর মনে একটু বল সংগ্রহ করিয়া সেইখানে গেল। একটা খবর তো একমাত্র কুটুম্ব-পুত্রটিকে দেওয়া উচিত।

খুঁজিলে জগতে অনেক জিনিষই পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় যাহা বড় দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বোধ থাকে হঠাৎ দেখা যায় তার মত সুলভ সংসারে অল্পই আছে। ৺রাধিকাপ্রসন্নর দৌহিত্র সম্পর্কীয়ের বার্তা লইতে গিয়া বিহারী এমন এক আবিষ্কার করিল যাহা সেই মুহূর্তে তাহাকে যেন অতল গহ্বরে ঠেলিয়া দিল। বালীর সেই বেণীমাধবের গৃহে তার এক সুদূর-সম্পর্কীয় কিছুদিন হইতে আসিয়া দারিদ্র্যের অংশ এই অর্দ্ধদরিদ্র সংসারে বণ্টন করিতেছিল। তাড়াইলেও সে তাড়িত হয় নাই, জবর দখলে শোণিতপায়ী জীববিশেষের মত আত্মীয়তা-অপরাধে অপরাধী-গণের ঘাড়ে চড়িয়া আছে। দু-এক কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িল, এই পরিবারের কর্তা কামাখ্যাচরণ ৺রাধিকাপ্রসন্নর নিকটতর আপনার জন, দশ রাত্রির অশৌচাধিকারী—শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাধিকারী—আর? তাঁর বিষয়াধিকারীও!

সেকালের কুলীন-সম্প্রদায়ের কল্যাণে এরূপ চির অপরিচিত আত্মীয়ের আকস্মিক আবির্ভাব—ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরে বিস্ময়জনক নয়। ইহার একপুরুষ মাত্র ঊর্দ্ধে; পিতা-পুত্র, পতি-পত্নীর ভিতরেই অপরিচয়ের দূরত্ব দেখা গিয়াছে। কামাখ্যাচরণ রাধিকাপ্রসন্নর বৈমাত্রেয় ভ্রাতুষ্পৌত্র। অবশ্য মায়েরা এবং ভায়েরা এ যাবৎ কেহ কাহাকেও চাক্ষুষ করেন নাই, কিন্তু না করিলে কি হয়, কামাখ্যাই এ বংশের পুত্রসন্তান, একমাত্র সেই তার জ্যেষ্ঠ

পিতামহকে জলগণ্ডূষদানে প্রেতলোক হইতে উর্ধ্বে—পিতৃলোকে প্রেরণ করিতে সমর্থ! সৌদামিনী এ বাড়ীর কে?

শ্রাদ্ধ বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। নূতন কর্তার অবশ্য এত করার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু বিহারী এবং পাড়ার লোকে তার কথায় কর্ণপাত করে নাই। বাধা দিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নয় বুঝিয়াও মনের অসন্তুষ্টি চাপিয়া রাখিতে হইল; কে জানে কোথা দিয়া কি একটা দলাদলির ঘোট কি খুঁট কে কখন খুঁটিয়া তুলিবে, পাড়া-পড়শী ঠাণ্ডা থাকিলে পল্লীবাসীর দেবতাও সন্তুষ্ট থাকেন।

তা পাড়ার লোকে তুষ্টই হইয়াছিল। মানুষ সোজাসুজি কিছু হওয়ার চাইতে একটা রদ বদল যা লইয়া দুদিন ঘোঁটমণ্ডল করা যায়, তেমন কিছুই পছন্দ করে। তা ভিন্ন আর এক কথা, মেয়ের ঘরে গাঁয়ের ধন চলিয়া গিয়া ঘর নষ্ট হইয়া যায়, এটাও তারা পছন্দ করে না, যেমন তেমন করিয়া বাড়ীটা বজায় থাকে তাই চায়।

শ্রাদ্ধের সময় তিন গ্রামের লোক এক হইয়া মিতব্যয়ী মৃতের বেশ মোটারকম খরচা করাইয়া গেল। সে বেচারী বাঁচিয়া থাকিলে এত কাণ্ড দেখিয়া যে কি করিতেন, তাই ভাবিয়া অপর্ণা একটু কৌতূহলী হইতেছিল। পরলোক হইতে এ সমুদয় দেখা যায় না ত? কে জানে! সে এক সময় কর্মে নিষ্পেষিত চিত্ত শোকপরিক্লিষ্ট বিহারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বেহারি-দা কর্তা-মশাই সেখানে এখন কি করছেন বল তো?

বিহারী—নহিলে নয় তাই খাটিতেছিল; কিন্তু মন তার অবোধ শিশুর মতই ভিতরে ভিতরে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতেছে। কতদিন হইয়া গেল কাহারও কাছে সে গালি খায় নাই, বুক তার সেই আদরটুকুর অভাবে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ অপর্ণার এই কথায় তার দুই চোখের কানায় কানায় জল ভরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কোমরে জড়ান কোঁচার খুঁট টানিয়া চোখ মুছিয়া ভগ্নস্বরে কহিল—এতক্ষণ তিনি? আর কি, স্বর্গে চলে গেলেন!

—না বেহারি দা! আমি বলছি শোন। স্বর্গে বসে বসে তোমায় তিনি এখন এলোপাথাড়ি গাল দিচ্ছেন! হঁ্যা গো বেহারি-দা, আমি সত্যি শুনতে পাচ্ছি, ঐ শোন! বেহারি! নেমকহারাম! আমার সব টাকাকড়িগুলো এমনি করে উড়িয়ে দিলি? নিশ্চয় একথা বলছেন।

বিহারীর শুষ্ক অধরে ঈষৎ বিষন্ন হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তাহার ব্যথাক্ষুব্ধ দৃষ্টি নীরবে বলিল—আহা, তাই বলো দিদি! তাই বলো, একেবারে আমায় যেন ভুলে না যান!

শ্রাদ্ধ ও জ্ঞাতিভোজন সমাপ্ত হইয়া গেল। হুগলীর কীর্তনওয়ালা মসীকৃষ্ণ দেহে স্বর্ণালঙ্কারের চিকনাই খুলিয়া দিয়া কয়দিন মৃতের সদ্‌গতিলাভ উদ্দেশ্যে উদয়াস্ত চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া দক্ষিণান্ত হইয়া বিদায় লইয়াছে। এখনও পাঁচটা ছেলে একসঙ্গে জড়ো হইয়া যথাশ্রুত—দিগম্বরের বাঘাম্বর কটি হতে যায় খুলে, মুখে বলে হরিধ্বনি ভাসে প্রেমহিল্লোলে—ইত্যাদি কীর্তনগানে চারিদিকে হরিনামামৃত ছড়াইতেছিল। ষোড়শদানের জিনিষপত্র ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া কিছু বচসা হইয়া সে সব অতঃপর চুকিয়া গিয়াছে, তুষ্টিরামের গলাফাড়া চীৎকারে স্বর্গীয় ব্যক্তির স্বর্গ কতখানি বৃদ্ধি হইল বুঝা গেল না, দেশের লোকের কাণের তালা যে খুলিয়া গিয়াছিল, সেটা তারা বিদায় হইলে জানা গেল। চারিদিক ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে বিহারী বাজার দেনা প্রভৃতি লইয়া নূতন ভূস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্যারম্ভ করিতে আসিল।

কামাখ্যাচরণ পয়সাকড়ি চোখে বড় একটা দেখিতে শুনিতে স্নবিধা পান নাই বটে, কিন্তু তাহাকে তাঁহাকে বিষয়বুদ্ধিহীন করিয়া ফেলিতে পারে নাই। প্রথম দিন কাচা গলায় দিয়া এ বাড়ীতে পদার্পণমাত্রেই তিনি পুরাতন কর্মচারী বিহারীর নিকট হইতে পাড়ার পাঁচজন বিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাতে খাতাপত্র ঘাঁটাইয়া যেখানের যত বাকি বকেয়া দেনাপাওনার হিসাব বুঝিয়া লইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য শুধু হিসাবই নয়, হিসাবের কড়িও বুঝিতে ছাড়েন নাই। তারপর এ কয়দিনও খুবই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সবাই যখন শ্রদ্ধাযুক্ত আসন্ন শ্রাদ্ধের উদ্‌যোগে যত্নশীল, তিনি তখন হুগলী কোর্টের উকিল বাড়ীতে কম্বলাসনে

বসিয়া কূট পরামর্শ করিতে বিশেষ ব্যস্ত। বিহারী যেদিন নূতন হিসাবের খাতাপত্র লইয়া কর্তার বৈঠকখানায় দেখা দিল, তার পূর্বেই পুরাতন খাতাপত্রের যা কিছু আবশ্যকীয় পরিবর্তন প্রয়োজন নিরুপদ্রবে সমাধা হইয়া নূতনের অধিকার ঘোষণারম্ভ করিয়াছে।

বাজারদেনার কথাবার্তা হইয়া চুকিয়া গেলে হঠাৎ বিহারী বলিল—বিয়েরও ত আর দিন নেই, সঙ্গে সঙ্গেই সব করে তুলতে হবে। যা যোগাড হয়েছিল সে সব ত—

গলা কাঁপিয়া কথাটা জিভের আগায় আট্‌কাইয়া রহিল, এর বেশী এ সম্বন্ধে উচ্চারণ করিবার শক্তি তার ছিল না।

কামাখ্যাচরণ যেন স্বপ্ন হইতে জাগিলেন।—বিয়ে! কার বিয়ে?—বিহারীর নিজের মনিবকে স্মরণ হইল। হাজার হোক রক্তের সম্বন্ধ আছে তো! কহিল—সৌদামিনী মায়ের মেয়ে অপর্ণাদিদির বিয়ের সবই ঠিক তো। মাঝে হতে এই কাণ্ড ঘটে গেল। ২৪শে ফাল্গুন দিন হয়ে আছে।—স্মৃতির তাড়নে চক্ষু তার আবারও সজল হইয়া আসিল।

কামাখ্যাচরণ বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া রহিলেন! অবাক হইয়া বলিলেন—ঐ মেয়ে কি আজও আইবুড়ো? আমি ত একথা কই শুনি নি! বিয়ের কোথা হবে? এখানেই নাকি?

বিহারীও কিছু বিস্ময় কিছু বিরক্তি বোধ করিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ, এই বাড়ীতেই হবে। সৌদামিনী মা এখানেই থাকেন, আর কোথায় বিয়ে হতে যাবে বলুন?

তারপর একটু অপ্রতিভ হইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ধীরস্বরে কহিল—বরেরা বড্ড ভাল খুবই ভদ্র, এই বিপদ হয়ে যাওয়ায় আন্তরিক দুঃখিত। কাজের দিন কি জন্য আসতে পারেন নি, তাই দুঃখ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। অমন ছেলে, সে হিসেবে কামড়ও বেশী নয়। গণ পণ অলঙ্কারপত্রে মোটামুটি তিন হাজার টাকাতেই তাঁরা রাজী আছেন। বর যাতায়াত খরচ ফুলশয্যা বাবদ আরও তিনচার-শো, আর খাইখরচ—সামান্যভাবেই। মোট

ধরুনগে, সাড়ে তিন—কি চার হাজার টাকা। রূপোর দান, হীরের আংটি এগুলি বলে কয়ে বাদ দিইয়েছি।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কামাখ্যাচরণ মৃত্যু আর্তনাদের মত উচ্চারণ করিলেন—সাড়ে তিন—চার হাজার টাকা! বলো কি বেহারি! এ সবই আমায় দিতে হবে? এঁ্যা!

—আজ্ঞে হঁ্যা—তা দিতে হবে বই কি! ৺কর্তামশায়ের দৌত্রির মেয়ে উনি। দিতে তো হবেই। তা ওর জন্যে তো খুব বেশি কষ্ট পেতে হবে না, ৺কর্তামহাশয়ের এখনও ঐ সাড়ে তিন হাজার বাদ দিয়ে ধরলেও আপনারগে প্রায় এগার হাজারের কাছাকাছি নগদ টাকাই থাকে।

—এঁ্যা! বলো কি বিহারি! স—ব আমার—আমার টাকা থেকে দিতে হবে? ওরা নিজেরা কিছুই বার করবে না? সেটা কি উচিত হবে? তুমিই বলো, সেটা কি ওদের ন্যায্য হবে? এই দেখ না, কর্তার কাজেই এই সবে সেদিন মাত্তর কতকগুলো টাকা খামাখা খরচ হয়ে গেল। হিসাব ত এই, এমনি করলে? প্রায়- একহাজার সাতশো, সওয়া সাতশো টাকাই খরচা হয়েছে। আবার ঐ অত!

বিহারী দেখিল টাকা খরচের শোকে কামাখ্যাচরণ প্রায় কাঁদিয়াই ফেলেন! তার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল, এখন আবার হাসিও পাইল। মনে মনে বলিল—আহা, তোমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে আনা ধন আর কি! কখনও কড়াকড়ি চোখে দেখ নি, একেবারেই আঠার হাজার। প্রাণ কাঁদবেই ত! প্রকাশ্যে সহজকণ্ঠেই বলিয়া গেল ওঁদের আবার স্বতন্ত্র টাকা কোথা! ঐ একসঙ্গেই তো সব আছে। যা হোক, বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতেই হবে। —তারপর একটুখানি মাত্র থামিয়াই এ প্রসঙ্গ বেশি না চলে সেই ইচ্ছায় হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল- যাই, কার বাড়ীর কি জিনিষপত্র বিদায় করতে বাকি আছে দেখে শুনে পাঠাই গিয়ে।

কামাখ্যাচরণ যখন আকস্মিক এই বিপদের সংবাদে হতভম্ব হইয়া গিয়া 'সচিব সখী মিত্র' রূপিণী গৃহিণীর তল্লাসে বাটীর মধ্যে আগমন করিলেন,

তার একটু পূর্বে অপর্ণা মায়ের জরতপ্ত ললাটে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া দক্ষিণধারের বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিল, তাহারই একধারে বাড়ীর নূতন গৃহিণী বসিয়া একখানা কাঠের কাঁকইয়ের দ্বারা নিজের কয়দিনকার জটাবাঁধা চুলের সংস্কার-চেষ্টা করিতে করিতে অপারগতার ক্ষোভে ঠোঁটে জিবে চুক্‌চুক্ শব্দ ও মুখ বিকৃতি করিতেছেন। চিরুনীখানার দাঁড়া ময়লায় প্রায় বুজিয়া গেছে; চুলগুলাও পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মতই, সম্মুখে প্রশস্ত সিন্দুরপ্রলিপ্ত বৃহৎ টাক এবং পিছনে এককাঁড়ি লম্বা চুল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল—এ কি করচেন ?

ক্ষ্যান্তমণি ঠোঁটে ঠোঁটে একপ্রকার ক্ষোভশব্দ প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন—এই চুলমুড়োটা হেঁচুড়ে পেঁচুড়ে গোঁজা বানাচ্ছি।

উত্তর শুনিয়া অপর্ণার হাসি পাইলেও সে প্রকাশ্যে হাসিতে ভরসা না করিয়া একটু পরে বলিল—আমি চুল বেঁধে দেবো ?

ভারীমুখখানা আনন্দে সমধিক ভার করিয়া গৃহিণী মুখ ফিরাইলেন—তোমার মতন বিবিয়ানি-খোঁপা বেঁধে দেবে তো ? তা দাও।

অপর্ণা দ্রুতপদে ঘরে ফিরিয়া চিরুনী ফিতা প্রভৃতি লইয়া অল্প পরেই ফিরিয়া আসিল। তারপর সেই কয়দিনের রুক্ষ থাকার প্রায়শ্চিত্তে তেল সুট্‌সুটে চিটা জটা ও দুর্গন্ধযুক্ত চুলের গাদা লইয়া অম্লানমুখে সে বসিয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা চেষ্টা চরিত্রের পরে সুগন্ধ-তৈলযুক্ত বেশ একটি সুশ্রী কবরী রচিত হইলে সামনে যথাসাধ্য ঢাকা-দেওয়া টাকে মাফিকসই সিন্দুর পরাইয়া দিলে ক্ষ্যান্তমণি হাত দিয়া খোঁপাটি যথাসাধ্য উপভোগ করিবার পর ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—হঁ্যাগ্‌গো ! —একটা আয়না নাই ?

—আছে, আনছি।

অপর্ণা তৎক্ষণাৎ গিয়া একটা বড় হাত-আরসি আনিয়া দিলে—দর্পণে মুখ দেখিয়া গৃহিণীর গুলটেপা মুখে হাসি আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। কে বলে তাঁর রূপ নাই, বয়স নাই ! এই তো চুলটি বাঁধিয়াই অমনি ছিরিটি কেমন ফিরিয়া গিয়াছে ! নকড়ে-র বাবা দেখিয়া না জানি কি-ই বলে ?

ঠিক এমনি সময়েই খড়মের খট্‌খট্‌ করিতে করিতে 'নকড়ির পিতা' আসিয়া ডাকিলেন—বলি, ও—এই তোমরা সব কোথায় গো!

—মরণ আর কি! কপালের ওপর চক্ষু দুটা গেল কেমনে, ক্যানে গা?

অপর্ণা এই আত্মীয়টির সাক্ষাতে স্পষ্টভাবে কোন দিন বাহির হয় নাই। ইহার অল্পরক্তাভ চোখ দুটির বিমুগ্ধ দৃষ্টি তার মনকে সহজেই উত্যক্ত করিয়া তোলে, অথচ জানে এখন এ দৃষ্টিকে নামাইতে বাধ্য করা তাদের পক্ষে সহজ নয়। সে চলিয়া গেল। গৃহস্বামী নিকটে আসিয়া—এই যে আন্দির মা —বলিতে বলিতে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই রহিলেন। কয়দিনের গোলমালে নিজের স্ত্রীকেও বড় একটা চোখ মেলিয়া দেখিবার অবসর ছিল না, আজ যেন এ এক নূতন মানুষ চোখে পড়িল।

কয়েকদিনের হবিষ্যান্ন ঘৃত দুগ্ধের প্রচুরতায় সেই শুষ্কদেহে উহারই মধ্যে যথেষ্ট স্নেহরস নিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে চিক্কণ করিয়াছে, ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের পরিবর্তে বিহারীর আনিয়া দেওয়া চওড়া লালপাড় কোরা সাড়িপরা একহাত চুড়িতে, তার উপর সেই অপূর্ব 'গোঁজার' বদলে এই চুলবাঁধা। স্থানটা নিতান্ত প্রকাশ্য! প্রৌঢ় গৃহস্বামী সুসময়ের অপেক্ষায় আপাততঃ বিষয়ান্তরে মন দিতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন—শুন্‌চি না কি বাড়ীতে একটা কে ধেড়ে আইবুড় ছুঁড়ি আছে? কই, তুমি ত আমায় সে কথা কিছু বল নাই, পিটুরের বউ?

ক্ষ্যান্তমণির এ অনুযোগ ভাল লাগিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এই নূতন রূপ দেখিয়া স্বামীটি তার একটু বিশেষরূপ মোহিত হন। মিশিমাখা কালো দাঁতগুলি অপ্রসন্নতায় বাহির করিয়া বলিলেন—ওমা! তা আবার বলবো কি গা? আছে আছেই। তোমাদের কুলীনের ঘরে কি অমন থুবড়ো বেটি কারু ঘরে থাকে না? একি মেয়ে-বেচার ঘর?

কর্তা কহিলেন—ওগো এ তা নয়। শুনচি নাকি এঁর ২৪শে ফাল্গুন বে। সাড়ে তিন হাজার টাকা না কি আমাকে এঁর বে'তে খরচা করতে হবে।

—তোমাকে?

—হ্যাঁ গো, আমাকে!

—ই-ল্লো! রস দেখে আর বাঁচি নে! অত নয়! যাও যাও ট্যাকা খরচ করে জ্ঞেতি-ভাগ্নির বে ছ্যায় না। এদ্দিন যখন হয় নি, আর কিছুদিন বাকী থাকলেও চলবে।

হাজার মূর্খ পাড়াগাঁয়ে হইলেও কামাখ্যাচরণ স্ত্রীলোক নহেন, এই যুক্তিতে মন স্থির করিতে পারিলেন না। মুল্লুকের রাজা আইনে বড় কড়া। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

পরদিন বিহারী সেকরা মুদি প্রভৃতির বায়নায় জন্য কিছু টাকা চাহিতেই কামাখ্যাচরণের মুখ শুকাইয়া গেল। সত্যই যে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া বিবাহ হইতে চলিল!

ম্লান হাসিয়া কহিলেন—টাকা কই বিহারী? বিয়ে এখন তো হতেই পারে না, ছ মাস এখন যেতে দাও, একটু সামলে উঠি।

বিহারী ধীরকণ্ঠে কহিল—তাঁরা এতে রাজী নন। আর সৌদামিনী মায়েরও ইচ্ছে তিনি বেঁচে থেকে মেয়ের বিয়ে থা দিয়ে যান।

কামাখ্যা একটু গলা ঝাড়িয়া লইলেন—তা, তা, সে—সে কি এখনি মরবে?—রোগটা কি?

প্রায় দিন পনের হইতে যার বাড়ী আসিয়াছেন; এতদিনে 'কি রোগ' খবর লইবার হুঁস হইল? বিহারীর মনে একটা তীব্র অভিমান জাগিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু হায়! বৃথা এ পরিতাপ!

সে নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল—কবিরাজ তো বলেন, যক্ষ্মা।

—অ্যাঁ! বল কি তুমি? আমার বাড়ী যক্ষ্মারুগী? এটা ত ভাল না!

তীব্ররোষে বিহারী অগ্নিকণাবর্ষী দৃষ্টিতে গৃহস্বামীর দিকে চাহিল। তার সেই আগুন-ঠিকরানো চাহনিতে কে জানে কি করিয়া কামাখ্যাচরণ যেন সর্প-বৈদ্যের মন্ত্রের কাছে কালসর্পের মতই দৃষ্টি নত করিলেন। এই অধম ভৃত্যটার ঔদ্ধত্য অনেক সময়ই তাঁর অসহ্য হয় কিন্তু প্রতিবাদ করিতেও কে জানে কেন মনে সৎ-সাহস জাগে না।

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরবে দুইদিকে চাহিয়া থাকিবার পর বিহারী দাঁড়াইয়া

উঠিয়া দৃঢ় অথচ নম্রস্বরে কহিল—যতীন দত্তর স্থদের টাকা পাওনা আছে, আজ তার দেবার কড়ার। আরও গণ্ডা-পনেরো টাকা আজই চাই। লগনসার বাজার, দেরি করলে জিনিষের জোগান পাওয়া মুস্কিল হবে।

তাহার কণ্ঠস্বরে কঠিন প্রতিজ্ঞার স্থর ধ্বনিত হইল। কামাখ্যাচরণও আবারও যেন কেমন একটা অশান্তি অনুভব করিলেন। স্পষ্ট 'না' বলাও যায় না, আবার হ্যাঁ-ই বা বলেন কি করিয়া? টাকাটা ত আর কম নয়। পাঁচশো উপর—তি—ন—হাজার! একটু গাঁই গুঁই করিয়া গলা খাঁকরাইয়া কোন রকমে নতচক্ষে বলিয়া ফেলিলেন—আ - আচ্ছা, তা আজ থাক না, কাল তখন টাকা দেবো, আজ—এখন—ইয়ে—কি না—এই কি বলগে—বারবেলা হয়ে এলো তো!

বারবেলার তখনও বিলম্ব ছিল, বিহারী ক্ষোভ বিরক্তিযুক্ত দুঃখের হাসি হাসিল -তবে থাক, কাল কিন্তু আমায় কালনা যেতেই হবে। ক'দিনই বা আর সময়? দিন ত দেখতে দেখতেই চলে যাচ্ছে।

কতকগুলি বাকসপাতা ঔষধের অনুপানের জন্য দিতে আসিলে সৌদামিনী বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—কই মামা কালনা গেলে না?

বিহারীর বুকটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। কণ্ঠ-বাষ্প নিরোধ করিয়া কোনমতে ম্লানওষ্ঠে হাস্যাভাস ফুটাইয়া সচেষ্ট থাকিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আজ আর গেলাম না মা, কাল যাব।

—শরীর ভাল আছে ত মামা? ক'দিন ধরে খেটে খেটে ভেবে ভেবে তোমার যে আর দেহে কিছুই নেই। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিয়ের হাঙ্গামা!

আবার একটা দুশ্চিন্তাযুক্ত বিষাদে বিহারীর বুক ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল।—তাতে কি, মা! রামচন্দ্র করুন; সু-ভালাভালি দিদির আমার দুটি হাত এক হয়ে যাক।

বলিতে বলিতে সে উঠিয়া গেল। পাছে তাঁর এই নূতন ভাবনার কথা সৌদামিনী জানিতে পারেন, এই ভয়ে সে এখানে বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে সাহসী হইল না। মনকে জোর করিয়া বুঝাইতেছিল, যে হয়তো এতটাই পারিবে না, দিবে সেই, তবে একটু নাকাল করিয়া দিবে।

যে দিন কোথাও কিছু নাই অকস্মাৎ দাদাবাবু তাদের তুদিনের পাওনা মিটাইয়া দিয়া ব্যঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন, সেই দিনই সৌদামিনীর হৃদয়ে আবার আশা-প্রদীপের তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছিল। যেদিন তার দাদাবাবুর সহিত চিরজীবন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিয়া তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁদের এই অপরিচিত আত্মীয়টি সমুদয় সম্পত্তির অধিকার লইতে আসিয়া পৌঁছিল, সেইদিনই সেই মিট্‌মিটে প্রদীপটির মৃত্যু-শিখা কম্পিত নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। সেই আত্মীয় সম্বন্ধে বোধ করি অনভিজ্ঞতাবশতঃই দাদাবাবু কোন প্রকার লেখাপড়া করিয়া দিয়াও তো যান নাই! তুর্বল বক্ষ তাঁর এই নব-বিয়োগ শোকাপেক্ষাও নূতন ভয় ভাবনায় ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল।

নূতন গৃহিণী প্রথম দিনে আসিয়াই নিজের ঘর কন্না বুঝিয়া লইলেন। এইরূপ অকস্মাৎ কিছুই না থাকার পর যাহারা একেবারে খুব বেশীরকম পায়, সেই আকস্মিক পাওয়াটা রহিয়া বসিয়া হজম করার অপেক্ষা করিতে তারা কোনমতেই পারে না। সবটা একসঙ্গে গো-গ্রাসে গ্রাস করার দিকেই উদ্দাম প্রবণতা দেখা যায়। এই শ্রেণীরই মানুষ এ বাড়ীর নূতন গৃহিণী। তাঁর বোধ করি কস্মিন্ কালে দ্বিতলের সিঁড়ি চড়া অভ্যাস, নাই! প্রথমে তিনি পতন ভয়ে হাতে পায়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়া সকলের হাসি ও দৃষ্টান্তে তদনু-করণ করিলেন। কিন্তু সেই একবার, তারপর আর কোন বিষয়েই তিনি ঠকেন নাই! সৌদামিনীর ঘর তিনি বড় একটা মাড়ান না; সৌদামিনীরও উঠা হাঁটার শক্তি হ্রাস পাইতেছিল। সেইজন্য সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তুজনকেই পরস্পরের সহিত নৈকট্যে বিশেষে আসিতে হয় নাই। অপর্ণাকেই এই নূতন স্রোতের ধাক্কাটা খাইতে ও ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছিল। সৌদামিনী বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কয়দিন দিনরাতই স্পন্দিতবক্ষে ভগবানকে ডাকিতেছিলেন, যেন এই অভাবনীয় ব্যাপারে অপর্ণার ভাবীশ্বশুর বিবাহ বন্ধ না করেন, যেন ভালয় ভালয় মেয়েটি পার হয়।

বাড়ীতে কত লোক, কত কোলাহল, কত কথা—বিচিত্র সুরে ও বেসুরা কণ্ঠে কতই না হাসি মস্করা—কলহ-কাকলি! তাঁর কর্ণে এ সবের কিছুই যেন প্রবেশ করিতেছিল না, তিনি মুদিতনেত্রে স্তম্ভিতচিত্তে পড়িয়া পড়িয়া শুনিতেছিলেন—

'মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীঃ র্ন সন্তোষধীঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ,—
ওঁ মধু মধু মধুঃ ॥'

মৃতের চারিদিক মধুময়ই হোক, কিন্তু তাঁর চারদিকে এ মন্ত্র যে বিষ ছিটাইতেছিল! আর দুটো দিন বাদে এ মধু-বর্ষণ হইলে এ জগতের কি এতই বেশি ক্ষতি হইত?

যেদিন বিহারীর সহিত কথাবার্তা হয়, তার পরদিন কামাখ্যাচরণ বাড়ী ছিলেন না, তৃতীয় দিবসে যথাকালে আবার বিহারী গিয়া তাঁর বিশ্রাম-মন্দিরে দেখা দিল। এ ঘরে এমনভাবে প্রবেশ করিতে মনে এখনও বড় বেশী দৌর্বল্য অনুভূত হয়; চোখে হুহু শব্দে জল আসিতে থাকে, কিন্তু সে ভৃত্য, সে নিরুপায়।

আজ নবীন গৃহস্বামীর ভাবখানা বেশ গম্ভীর গম্ভীর, যেন আমীরেরই মতন! তিনি আপনা হইতেই কথাটা পাড়িলেন; বলিলেন—দেখ বেহারি! তোমায় তাহলে স্পষ্ট করেই বলি, বিয়েটা এখন আর হয়ে কাজ নেই, এই এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপার শেষ করলাম, যতই হোক মানুষের তো ঘাড়, কতই সইবে? অনেকদিন ত গেছে! তা আমাদের কুলীনের ঘরে ওতে কিছু দোষও তো কেউ ধরে না—

বিহারীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে কোনোমতে ধৈর্যসংগ্রহ করিয়া কহিল—তাঁরা আর বিলম্ব করতে রাজী নন; সে কথা ত আপনাকে না-হোক পাঁচ-সাতবারই বলেছি, তা হলে এ সম্বন্ধ ভাঙ্গতেই হয়!

—হয় হলোই! অত টাকা যে কুটুম্বুর মেয়ের বে'তে খরচা করব, সে ত আমার সাধ্যে কুলায় না।

বিহারীর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল। কম্পিতস্বরে সে তৎক্ষণাৎ উচ্চতীব্র-কণ্ঠে কহিয়া ফেলিল—আপনার টাকা! আপনাকে এক পয়সাও কেউ খরচা করতে বলে নি, আমার বাবুর টাকা কিছু কম আছে? সেই টাকায় অপর্ণা দিদির বিয়ে আমি দেবোই!

কামাখ্যাচরণ আজ আর পুরাতন ভৃত্যের এ চোখ রাঙানিতে ভীত নন—তাঁর মন আজ খুব উঁচুস্বরে বাঁধা। তিনি বিহারীর এই সুদৃঢ় উক্তিতে কিছু-মাত্র বিচলিত না হইয়া সম্পূর্ণ শান্তকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন—সে টাকা এখন সবই আমার!

বিহারীর সর্বশরীরে তখন বিষক্রিয়া হইতেছিল। আপাদমস্তক অপমানের আগুনে তখন যেন ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিল। দারুণ ঘৃণায় ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল। অবজ্ঞাপূর্ণ চক্ষে বারেক নূতন-কর্তার বিকার-বর্জিত মুখের দিকে চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল—তা জানি, কিন্তু যাঁর বিষয় ভোগ করবেন, তাঁর ঘরের আইবুড় মেয়ের ভাল বিয়ে দিতেও আপনি বাধ্য!

—সত্যি? আইন ত তা বলে না!

—ধর্ম ত বলেন?

—ধর্ম কাকেও নিজের হক ছাড়তে বলে নি। ধর্ম আমায় যা দিয়েচে আমি তা ভোগ করলে অধর্মটা কিসের?

এইবার বিহারীর জিব শুকাইয়া আসিল। ঠিক! দেশের প্রচলিত আইন, সে আইন এই রকমই বটে! সাধ্যপক্ষে সে কখন অনাথা অসহায়াদের মুখের দিকে তাকায় না। যে দেশে স্ত্রীলোকের স্বাধীন উপার্জনের পথ নাই, স্বাতন্ত্র্য সর্বপ্রকারে বর্জিত; সেখানের আইনে বিধবা, কুমারী, স্বামী-ত্যক্তাগণ কেহ তাঁদের শ্বশুর, পিতা কিম্বা মাতামহ মাতুলের দূর-আত্মীয়ের নিকট মাত্র ভরণ-পোষণের অধিকারিণী, কেহ তাও নয়। যথার্থ উত্তরাধিকারী-বিহীনের একমাত্র দৌহিত্রীও মাতামহের অতুল সম্পত্তির এককণা স্পর্শযোগ্যা নহে। সে অধিকার পাইবে, কে কোথাকার চির-অপরিচিত জ্ঞাতি-সন্তান!

বিহারীর শরীরে মুহূর্তে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল! তার

শরীর যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিল। মাটিতে বসিয়া পড়ো পড়ো হইয়া সে হাতযোড় করিল; বলিল—তবে না হয়, অনাথা বলেই দয়া করুন। এ কথা শুনলে সৌদামিনী মা আর একদণ্ডও বাঁচবেন না! ভগবান আপনাকে যথেষ্ট দিয়েচেন, সামান্য কিছু খরচা করলে মেয়েটার চিরদিনের মত একটা হিল্লে হয়ে যায়। এর ফল আপনার নিশ্চয় ব্যর্থ হয়ে যাবে না।

কামাখ্যাচরণ যে কিছুমাত্র টলেন নাই তা তাঁর হাসির ধরণেই বুঝা গেল। তিনি কর্তার মোটা তাকিয়াটায় আড় হইয়া পড়িয়া হাই তুলিতে তুলিতে হাতে তুড়ি দিয়া কহিলেন—ভগবান আমায় অনেক দিয়েচেন, তা এজন্য বরং তাঁরই সঙ্গে বোঝাপড়া করোগে; আমায় টুকলে কি হবে? আমি অত টাকা খরচ করতে পারব না, এই সোজা কথা। যাও এখন বিরক্ত করো না, একটু আলিস্যি ভেঙ্গে নিই, বেলা গড়িয়ে গেল।

বিহারী যে সেই অপমানিত অভিনয় হইতে কেমন করিয়া নীরবে ফিরিয়াছিল, সে স্মৃতি সুস্পষ্ট নয়! নিজের অবিমৃষ্যকারিতা ও স্থবির প্রভুর অদূরদর্শিতায় গালে মুখে চড়াইয়া ডাক ছাড়িয়া তার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। এত বড় ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটা তাদের একবারও কি মনে হয় নাই! এত বড় মূঢ় সে? সেই ত, তার মূর্খতাই ত, এই কাণ্ডটি ঘটাইল! কেন সে অমন প্রভুকেও না চিনিয়া অহেতুক ভয়ে বেশী পণের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়াছিল? খুঁৎ কাড়িয়া কাড়িয়া একটি সুপাত্রকেও কেন সে স্থ ভাবিতে পারে নাই? কেন সে প্রভুর নিঃসান্দিগ্ধ-চিত্তে একটুমাত্র সন্দেহ প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে দানপত্র লিখিতে বাধ্য করে নাই? কেন সে অনাবশ্যক বাহুচালিত করিয়া কুটুম্ববাড়ী গেল? ওরে বিদ্যাবুদ্ধিহীন মূঢ় বিহারী। তুই-ই এ সমস্তের জন্য দায়ী! এ পাপের কলঙ্ক তুই কেমন করিয়া ধুইবি রে, কেমন করিয়া ধুইবি? একবার সে কামাখ্যাচরণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বুঝি তাঁহার পা ধরিতেও গিয়াছিল, কিন্তু নূতন-কর্তা সে সুযোগ তাহাকে দেন নাই! তিনি উঠিয়া পড়িয়া বাধা দিয়াছিলেন, হাসিয়া বলিয়াছিলেন—আহা হা, বেহারি! আহা কর কি, কর কি? হাজার হোক

আমার চাইতে তুমি বয়সে হয়ত বড়ই হবে, আহা, এত অবুঝ হচ্ছো কেন? বলচি ত, আমি অপর সম্বন্ধ খুঁজে, এখন না হয় এর পরে ওর একটি বে দিয়েই দেব। এখন তুমি যাও। সেই অবধি বকাবকি করে মাথাটা ধরে গেছে।

সৌদামিনীকে এ খবর অবশ্য সহজে বিহারী দিতে পারে নাই, তবুও দু-একদিনের ভিতরই দিতে হইল। কিন্তু সে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, এই আকস্মিক দুঃসংবাদ তাঁহাকে উৎপাটিতমূল আশাতরুর সঙ্গে তেমন শোচনীয় অবস্থাপন্ন করিয়া ফেলিল না। কেবলমাত্র মৃদুতর স্বরে উচ্চারণ করিলেন— এ আমি জানতাম!

তাঁহার ধৈর্য দেখিয়া বিহারীর মনেও আবার কিছু সাহস দেখা দিল। সে একবার চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া কুণ্ঠিতভাবে প্রস্তাব করিল—গিন্নীকে একবার বলে দেখলে হয় না, মা! যতই হোক মেয়েমানুষের মন, হয়তো প্রত্যবায়ের কিছু ভয় রাখেন।

সৌদামিনীর শীর্ণ অধরে অস্পষ্ট হাস্যচিহ্ন কান্নার চেয়েও ম্লান দেখাইল— ওইটুকুই এ জন্মে বাকি ছিল, বেহারি মামা! আচ্ছা তোমার ঘাড়ের বোঝার জন্য তাও না হয় এবার আর বাকি রেখে যাবো না। তবে ফল হবে না তাতে, এ তুমি জেনে রেখো।

যথার্থই আজ সেই সৌদামিনী আপনার মুখে নিজের দরখাস্ত গৃহিণীর দরবারে পেশ করিলেন। মিনতির সুরেই বলিলেন, ভিক্ষুকেরই সে বিনয়-বিনত কণ্ঠ—তুমি ত মেয়েমানুষ, বোঝ ত সবই বউ, এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেলে ওর আর বিয়ে হওয়া ভার হবে। ভাল ঘর, সৎ পাত্র, থাঁইও হিসাবমত ধরলে খুব বেশি নয়, দেখ্ ভাই, কর্তব্য ভেবে না হয়, দুঃখী বলেই না হয় ভগ্নিটিকে পার করে দাও। ছোটর আশীর্বাদও বড়কে ফলে। তোমার সন্তানেরা এর ফলে চিরসুখী হবে, আমি এই মরতে বসে একথা তোমায় প্রাণের সঙ্গে বলচি।

যোলগণ্ডা পয়সায় একটা টাকা হয়, এই কথাটা ক্ষ্যান্তমণির জানা ছিল।

সেই টাকার কতটি গণ্ডায় যে হাজার—তিন চার হাজার হওয়া সম্ভব, সে বিষয়ে তিনি কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারেন নাই ; বুঝিয়াছেন, সে অনেক টাকা ! কিন্তু নিজের কানে শোনা তোষামোদের মিষ্ট কথায় মনটা তাঁর হঠাৎ সেই চোখে না দেখা টাকার মায়া ভুলিয়া তাহাতে রাজী হইয়া আসিতেছিল, যদি সেই সময় নিজের স্বার্থ চিন্তাটা খপ করিয়া মনে পড়িয়া না যাইত হয়তো বা সৌদামিনীকে প্রতিশ্রুতিই দিয়া ফেলিতেন।

হাঁড়ির মত ভারীমুখ যথাসাধ্য প্রসন্ন করিয়া আশ্বাসের স্বরে কহিলেন—তা ভাই ঠাকুরঝি ! তুমি বিয়ে ভাঙ্গার জন্য অত ভাবনা করচো কেন ? আমি বেঁচে থাকতে ভাই, তোমার মেয়ে কি আর থুবড়ো থাকবে ? আমি ওর জন্যে ভাল পাত্তর ভাই, আগে থেকেই ঠিক করে রেখেচি। চাও ত ঐদিনেই ওদের চারচক্ষু মিলন করিয়ে দিতে পারি, তার আর কি ?

সৌদামিনীর মনটা জ্বলিয়া উঠিতেছিল ; তীক্ষ্ণ আর্তস্বরে ডাকিলেন—বউ !

—আমার মেজ ভাই কেষ্টধনের বউ এই ভাদ্দরমাসে মরেছে। আমাদের ওখানে বলে ভাদুরে মড়ার গতি নেই, সে মরে উপদেবতা হয়েচে কি না, গাঁয়ে কেউ আর সেই ভয়ে ওকে মেয়ে দিতে রাজী হয় নি। তাতে করে এতদিন তার ঘর শূন্যি রয়ে গিয়েছে। তা ভাই, তোমার মেয়ে যা ষেটের ডাগরটি হয়েচে, তা তাকেই মানায়। এ বছরের বন্যায় ওদের ঘরদুয়োর সবই ত ভাসিয়ে নেছে, এখন পড়শী বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে মা আর তার ছেলেরা আছে কিনা, আমি পত্তর দিয়েছি, কাল পরশুই ওরা আসচে। কেষ্টধনও এসে পৌছুবে—দেখবে কেমন মরদের মত চেহারা।

সৌদামিনীর মাথায় যেন বাজ পড়িল। সমস্ত সংসার তাঁর চক্ষে ঝাপ্সা কালিঘোঁটা হইয়া আসিতেছিল, কষ্টে কহিলেন—আশীর্বাদ হয়ে গেছে বউ এ সম্বন্ধ ভাঙ্গলে লজ্জা অপযশের সীমা থাকবে না। দয়া করো, দয়া চাইচি,—যোড় হাতে ভিক্ষে চাইচি, দুঃখিনীর মুখ চাও, তোমার অনেক হয়েচে, সামান্য কিছু—

—দেখ ভাই, ঠাকুরঝি ! তুমি ভাই, এমন করে আমায় যখন তখন

'অনেক হওয়ার' খোঁটা দিও না, দিলে তোমার ভাল হবে না ভাই। জানি, জানি, আমাদের হিংসেয় বুক তোমার আথার মত জ্বলে যাচ্ছে। তা কি করবে বলো? তোমার আর জন্মের তপিস্থে নেই; আমার আছে, সে তুমি হিংসে কল্লেই বদলাতে পারবে? কেন? আমার ভাই এতই মন্দ না কি? তোমার মেয়ের বর জুটচে না দেখে তাই আমার বলা। তা ভাই, তোমার যা ভাল মনে হয় কর, আমার তাতে কি? আমার কালিন্দি, আন্দি, বিন্দি রয়েচে, তোমার মেয়ের বে'তে আমি অত টাকা দেব কিসের জন্যে ভাই? তা আমি দিতে পারবো না। এই তোমাদেরই যে খেতে পরতে দিচ্চি, বাড়ীতে রেখেচি, এইতেই আমাদের কত খরচ পড়ে যাচ্চে, ভেবে দেখ দেখি এর ওপোরে তোমার অত আব্দার ধম্মে সয় না।

দাদাবাবু! দাদাবাবু! সত্যসত্যই এবার দামিনীকে তুমি জব্দই করিয়াছ! একটা ভারি জিনিষের পতনশব্দে সহসা চমকিত চিত্ত অপর্ণা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল, মা তার মাটিতে সংজ্ঞাহীনা পড়িয়া; মুখের কাছে রক্তের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

২৭

মানুষের মনকে যতখানি ভঙ্গপ্রবণ মনে হয় আসলে তা নয়! ক্ষুদ্র মানব-জীবন যাহা সহ্য করিতে পারে অপর কোন প্রাণী পারে না।

ধীরার সেই যে দিন কাটিয়াছে, তার পরও সে বাঁচিয়া রহিল। মানুষের মনের অবস্থার সহিত যদি সময়ের গতির কিছুমাত্র বাধ্যবাধকতা থাকিত, হয় ত মধ্যে মধ্যে তাহাকে অচল করিত। যেহেতু তা নাই; তাই সে সকলের সকল দুঃখ সুখ উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া যায়, কার জন্যই মুহূর্ত মাত্র দেরী করে না। ধীরারও দিন কাটিতে ছিল।

কাজকর্মের ঝঞ্ঝাট কমিতেই নির্মলের মনের অশান্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সে মিথ্যাবাদী। হেয় বিশ্বাসঘাতক সে? অর্থলালসায়, প্রতিষ্ঠার লোভে

প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়াছে! সে কি এ অপবাদ অস্বীকার করিতে পারে? প্রতিজ্ঞার চেয়েও যদি বড় কিছু থাকে, সেদিনের সেই প্রতিশ্রুতির অর্ধোক্তি, তদপেক্ষাও যে অধিকতর ছিল। নিজের মনের কাছে এবং মনুষ্যত্বের নিকটে তার অপরাধের পরিমাণ কতখানি বলা দুষ্কর, কিন্তু তাঁদের কাছে সে অমানুষিক অপরাধে অপরাধী।

দুঃখে মানুষ বুক ফাটিয়া মরে না, তাই নয়; দুঃখকে সে জয়ও করে। মানুষকে যিনি দুঃখ দেন তিনিই প্রতিকারের উপায় করিয়া রাখেন। শুধু যদি ঐশ্বর্যস্রোতে অবগাহিত থাকিয়া এই অপ্রতিবিধেয় লজ্জাধিক্কারে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে পাইত হয়ত ইহার ক্লান্তিকর সংস্পর্শে সে ভাঙ্গিয়া পড়িত। অংশী হিসাবে এবং কার্যাধ্যক্ষরূপে কারবারের অনেক দায়িত্ব যাচিয়া লইয়া আপনাকে তাহাতে সে মগ্ন রাখিল। অবসর পাইলেই শতযোজন দূরবর্তী এক নিভৃত পল্লীদৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। এতদিন বড় আপনার বোধে যে মুখ বুকের ভিতর আঁকিয়া রাখিয়াছিল, সে মুখ দেখিয়া সুখ পাইবার আর উপায় নাই, সে এখন অনধিকার প্রবেশকারিণী, তার কথা মনে করা এখন নির্মলের পক্ষে অপরাধ।

শুধু যদি অপর্ণাকে হারানই এ ক্ষতির একমাত্র ফল হইত, হয়ত নির্মলের পক্ষে এত অসহ্য হইত না। অপর্ণাকে সে নভেল পড়িয়া খেয়ালের বশে ভালবাসে নাই। যদি অপর্ণার মা তার কাছে অপর্ণার বিবাহের হাল ছাড়া—'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র' ইত্যাদি গোছের ঐ অভিব্যক্তিটা বারম্বার না করিতেন হয় ত কস্মিনকালেও অপর্ণাকে বিবাহ করিবার কথা তার মনে স্থান পাইত না, কিন্তু, যখন বিপন্নদের প্রতি বড় দয়া করিতে গিয়া সে নিজেকে তাঁদের হাতে সঁপিয়া দিল, তখন হইতেই এই দয়ার কেন্দ্রটিকে শুধু কৃপার চক্ষে দেখা আর সম্ভবপর হয় নাই। যদি আজ অপর্ণার পক্ষ হইতে কোন শুভ ঘটনা ঘটিয়া এ বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইত তাহাতে হয়ত মনে তার এতটা ঘা দিতে পারিত না। শুধু তার পক্ষ হইতে অপর্ণাকে সে ত্যাগ করিল, তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনে তার সম্বন্ধে যে কিছু সম্মান ও স্নেহ সে সমস্তই নিঃশেষে মুছিয়া গেল—না,

বুঝি তাও নয়, মুছিলে তো ভাল ছিল, বড় ঘৃণ্যরূপে জাগিয়া রহিল, তার সবচেয়ে শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্রীদের মধ্যে চিরদিনের মতই জাগিয়া রহিল, সে নাম বিশ্বাসঘাতক বলিয়া!

ভগিনীপতির উপর ব্রজর বিদ্বেষের বিষ ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। সে তার অযথা ভাগীদার হইয়া বসিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্মল তার সমকক্ষ হইয়া উঠিল না, যেমন বিনীত কর্মচারী ছিল, জামাতা ও অংশীদার হইয়াও তাহাই রহিল। ব্রজ তার উপর কাঁহাতক আর একা একাই রাগ করিবে? বুঝি আরও একটা কারণ ছিল! এথেল সুপুরুষ ও অল্পবয়সী নির্মলকে সুনজরে দেখিতেছে বোধে নির্মলের প্রতি তার যে ঈর্ষা জন্মিয়াছিল, এথেলের স্বজাতি-বিবাহে মনের সে দ্বন্দ্ব কাটিয়াছে। ইহার পর নির্মল যখন তাহাকে বৈষয়িক বা সাংসারিক বিষয়ে না টানিয়া নিজেই সমস্ত দায়িত্বভার তুলিয়া লইল, তখন তার উপর খুশী না হইয়া করে কি! সে তখন স্বচ্ছন্দ ও সানন্দ চিত্তে বিখ্যাতা সুন্দরী বর্মী-বন্ধু মাপোর সহিত ইচ্ছাসুখে বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। এথেলের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া এই সৌন্দর্যখ্যাতিসম্পন্না বর্মী-যুবতীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিয়া সে এথেলকে অবজ্ঞা দেখাইতে চাহিয়াছিল, এখন নাকি তাহাকেই ঘরণী করিতে মনস্থ করিয়াছে, এইরূপ গুজব!

ধীরা অন্ধ! অন্ধ ঠিক এ পৃথিবীর জীব নয়! সে যেখানে থাকে, চতুর্দিকে তার অন্তরের নিবিড় ছায়া ফেলিয়া শান্ত, গম্ভীর একটি ধ্যানলোকের সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে নিজেকে আবৃত রাখে। পৃথিবীর মানুষ তার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিতে পারে; কিন্তু এই অভেদ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। নির্মল এই নিরুদ্ধ হৃদয়দ্বারের বাহিরে সসঙ্কোচে দাড়াইয়া রহিল, প্রবেশের পথ পাইল না। ইহাকে বঞ্চনা করার অভিসন্ধি আদৌ তার ছিল না, বরং দিতেই আসিয়াছিল এবং দেওয়ার সুযোগ না পাইয়া মনে মনে উদ্বিগ্নও হইতেছে; কিন্তু কেমন করিয়া কোন পথে দিবে, ধরিতে পারিতেছিল না। নির্মলদের এই বিবাহে তাদের মধ্যে যেন একটা পূজ্য-পূজক ভাবটাই আনিয়া দিয়াছে। প্রতিমার মত ভাবশূন্যা পত্নীটিকে সে দেবীর আসন দিয়াছে; কিন্তু উপাসনা বাদ্যভাণ্ডে

ষোড়শোপচারে না করিয়া মানস পূজা সাত্ত্বিক ভাবেই করিতে লাগিল। কাজেই সেটা সে নিজে ভিন্ন অপরে জানিল না। নির্ম্মল তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তার অন্ধত্বে দয়া করিয়া নয়; তার এই সত্যকার দেবীর মত প্রশান্ত মুখ অসীম ধৈর্য-মমতাময় চিত্ত, সবই সে দেখিয়াছিল। দেখিয়াছিল, এবং দেখিয়া বুঝিয়াছিল। তাই শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসায় হৃদয় তার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিঃস্বার্থ ভক্তি অবদানের ভারে আপনাকে সে তার কাছে নত করিয়া দিয়াছে সে প্রেম মন্দাকিনীর ন্যায় আপনার গতিপথে নিয়ত-প্রবাহে বহিয়া যায়, বর্ষা-উচ্ছ্বসিত নদীর বন্যাপ্লাবনের ন্যায় চারিধারকে প্লাবিত করে না। ভালবাসার অভাব ছিল না; অভাব ছিল আত্ম সুখেচ্ছার, অভাব ছিল কামনার তীব্র-তরঙ্গের। ইহা সখী সঙ্গিনী গৃহিণীর প্রতি স্বপ্নপূর্ণ প্রণয় উচ্ছ্বাস নয়, প্রিয়-শিষ্যার স্নেহ-পাত্রীর প্রতি স্নিগ্ধ পবিত্র প্রেম; মানবীয় নয়, স্বর্গীয়।

নির্ম্মলের যদি দোষ না থাকে, ধীরাকেই বা দোষী করিলে চলিবে কেন? সে স্বামীকে চোখে দেখে নাই, স্পর্শ পায় নাই, কানে শুধু তাঁর দু-চারটি সুমিষ্ট সংযত বাক্য শুনিয়াছে সহৃদয়তার উত্তাপবিহীন সহানুভূতি, পিতার ভৃত্য পাঁচকড়ি অথবা দাসী ক্ষমার মাও যেটুকু দিতে পারে—সেইটুকুই সে পাইয়াছিল। হইতে পারে তাঁর মনে তার জন্য বিশুদ্ধ প্রেমের মন্দার প্রস্ফুটিত আছে, কিন্তু মানুষ যে পৃথিবীর জীব! সে স্বর্গের পারিজাত অপেক্ষা মর্ত্ত্যের ধূলিকণাকেই বুঝি বেশী ভালবাসে, স্বর্গীয়রা ত দেবভাগ্য, মানুষেরা নয়।

২৮

একটা ঝড় বৃষ্টির অপরাহ্নে ধীরা জানালার নিকট বসিয়া ছিল। নীচের পুষ্পোদ্যানে সদ্য-ফোটা সুগন্ধি কুসুমের দল বিকশিত অর্দ্ধবিকশিত নেত্রে চাহিয়া যেন তাদের মত আর একখানা মুখ খুঁজিতেছিল, নাকি? সূর্যাস্তের বিচিত্রবর্ণ-রঞ্জিত আকাশে গোধূলির উৎসব নিশান আকস্মিক মেঘে ঘেরিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া উড়ন্ত পাখীর দল ত্রস্তপক্ষে নিম্নাভিমুখী হইতেছে।

বাতাসের আর্দ্রতায় বুঝিল—বৃষ্টি আসিয়াছে ; গাছেরা সর-সর-সর শব্দে বৃষ্টিকে নিমন্ত্রণ করিতেছে—ঝর্‌ঝর্‌ ঝপ্‌ঝপ্‌ করিয়া অভ্যাগতও আহ্বানকারীদের স্বাগত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরও প্রদান করিল, তারপর ক্রমেই উভয়ের আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল। কথায় কথায় তর্ক কোলাহলও বুঝি উঠিল, ক্রমে দর্শকদল হইতে প্রবল করতালি ধ্বনির ন্যায় হুহু-শব্দে ঝড় এবং পরিতুষ্ট দর্শকসমূহের মুখ-নিঃসৃত জয়ধ্বনিবৎ মুহুর্মুহু মেঘগর্জনে আসর বেশ জমকাইয়া উঠিল। ধীরা সেই ঐক্যতান শুনিতেছিল, সহসা স্মৃতির ব্যথায় তার আলোড়িত হইতে আরম্ভ করায় সে দুখানি হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। আজ এই মেঘফাটা জলের সঙ্গে সঙ্গে ডাক ছাড়িয়া বড় যে কাঁদিতে সাধ যাইতেছে—জীবনে তেমন করিয়া কাঁদিবারও তো সে অবসর পায় নাই! আবদারের বয়সে আবদার করিবার প্রয়োজন ছিল না, অযাচিতভাবে সবই পাইয়াছে, তা ভিন্ন, কিসেরই বা আবদার করিবে? সে তো পৃথিবীকে দেখে নাই! ইহাতে কি আছে? কি সে পায় নাই, সেও যে তার অজ্ঞাত! তারপর? অশ্রুবিন্দু-পরিশূন্য গভীর শোকে বুক তার মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জন করিবার সাথী না থাকিলে কি কান্না আসে? বুকের মধ্যে পাথর হইয়া ও চোখের ভিতর আগুন হইয়া জলের ধারা যে শুকাইয়া যায়। আজ প্রকৃতি নিজে ঐ অমন করিয়া কাঁদিতেছে—আজ সেই বরফ-জমা প্রাণের ক্রন্দন যেন তাঁর বিলাপ মূর্ছনায় গলিয়া গলিয়া একটা বিপুল বন্যা-জলের সৃষ্টি করিতেছিল। বাবা-গো বাবা-গো বলিয়া ডাক ছাড়িয়া বড় কান্না কাঁদিতে পারিলে হয়ত এই অহর্নিশি পাষাণভারে ভারাক্রান্ত প্রাণ কতকটা শান্ত হইতে পারিত নাকি? কড় কড় শব্দে চরাচর বিকম্পিত করিয়া উচ্চশীর্ষ নারিকেল বৃক্ষের মাথায় বাজ পড়িল। সেই শব্দে আকস্মিক ভয়ের তাড়নায় ধীরা চমকিয়া দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল। ভয়দুঃখের একমাত্র আশ্রয়স্থলকে সভয়ে আহ্বান করিতে গিয়া স্মরণ হইল, আজ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সর্বদুঃখহরা বক্ষে গ্রহণ করিবার জন্য আশ্রয়স্বরূপ পিতা তার পাশের ঘরে বর্তমান নাই। উঃ তবু সে বাঁচিয়া আছে!

ক্ষমার-মা ছুটিয়া আসিল।—দিদিমণি ওমা, তুমি একাটি রয়েচ! জামাই বাবু যে এই ঝড়ের আগেই কোথায় বেরিয়ে গেলেন। ভয় পেয়েছ বুঝি? পোড়ার দশা আমার! বামুনটা যে সং, না দেখিয়ে দিলে কিছু পারে না।

নির্মল যে আজ বহুক্ষণ আসে নাই, সে কথা ধীরার মনেও ছিল না। নিজের দুঃখভারে অন্যের কথা তবে মনে থাকে না। ক্ষমার মা কাছে বসিয়া তাহাকে পাঁচকথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! সে যে এই বজ্রপাতে ভীত হইয়াছে, তাহা তার মুখেই লেখা ছিল। সে নিজের অতীত জীবনের কাহিনী আনিয়া এমন আকস্মিক বৃষ্টির দিনে 'তার মিনষে' যখন ভিজা বলদ সঙ্গে ভিজিতে ভিজিতে ঘরে ফিরিত—সেই গল্প আরম্ভ করিল। তাড়াতাড়ি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিয়া সে নিজের হাতে তামাক ছিলিমটি সাজাইয়া যখন তাহাতে ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে কাছে আসিত, আহা! তখন কি আহ্লাদেই যে ক্ষমার বাবার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করিত, সে কথা বলিতে আজও প্রৌঢ়া ক্ষমার মার চোখে জল আসে। সে একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিল—মিনষে বড্ড ভাল ছিল গো, দিদিমণি! এত আদর ভদ্দরলোকেও করতে পারবেক নি, এমনি যত্ন ছেদ্দা আমায় করতো। মুড়কির মো একটি পেলে আধখানি আমায় না খাইয়ে নিজের ব্যাতে দিত নি।

ধীরা চোখের জল দেখিতে পায় না—সে নিঃশ্বাস শুনিল। শব্দের বিভিন্ন রূপ তার কাছে বড় সত্য! সেই অকৃত্রিম ব্যথিত নিঃশ্বাস সে চিনিয়াছিল, তাই সেই সঙ্গে নিজের অজস্র জমা করা রুদ্ধশ্বাসের একটি উহাতে মিলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোর কি বাবা ছিল না, ক্ষমার মা? তাঁর কথা তো তুই বলিস না?

ক্ষমার মা হাসিয়া কহিল—ও মা! বাবা আবার কার না থাকে গো? তা দিদি, তিন বছর বয়সে ওনার ঘরে এসেছিলুম, পৌনে আঠার গণ্ডা টাকা দিয়ে ও আমায় বে করে আনে। আর ত কখন বাপ-মায়ের ঘরমুখো হই নি তাদেরকে আমি দুষি নে, ওরা দুঃখী মানুষ—কোথা থেকে দূরের পথে মেয়ে আনবে, নেবে,—তাই বলো? তা আমাদের তেনার যত্নে সে দুঃখ আমার ছেলো না ভাই।

ধীরা বিস্মিত হইল, বিস্ময়ের বেগেই প্রশ্ন করিল—বৌরাও তাদের বরদের ভালবাসে? সব্বাই বাসে?

—তা বাস্‌বেক নি, কি যে বলো দিদিমণি! তোমাদের ভদ্দর নোকের কথা ছেড়েই দ্যাও, এই সেদিন অবদি তো তেনারা সমরণে মরে সতীই হতেন, আমাদের ছোট নোকের ঘরেই হাজারের মধ্যে যদি কদাচ একজন না বাসে গো, সে আমি জানি নি বাপু! নৈলে ত সব্বাই বাসে। সোয়ামি নাকি সব দেবতার বড়ো দেবতা! তোমার মা বলতো, তাই শুনেছি দিদি। নৈলে কার কাছে এসব শাস্তর কথা শুনবো বলো?

—আচ্ছা বাপের মত কি অত বেশি আর কাকেও ভালবাসা যায়? উহুঁ! তা বোধ হয় যায় না, না?

—তা যাবে না কেন, যায়। এই তোমার দেখ গে, বাপ মা ভাই স্বোয়ামী সন্তান এ সবই এক।

—সন্তান কিরে? ছেলে?

—হ্যাঁ এই ছেলেমেয়ে। দেখ নি, বাবু তোমায় কি ভালটাই না বাসতো!

ধীরার চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। সে কতক্ষণ পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বড় মৃদুস্বরে কহিল—দেখেচি, কিন্তু স্বামী—

ক্ষমার মা তাহাকে বহুকাল পরে এমন করিয়া কহিতে দেখিয়া খুসী হইয়াছিল, জোর দিয়া বলিল—স্বোয়ামী কারু চাইতে তুচ্ছ নয় দিদিমণি! দেশে থাকতে দক্ষিযজ্ঞের পালা গান শুনেছিনু, স্বোয়ামীর নিন্দে শুনে দক্ষরাজার কন্নে সতী নিজের প্রাণটাই দিল।—আর ঐ বন্নু তো—তা নৈলে আর বামুনের বিধবারা হাসতে হাসতে মরা সোয়ামীর চরণ ধরে চিতেয় পুড়ে মরতে পারে?

ধীরার আজ এ আলোচনা কে জানে কেন ভাল লাগিতেছিল। এসব তার জানা জিনিষ নয়। তা ভিন্ন হয়ত এর ভিতর আরও কিছু—তাহার অজ্ঞাত কারণ থাকিতে পারে, যাহাতে স্বামী-সম্বন্ধীয় এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে

তাহাকে উৎসুক করিয়াছে। সে ক্ষমার মার কাছে একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—আচ্ছা সব্বার স্বামীই কি স্ত্রীকে ভালবাসে?

ক্ষমার মা একটু রসিকতা করিল, বলল—বাসে না বাসে জামাইবাবুরে দেখে জানতে পারচোনি?

—আমি কি দেখতে পাই রে?—এমন সরল কণ্ঠে অন্ধ বালিকা এই কথা উচ্চারণ করিল যে, স্নেহময়ী প্রৌঢ়া ইহার মধ্যস্থ তিরস্কার-প্রচ্ছন্ন ব্যথিত স্বরে বিষম অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ধীরা সহসা কহিয়া উঠিল—তুই দক্ষরাজার মেয়ে সতীর গল্পটা আমায় বলবি?

ক্ষমার মার গল্প যখন শেষ হইয়া গেল, তখন বৃষ্টির শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, মাত্র ঝড়ো হাওয়া গাছপালার গাত্রবসন এলোমেলো করিয়া তাদের সলজ্জ তিরস্কার লাভ করিতেছিল। ধীরা একাগ্রচিত্তে সেই মর্ম্মস্পর্শী সতী-লীলা শ্রবণ করিতেছিল, দাসী কথাশেষে নীরব হইলে সম্বিৎ ফিরিল! চোখ মুছিয়া সে কহিয়া উঠিল—ঐ রকম আর কোন গল্প বল না ভাই, ক্ষমার মা।—

—আচ্ছা, রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলবখন। এখন রান্নাঘরে দেখে আসি কতদূর কি হলো! জামাইবাবু এখনও এলো নি? যাই, দেখি গিয়ে-কি করচে। তাকেই পাঠিয়ে দেই।

এমন সময় বাহির হইতে পাঁচু ডাকিল—মাসি! শোন গা!

ক্ষমার মা বাহিরে আসিলে, বলিল—বড্ড বিপদ হয়ে গেছে মাসি! জামাই বাবু ঝড় জলে গাড়ী উল্টে কোথায় বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন, রাস্তার মানুষরা চিনতে পেরে পাল্কি করে বাড়ী এনেচে। ডাক্তার এয়েচে। ভাঁড়ারের চাবিটা খুলবে চল, একটা ইয়ে চাই—

—সে কি কথা রে! ওমা এ আবার কি হলো!

—শীগগির এসো, গরমজল চড়াতে হবে—

ক্ষমার মা অগ্রসর হইতেই ধীরা দ্রুতপদে আসিয়া তাহার গতিরোধ করিল; কাতর কণ্ঠে কহিল—আমায় নিয়ে চল ক্ষমার মা! আমিও যাবো।

—তুমি থাম দিদি। এখন তোমায় কোথায় নিয়ে যাবো? এসে তখন—

ধীরা হাতখানা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে কহিল—এই না তুই বললি, সতী স্বামীর নিন্দায় প্রাণত্যাগ করেছিলেন? আমি যাবোই যাবো—আমিও ওঁকে খুব ভালবাসবো—আমার যে আর কেউ নেই।

২৯

তথাকথিত কালের মধ্যেই মা এবং তাঁর ছেলেরা আসিয়া পৌঁছিলেন। খিড়কির দ্বারে গরুর গাড়ী থামিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রীতে কিছু কথাবার্তা বলাবলি হইয়া গেল, তারপর নূতন গৃহিণী নিজের মতই গাল ভারি ভারি ঘনশ্যামাঙ্গী একটি বিধবা বোন ও ইহারই অপরিণত সংস্করণ একটি বালিকা ভ্রাতুষ্কন্যা সমভিব্যাহারে সরাসরি উপরতলায় উঠিয়া গেলেন। তিনি আজকাল বড় একটা নীচের মাটি মাড়ান না।

গিন্নির মা, গৃহবাসী সাধারণের দিদিমা—পতিতপাবনী ঠাকুরাণী কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া ঘরদ্বার সমস্ত চক্ষের নিমেষে দেখিয়া লইলেন। —ওলো, এ কোণে এত আনাজপাতি কে রাখলে লো। ওমা, ওই মাচান বেয়ে কেমন ফুঁই ফুঁয়ে নাউডগাটি উঠেচে দেখ একবার!...কাপড়গুলো জড় করে রেখেচিস কেন্ লা, বিন্দি। -মেলে দেনা,—শুকিয়ে যাক।--অধর্মের ভোগ আর কি।—ইত্যাকার নানাবিধ রবে মুহূর্তকাল মধ্যে এই অপরিচিত গৃহস্থালীর সঙ্গে চিরপরিচয়ের সখ্য সংস্থাপন করিয়া ফেলিলেন।

রান্নাঘরের দ্বারে দর্শন দিতেই অপর্ণা একপিঠ ভাজা বড়িগুলা উল্টাইয়া দিতে দিতে সকৌতূহলে মুখ ফিরাইয়া আগন্তুকাকে দেখিল। কদিন ধরিয়া মন তার অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া আছে, নতুবা যে রকম ডাক-হাঁকের সাড়া উঠিয়াছিল, এতক্ষণ কোন্ কালেই সে রান্না ফেলিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইত। তাহার এই না যাওয়ার বৈরাগ্যের মধ্যে মায়ের অত্যন্ত ব্যারাম বৃদ্ধি ছাড়া আরও কিছু অবান্তর কারণও ছিল। এই প্রবীণা আগন্তুকাটিই নাকি আপাততঃ তার ভবিষ্যৎ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পদাভিষিক্তা হইবার বন্দোবস্তে

আছেন,—এই সংবাদ সেও পাইয়াছিল এবং সংবাদে চিত্ত তার ভাবী পুত্রবধূর উপযুক্তরূপে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠে নাই।

পতিতপাবনী দ্বারে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রন্ধন সামগ্রীর সহিত রন্ধন-কারিণীর অপাদমস্তক খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিলেন। তাঁহার দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইল তিনি দেখিবার জিনিস যাহা কিছু এ ঘরে দেখিলেন, এমন বোধ করি আর কখন দেখেন নাই!

সে চাহনি দেখিয়া অপর্ণার হাসি পাইয়াছিল, রাগও যে না ধরিয়াছিল তাও নয়, সে মুখ ফিরাইয়া যথাকার্যে মন দিল; নষ্ট করিবার মত সময় তার নাই। দায়ে পড়িয়াই তাহাকে রাঁধিতে আসিতে হয়; নহিলে মায়ের এ অবস্থায় একদণ্ডের জন্য তাঁর কাছ ছাড়া হইতে মন সরে না। বিহারী অবশ্য তার বাড়া করিয়াই সেবা করে কিন্তু মা যে তাঁর চিরদিনের দেনা মিটাইবার বন্দোবস্তে রহিয়াছেন সে কথা তো তার কাছে উহ্য নাই।

দ্রষ্টব্য বস্তুকে ফিরিতে দেখিয়া পতিতপাবনীর হুঁশ হইল। সরিয়া আসিয়া চৌকাঠের মধ্যে এক পা এবং বাহিরে এক পা দিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন—হ্যাগা মেয়ে তুমিই বুঝি আমার ক্ষেস্তির ভাগ্নি? ছিরিখানি তো তোমার মন্দ না! বয়েস অব্বিশ্যি যথেষ্ট হয়েচে, তা হোক্ গে, আমার কেষ্টার সঙ্গে তাতেও মানাবে, সোমত্ত ছেলে সোমত্ত মেয়ে নইলে মানাবেই বা কেন? কি রাঁদ্‌চো গা? মেলাই যে বেন্নুনপাতি বানিয়েছ দেখচি!

অপর্ণা মুখ না ফিরাইয়াই রন্ধনের সংক্ষিপ্ত তালিকা দাখিল করিল। ইঁহার সমর্থ ছেলের খবরে তার সর্বশরীর তখন রাগে জ্বলিতেছিল, মুখের দিকে চাহিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাঁধুনীর শুধু রাঁধিয়া দিলেই কাজ শেষ হয় না। বাড়ীর ছোট বড় মেজ সেজ সবগুলিকে না খাওয়াইয়া নিস্তার নাই! রন্ধনশেষে কালিন্দীকে ডাকিয়া সকলকে ভাত খাইবার জন্য জড় হইতে আদেশ দিয়া, ত্বরিতপদে মায়ের ঘরে ছুটিয়া গেল। সৌদামিনী সেদিন আরও একটু মুষড়িয়া পড়িয়াছেন। জ্বর ত বাড়িয়াছেই, যন্ত্রণাও বড় বেশী।

মেয়েকে দেখিয়া করুণদৃষ্টিতে তার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাহিলেন। বুকে আর দীর্ঘশ্বাসের ভার সহ্য হয় না। অকস্মাৎ দম বন্ধ হইয়া আসে, সেই রকমটা একবার হইয়া কিছু পরে সেটা সাম্‌লাইয়া গেল। অপর্ণা খলে বসন্তমালতী বটিকা মর্দনে নিবিষ্টচিত্ত বিহারীকে জিজ্ঞাসা করিল—মাকে দুধসাবু খাওয়ান হয়েছে?

—হ্যাঁ ভাই, হয়েছে; আজ সবটুকুই খেয়েছেন।—বলিয়া বিহারী আনন্দ প্রকাশ করিবার বৃথা চেষ্টা করিলে অপর্ণা তার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া রহিল। সে যেন এখনি কাহার নিকট বেদম মার খাইয়া আধমরা হইয়া ফিরিয়াছে! মুখখানা কষ্টে, অনুশোচনায়, গ্লানিতে ও ব্যথায় কি যেন এক-রকম হইয়া গিয়াছিল। অপর্ণা সমস্ত বুঝিয়াই নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিল।

রান্নাঘরের দরজায় একটা কলরব শোনা যাইতেছে। ছেলে-পিলেদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। নূতন কর্তা প্রথম আসিয়া কিছুদিন সকাল সকাল এক এক পাথর ভাত ব্যঞ্জন হাঁস হাঁস করিয়া গিলিয়াছিলেন কিন্তু কদিন ভাল মন্দ খাইয়া খাইয়া এখন আর পূর্বের সেই বুভুক্ষিত ক্ষুধাটা নাই। প্রতিবেশী সমাবস্থগণের দেখিয়া শুনিয়া তিনি এখন আহারের সময় ও পরিমাণ দুই-ই বদলাইয়াছেন। আজকাল খাইতে আসিতে তাঁর যথেষ্ট বিলম্ব হয়। পল্লীগ্রামে অত্যন্ত ধনী ব্যতীত অপর গৃহস্থদের গৃহে খানসামা চাকর থাকে না, বাড়ীতে প্রায় সকলেরই জমাজমির কাজের জন্য দু-দশজন 'মুনীষ' প্রতিপালিত হয়, বিশেষ আবশ্যকীয় কাজ তারাই করে। কামাখ্যাচরণ একদিন জমিদারবাবুদের বাড়ী হইতে দেখিয়া আসিয়া একজন 'জন'কে তাঁর হাত পা টিপিয়া তৈল মর্দনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে দু ঘণ্টা ধরিয়া নিজের হাতের সমস্ত জোর দিয়া উত্তমরূপে ডলিয়া দিলে তারপর স্নান ও তৎপরে আহার করেন। কাজেই হাঁড়ি লইয়া অপর্ণাকে আটকাইয়া থাকিতে হয়। আজ তার এ অনর্থক বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না; কালিন্দীকে ডাকিয়া সে বলিল—সবাইকে একটু শীঘ্র শীঘ্র খেয়ে নিতে বলো, আমি আর বসে থাকতে পারি নে।

কালিন্দীও বেশ তৈরী মেয়ে—বসে থাকতে না পার ত শুয়ে থাক না,

বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, অপর্ণা ধমকাইয়া উঠিল—খবরদার! মুখের উপর জবাব দিবি ত দেখবি! যা বলছি, শীগ্‌গির—

কড়া ব্যবহার বিনয়ের জন্মদাতা,—যাচ্চি, যাচ্চি—বলিয়া থতমত খাইয়া সে চলিয়া গেল।

একটু পরেই মুখ অপ্রসন্ন করিয়া গৃহিনী আসিয়া বলিলেন—কেন গো, আজ এত জোর তলব কেন? বলি, ভাইবোনগুলো এয়েছে, দুটো না হয় দুঃখের সুখের কথাই কইচি, তাও তোমাদের বুকশূল হলো!

অপর্ণা ঘোর বিরক্তিভরে উত্তর দিল—আপনাকে ত আমি ডাকি নি! বাবুদের খেয়ে নেবার জন্যেই বলেচি! মায়ের আজ অসুখ বেড়েচে, আমি সারাদিন ভাত আগলে বসে থাকি কেমন করে?

ক্ষেন্তমণি মুখ ঘুরাইয়া উত্তর করিলেন—তোমার মায়ের এখন নিত্যি রোগ তা বলে বাড়ীসুদ্ধ লোকে বাপু কাঁহাতক কি করে? ওরে বিন্দি যা তোর মামাদের ডেকে আন্‌গে যা। বলি কথায় বলে জান ত?—নিত্যি, নেই স্থায় কে, নিত্যি রুগী দেখে কে? তা বাছা, তোমাদের দুটোই সমান!

তিন কন্যার মাতুল গোষ্ঠীটিও খুব খাটো নয়, সংখ্যায় এরা পাঁচ-ছয়টি। সৌভাগ্য যে সব কয়টি মা ষষ্ঠীর বরপুত্র একত্র জুটিতে পারেন নাই, তবে শোনা গিয়াছে শীঘ্রই জুটিবেন।

থালায় থালায় ভাত বাড়িয়া অপর্ণা অদূরে দণ্ডায়মানা পতিতপাবনীর মুখের দিকে না চাহিয়াই তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—ভাতগুলো আপনি ওঁদের ধরে দেন, সব জিনিসই দেওয়া হয়ে গেছে।

মা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাতবাড়া দেখিয়া, কাহাকে কোন্ জিনিষটা অধিক পরিমাণে দিতে হইবে, তাহাই সমঝাইয়া দিতেছিলেন, অদৃষ্টপূর্ব নূতন নূতন খাদ্যসামগ্রীগুলি দুচোখের দৃষ্টি ভরিয়া দেখিয়া তাঁহার মন বিস্ময়-আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল, ইচ্ছা করিতেছিল সমস্তগুলাই তাঁর ছেলেদের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত উদর গহ্বরে ভর্তি করিয়া দেন, প্রফুল্লচিত্তে একগাল হাসি হাসিয়া কহিলেন

—কেন বাছা, তা'তে কি হয়েছে? তুমিই দিয়ে এসো না গিয়ে। ওরাও যে, আমার কামিক্ষেও সে—ওদের কাছে বার হতে তোমার লজ্জা কিসের? ওরা আমার সব তেমন ছেলে নয়!

অগত্যা গায়ে বুকে কাপড় টানিয়া সঙ্কুচিত বিরক্তিভরে অপর্ণা ভাতের থালাগুলা কোন প্রকারে ভোক্তাদিগের কোলের সামনে ধরিয়া দিয়া আসিল। কালিন্দীর মামারা তখন পিঁড়ির উপর দুই হাঁটুর কাপড় গুটাইয়া বসিয়া রান্নাঘর পানে ঘন ঘন তাকাইতেছিল। ভাত আসিলে তাদের এক মহা বিপত্তি আসিয়া জুটিল। তারা ভাতই দেখে, না, যে ভাত আনিয়াছে তাহাকেই শতচক্ষু হইয়া চাহিয়া দেখে, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। একসঙ্গে সম্মুখে উপস্থিত এই দুইটা বস্তুই যে তাদের দৃষ্টির কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন শুভ্র মল্লিকাপুষ্পতুল্য কোমল সুন্দর পরিপাটি করিয়া বাড়া অন্ন, এমন শাকভাজা, শুক্তনি, তেলে ঝালে গরগরে রান্না করা মাছ, বাটিভরা মুগের ডাল, বাঁধাকপির চচ্চড়ি, কুলের অম্বল এসব কোন জন্মে তাদের জঠরানলের ইন্ধন হইয়াছে? আর এই অন্নপূর্ণা মূর্তি ইনিই বা কবে তাদের অন্ন বিলাইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন!

অপর্ণা কোন দিকে লক্ষ্য করে নাই, সে দুইহাতে দুখানা থালা লইয়া নতনেত্রে অগ্রসর হইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতেই ভাইয়েদের ভোজন পর্ব দেখিতে আগতা ক্ষেন্তমণি ভাইদের মধ্যের একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এই দেখ হারু ঐ এর কথাই তখন বলছিলাম। ও কেষ্টা! তোর বউ দেখেছিস? দেখ্ না, ভাল করে চেয়েই দেখ না! কেমন, মনে ধরে?

—হেঁ হেঁ, দিদির যেমন কথা! আমার আবার মনে ধর্‌বে কি? তুমি যা, বল!—বলিয়া একগাল হাসি হাসিয়া কিষ্টধন তার আকর্ণ বিস্তৃত হাঁয়ের মধ্যবর্তী দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত পংক্তি বাহির করিয়া অপর্ণার ঘোর রক্তবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সামনের প্রতীক্ষিত ভাতগুলার কথাও ভুলিয়া গেল।

অপর্ণা কোনমতে থালা দুখানা নামাইয়া দিয়া সহজ গতিতেই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিল; কিন্তু সেখান হইতে আর তাহাকে বাহির হইতে দেখা গেল

না। এদিকে ভোক্তাদের মধ্যে দু-একজন শূন্য জমির সম্মুখে ভাতের থালার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। একটু সময় দিয়া ক্ষেন্তমণি বিরক্তস্বরে ডাকিলেন -- কিগো, ভাত চাপা পড়লে নাকি? নিয়ে আসবে ত এসো না।

আবার মিনিট পাঁচেক চলিয়া গেল, ভাত আসিল না।—কি ব্যাপার কি! ভাত কি দেবার মতলব নেই? অধর্মের ভোগ হয়েচে!—বলিয়া গম্ভীর স্বরে হাঁক পাড়িয়া কর্ত্রীর উপরকার কর্ত্রীঠাকুরাণী ক্রোধভরে দুম্ দুম্ করিয়া রন্ধনশালায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন--অপর্ণা বড় বড় গয়েশ্বরীতে 'জন মুনিষ'দের জন্য আউস চাউলের রাঙা রাঙা ভাতের কাঁড়ি স্তূপাকারে ঢালিয়া তাহারই উপর খানিক খানিক কলাইয়ের ডাল ও একনাদা মোটা চচ্চড়ি স্থাপন করিতেছে। একধারে সেই থালাসুদ্ধ বাড়া ভাতগুলা পড়িয়া আছে।

পতিতপাবনী এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গালে হাত দিলেন—এ কি গো! কানের মাথা খেয়ে বসে আছ না কি? কেমন ধারা আক্কেলই বা বাছা তোমার? ছেলে আমার মুখটি চুকিয়ে পথপানে চেয়ে বসে রইল, আর কি না তোমার এখন ছোট লোকগুলোর উপর যত টান্ পড়ে গেল অধম্মের ভোগ আর কি! যাও, যাও, শিগ্গীর ভাত দিয়ে এসো।

অপর্ণা ব্যঞ্জনলিপ্ত হাত ডালের গামলায় ডুবাইয়া বাটি ভরিয়া ডাল তুলিতে তুলিতে শান্তস্বরে কহিল আপনিই দিয়ে আসুন না।

পতিতপাবনীর মেজাজ একেই বিগড়াইয়াছিল, তার উপর এই অযথা আবদার তাঁর আর বরদাস্ত হইল না, তিনি খড়ের আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া দাঁতে দাঁতে কড়মড় করিয়া উঠিলেন--বলি হ্যাঁ গা, তোমার কাণ্ডখানা কি? কেন, আমার ব্যাটারা কি তোমায় হালুম করে খেতে গিছলে নাকি? কিসের জন্যে তুমি ভাত নে যেতে পারবে না, তাই বল তো শুনি?

অপর্ণা হাড়ে হাড়ে জ্বলিতেছিল। ফিরিয়া বসিয়া মুখ তুলিল, বলিল আমি কিছুই বলতে চাই নে, তত ছোটলোক আমি নই! আমি যাব না।

এই এতটুকু ক্ষুদে মেয়ের এতখানি স্পর্ধা দেখিয়া পতিতপাবনী যত বিস্মিত ততই ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হাত নাড়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—তোকে

যেতেই হবে! এতবড় হাড়বজ্জাত হারামজাদা মেয়ে তো বাপ-কালেও কখন দেখি নে রে, বাবা!

অপর্ণা ঘনমেঘ বিচ্ছুরিত প্রদীপ্তাভ বিদ্যুৎশিখার ন্যায় এক মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার দুই নেত্রে মন্মথদহনকারীর সুপ্ত অনলের ন্যায় ধ্বংসানলের দুইটি জ্বলন্ত শিখা সেইক্ষণে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিয়াছিল, সেও চীৎকার করিয়া বলিল—মুখ সামলে কথা বলবেন! যা বলতে হয় আমায় বলুন, বাপ তুলে গাল সইব না বলে দিচ্ছি। আমি যার তার সামনে কিছুতেই বার হবো না, তার জন্যে আপনারা যা করতে পারেন, করুন।

মানুষের চরিত্রের একটা বড় মজা আছে, মানুষেরই বা কেন, এটি বোধ হয় জীবধর্ম, অতি দুর্বলকেও তারা ফোঁস করিতে দেখিলে নিজের খাড়া শিং নত করে! অত্যধিক ক্রোধে থরথর কাঁপিয়া পতিতপাবনী ভাতের থালা লইয়া গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। তৎপরেই ঘোর কোলাহলে ভোজন-স্থান হইতে মায়ে-ঝিয়ের সম্মিলিতকণ্ঠে অপর্ণার সম্বন্ধে একটা তুমুল সমালোচনা উঠিতে শোনা গেল। ইহার সহিত ছোট মেয়েরা আসিয়াও যোগদান করিল। মেয়েদের মামারা এবং মাসিও একটু ফোড়ন পাড়িতে ছাড়িলেন না—কেবল কৃষ্ণধনই তার পক্ষাবলম্বন পূর্বক মা ও দিদিকে শান্ত করিতে চাহিয়া বারবার মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—আমায় দেখে ও লজ্জায় আসতে পারচে না, অ দিদি!—অ মা অত করে রেগে রেগে মরচিস ক্যানে? শোনই না আমার কথাটা—শোনই না।

মা ঝঙ্কার ঝাড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—শুনবো আবার কিরে? লজ্জায় তো মরচেন! নজ্জাবতী নতা আর কি! দাড়াও না, একবার মন্তর কটা পড়া হয়ে যাক, উঠতে বসতে পয়জারের বাড়ী দিতে দিতে দুদিনে ঢিট্ করে নেবো না! মেজ বউটাকে কি কম কষ্টে শুধরেছিলুম! হুড়কোকে হুড়কোই পিঠে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে! হুঁ, হুঁ, বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ গ্যাখ নি!—আমায় বলে কিনা মুখ সামলাতে? ছোটমুখে বড় কথা! সামলাচ্ছি কি না মুখ।

কৃষ্ণধন সম্প্রতি বিরহকাতর, বিশেষতঃ অপর্ণার অনুপম যৌবনশ্রী বিমণ্ডিত তন্থর সৌন্দর্যে সে সর্বান্তঃকরণেই বিদ্ধ হইয়াছিল, মায়ের কথায় দুঃখিতচিত্তে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—তা মা, মেজবউ ত তোমার হাতের সেই হুড়কো খেয়েই সব্বশরীর আউলে উঠে জ্বর হয়ে মরে গেল, একে তুমি মারতে পাবে না কিন্তু, এও তাহলে মরে যাবে।

—বটে র‍্যা ড্যাক্‌রা! হতচ্ছারা! না মারবো না! তোর দোজপক্ষের সোহাগী বউকে টাটে বসিয়ে ফুলচন্নন দিয়ে পূজো করবো! আধোয়া খ্যাংরার মুড়ির চোটে দুদিনে ঢিট্ করে ফেলবো না! তবে আমার নাম পাবুনি-বামণি, ঐ একরত্তি মেয়ে আমায় বলে কি না মুখ সামলাতে! আমি সামলাবো মুখ —নোড়া দিয়ে অমন মুখ ছেঁচতে হয় না!

বেলা কাটাইয়া রান্নাঘরের হাঁড়ি উঠিল। পাড়াগাঁয়ে যে বাড়ীর বাবুরা বাড়ীছাড়া সেখানে একবেলা রাঁধিয়া দুইবেলা খাওয়াই মেয়েদের রীতি। এবাড়ীতে এখন বাবুর দল জুটিয়াছে; তা ভিন্ন ঐরূপ রাক্ষসের আহার অতগুলি মানুষের একবেলারই রাঁধিয়া যোগান দেওয়া যায় না, দুইবেলার কেমন করিয়া কুলায়? মেয়ে পুরুষ—খাইবার শক্তি কাহারও ত সামান্য নয়! অপর্ণার আজকাল দুবেলার একবেলাও পেট ভরিয়া খাওয়া হয় না। এতগুলি মানুষকে দিতে দিতে সকলের শেষে নিজের জন্য বড় একটা কিছুই পড়িয়া থাকে না। এতগুলি ডবল খোরাকীর রান্নাবাড়া করিতে করিতে তার এই চিন্তা বিষাদ কাতর অপমান জর্জরিত চিত্ত ও বালিকা শরীর জখম হইয়া পড়ে। দু-চার-দিনের জন্য ইচ্ছা সুখের রন্ধন এক আর এ কাণ্ড আর। একদিনেই মনে হইতেছিল, বারমাস এই যজ্ঞের আহুতি দিতে গেলে নিজেকেই আহুতি দিতে হইবে।

সৌদামিনী উৎসুকনেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিলেন। অপর্ণা আসিয়া জলঘাঁটা ঠাণ্ডা হাত জরতপ্তললাটে রাখিতেই একটু স্বস্তির ভাবে চোখ নিমীলিত করিয়া থাকিলেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছিল রে? আবুইমা অত চটেছিলেন কেন?

অপর্ণা বুঝিল, মার কানে গোলমালটা পুরামাত্রাতেই প্রবেশ করিয়াছে। কথাটা উল্টাইবার চেষ্টায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল—ওসব কিছু না! ও তুমি শুনে কি করবে? ওঁর বকাই স্বভাব।

সৌদামিনীর কণ্ঠের কাছে একটা নিঃশ্বাস আটকাইয়া আসিতেছিল। কষ্টে সামলাইবার চেষ্টা করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন—তোকে কেষ্টধনকে পরিবেশন করতে বলছিল বুঝি?

—হুঁ।

—গেলি নে কেন? না যাওয়াটা ভাল হয় নি।

অপর্ণা অতিশয় বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল—কেন মা?

সে তোর কে যে তাকে তুই লজ্জা করবি? মামীর ভাই মামার তুল্য, তার সাক্ষাতে বার হলে নিন্দা নেই।

সৌদামিনীর স্বর গাঢ় এবং দৃঢ়। অপর্ণা এইবার মায়ের কথার ইঙ্গিত বুঝিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া ব্যথিত দৃষ্টি গোপনার্থ ভূমি-পানে চাহিল, এবং ত্বরিতস্বরে কহিয়া উঠিল—ওরা মা, বড্ড যা তা বলে। আমি ওদের সামনে যেতে পারবো না।

বিহারী এই সময় দুইটি ডালিম হাতে ঘরে ঢুকিল। পূর্বের ন্যায় বেশি কিছু না পারিলেও কায়ক্লেশে কিছু বাঁচাইয়া সে কালনা গেলেই ডালিম বা লেবু লইয়া আসে। সে অপর্ণার শেষ কথাগুলা শুনিতে পাইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল—কাদের সামনে?

সৌদামিনী বিহারীকে চেনেন। এখনি সে কি করিতে কি করিবে ভাবিয়া কথাটা ঢাকা দিতেছিলেন, কিন্তু খপ করিয়া কিছু বলা এখন তাঁর সাধ্য নাই,—কথা কহিবার চেষ্টা করিতে গিয়া হঠাৎ বড় জোরে কাসি আসিয়া পড়িল। ইত্যবসরে অপর্ণা কুঞ্চিত ভ্রূযুগ্মশালী সুন্দর মুখখানা বিহারীর দিকে ফিরাইয়া সবেগে উত্তর করিল—কারা জানো না? এই হারাধন, কেষ্টধন, তারাধন শ্যামধন, আর একটি কে?

কেনই বা তুমি ওদের সাক্ষাতে বার হতে যাবে? কি দরকার তোমার?

যত্ত হতভাগা গুণ্ডার দল এসে জুটেছে বাড়ীতে, গাঁজার ধোঁয়ায় নীচে টেঁকে, কার সাধ্যি! রামচন্দ্র! তুমি কি দুঃখে ওদের সামনে যেতে গেলে দিদি?"

অপর্ণা এবার আর এই সহানুভূতির উত্তাপ সহ্য করিতে পারিল না, তার মনটাকে আজ দ্বৈপ্রাহরিক সেই হেয় অপমানে পতিতপাবনী যেন দুই পায়ে থেঁৎলাইয়া মাড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, সে অপমানের ব্যথা সে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছিল না: শুধু মায়ের মুখ চাহিয়াই কোন রকমে চাপিয়া আছে, কিন্তু তাদের এই একটি মাত্র যথার্থ আপনজন যখন তার সেই জ্বালায় এমন করিয়া প্রলেপ বুলাইয়া দিল, তখন আত্ম-সংবরণ করিতে পারা তার মত একটি বালিকার পক্ষে সহজ হইল না। চোখ ছলছল ও মুখ লাল করিয়া সজল গাঢ় স্বরে সে বলিয়া ফেলিল—ওদের রাঁধুনি-বৃত্তিই যখন করতে হবে, তখন সামনে বার না হলে চলবে কেন বেহারি দা?

কথাটা বিহারীর প্রাণে শূলের ফলার মত বিঁধিল। সৌদামিনীও শুনিয়া চোখে হাত চাপা দিলেন। অপর্ণার কথায় আধিক্যদোষ কিছু মাত্র নাই, তার এ রন্ধন-বৃত্তি আর স্বেচ্ছার আনন্দ নয়, উৎপীড়কের হস্তে নিরুপায়ের কষ্টে আত্ম-সমর্পণ। সৌদামিনীর এত আগ্রহ, বিহারীর এত চেষ্টা, রাঁধুনির মেয়ের রন্ধন-বৃত্তি ঘুচাইতে পারিল না। বিধাতার বিধান! কে কি করিবে?

কিন্তু বিধাতার সহিত আপোষ করিয়া চলা আর যার পোষায় পোষাক, বিহারীর পোষাইবে না! সে অন্তরের বিষজ্বালা বাহিরে ছড়াইয়া দিয়া উচ্চ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—কেন তুমি সাতগুষ্টির রান্না রাঁধতে যাও দিদি! আমি তোমায় মানা করছি, তুমি যেতে পাবে না।

সৌদামিনী একেবারে অক্ষম হওয়ায় একটু যেন ভীরু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি এ প্রস্তাবে চঞ্চল হইয়া বলিলেন—তাতে হয়ত আরও হাঙ্গামা বাড়বে, —কাজ কি মামা?

বিহারী দিব্য নিশ্চিন্তভাবেই উত্তর করিল—বাড়ে বাড়বে মা! তাই বলে আমার প্রাণ থাকতে দিদিকে যে কেউ এক কথা বলবে, সে আমার বরদাস্ত হবে না।

নির্মলের আঘাত মারাত্মক না হইলেও সামান্যও নয়। স্বাস্থ্য অমন অটুট এবং বয়স এত অল্প না হইলে হয়ত এ ধাক্কা সামলানো কঠিন হইত। সারারাত্রি সে আচ্ছন্নভাবে রহিল। ধীরা ঘরের একপাশে সশঙ্কচিত্তে বসিয়া ছিল। কিশোরী-পত্নীর উপযুক্ত লজ্জার স্থান তার চিত্তে ছিল না। এ অবস্থায় কিরূপ আচরণ করিতে হয় তা তার অজ্ঞাত। সে যে নির্মলের কাছে না আসিয়া দূরে রহিল, ইহার কারণ লজ্জা নহে সঙ্কোচ মাত্র।

অনেক রাত্রে ক্ষমার মা তাহাকে নিজের ঘরে ফিরাইয়া আনিল। নিজের কানে সে ডাক্তারদের বলাবলি করিতে শুনিয়াছে—জ্বর না আসিলে ভয় নাই।

ঘরে ফিরিয়াই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে তোর স্বামীর কখনো অসুখ করেছিল?

—তা করেছিল বই কি! অসুখ আবার কাউকে ছেড়ে কথা কয় নাকি দিদি! তা যতই কেন না জোয়ান হোক সে। এই দেখ না, জামাইবাবু, আহা মুখখানিতে যেন হাসিটি লেগেই আছে, কথা শুনলে যেন কান দুটি জুড়িয়ে যায়, তা আজ একটিবার চোখদুটি মেলেও তাকাচ্ছে না! কোথাকার ফের কোথায়!—

ধীরার বক্ষে একটা আঘাত পড়িল। তার পাতলা ঠোঁট দুখানি আকস্মিক ভয়ের তাড়নায় ঈষৎ খুলিয়া গেল।—একবারও চাইচেন না? তবে কি হবে ক্ষমার মা?

—কি আর হবে? ভাল হয়ে যাবে। ভয় কি?

ভয় নাই! সত্যই কি ভয় নাই? বড় আগ্রহে এই অভয়মন্ত্রটি জপ করিতে চেষ্টা করিয়া সে বিছানায় পড়িয়া রহিল, কিন্তু নির্ভয় হইতে পারিল না।

মানুষ যেটাকে সহজ ভাবে, হয়ত তাকে উপহাস করিয়া ঠিক উল্টাই ঘটে। ভোরবেলায় জ্বর আসিল, এবং বেশ কয়দিন ভোগ চলিল। নিকট আত্মীয়

কেহই নাই যে ভয় পাইবেন? একজন যে ছিল ভালমন্দ অনুমান করিবে সে শক্তিও তার নাই।

লোকে অবশ্য ধীরাকে ভাল না থাকিলেও ভাল বলিয়াছে, কিন্তু ধীরার মন তাহা প্রত্যয় করিতে পারে নাই। উষার প্রথম অরুণরেখার মত পতিভক্তির আলো সেই অন্ধকারের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া সে আলোয় বিশ্বের জনের করুণার্হা ধীরা দৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও যেন তার বিপদের ছায়া দেখিতে পাইয়াছিল। নির্মলের ঘরেই সে অধিককাল যাপন করে; কিন্তু তার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। সেবার ইচ্ছা রোধ করিয়া অক্ষমতার লজ্জায় মরিয়া থাকে।

স্বামীকে হারাইবার ভয় স্বামী দর্শনে বঞ্চিতা কিশোরীকে সহসাই স্বামীর প্রতি এমন ঐকান্তিকতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। বাত্যাহত কদলীবৃক্ষবৎ যে প্রাণটা ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল হঠাৎ একদণ্ডের বৃষ্টিতে সে আবার—নূতন পত্রোদ্গম করিল! যে যাই বলুক, 'এক দণ্ড' জিনিষটিকে ছোট বলিয়া অবজ্ঞা করা চলে না। এক দণ্ডে কামানের মুখে হাজারটা প্রাণের অর্ঘ্য পৃথিবীর বুকে সাজাইয়া দেয়, এক দণ্ডের একটি মিথ্যা ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরেরও নরক দর্শন দুঃখ ঘটাইয়াছিল, ক্ষুদ্রকে যে সামান্য বলিয়া তুচ্ছ করে, সে বড়কে চেনে না। অসংখ্যের আধারস্থল এই যে ব্রহ্মাণ্ড—এও না কি এক সময়ে নাম রূপ বিবর্জ্জিত একটি একাক্ষরযুক্ত শব্দমাত্রে পর্যবসিত ছিল, পরে সূক্ষ্মতম অণু পরমাণু দ্বারাই ইহার সংগঠন ঘটিয়াছে! তবে সামান্য ক্ষণ বা ঘটনাকে অগ্রাহ্য করা যায় কিরূপে?

গোপন অর্থ সম্পদে আশ্চর্য ঐশ্বর্যবান্ ক্ষুদ্র শ্লোকটি যেমন বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অর্থহীন, ধীরার এই পাতিব্রত্য-প্রেমও সাধারণের দুর্বোধ্য। চোখ ভরিয়া যে প্রিয় মূর্তি দেখিলামই না, তাহার উপর মর্মান্তিক টান কোথা দিয়া আসিবে এ কথা বুঝিবে কে? কিন্তু সংসারে এমন কতকগুলা জিনিষ আছে, যাহা অপরের বোঝা না-বোঝা, দেখা না-দেখার অপেক্ষায় পড়িয়া থাকে না; জলের উপর জলজার মত আপনা হইতেই জন্মে ও বিকশিত হয়। ধীরার শূন্যচিত্তে

বিপদের ঝড় সত্যকার ঝড়ের সঙ্গে মিলিয়া এই যে আবিষ্কারটা করিল ইহাতে তাহাকে অবসন্নতার নিদারুণ ক্লান্তি হইতে জাগাইয়া তুলিয়া যেন পাথরে আছাড় মারিল। সেই মুহূর্তেই সে জানিয়াছে এই স্বামীই এখন তার সব, আর সেই স্বামীই হয়ত না বাঁচিতেও পারে!

৩১

সংসারের পরিচালনা-চক্র যাঁর হাতে সেই কালরূপী চক্রী এ অবস্থায় প্রায় যেটা করেন না, সেটা না করিবার প্রতিজ্ঞাও ত করেন নাই। কয়েকদিন পরে নির্মলের জ্বর ছাড়িল ও বিপদ কাটিয়া গেল। প্রখর শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনিতে ধীরার হৃৎপিণ্ড তেমন উতলা করিয়া তোলে না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মিত শব্দে সে জানিতে পারে, রোগের সহিত যুঝিবার পর ক্লান্ত রোগী শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া শ্রান্তি অপনোদন করিতেছে। তার বিজন বক্ষে সে কি অশ্রুতপূর্ব সুরে আশার রাগিণী মূর্ত হইয়া দেখা দেয়। ভগবানের এমন আশীর্বাদ সে তার এই অভিশপ্ত জীবনে যেন কল্পনাই করে নাই! নিজের বামহস্তের সরু লোহাগাছির উপর ধীরে ধীরে হাত বুলায়—মাথা নত করে। যিনি স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে পাথারে তলাইয়া যাইতে দেন নাই তাঁহাকে বারবার প্রণাম জানায়, আবার যিনি মরণের হলাহলকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়রূপে তাহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন—সেই স্বামীর উদ্দেশ্যেও প্রণিপাত জানায়। সে দুটি সে না চোখের দৃষ্টিতে—না হাতের স্পর্শে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছে, তবু সে তার পূজার বস্তু একথা সে ক্ষমার-মার কাছেই শিখিয়াছে।

নির্মলকে ঘুমাইতে দিয়া সেবা করিবার লোকেরা চলিয়া গিয়াছিল, ধীরা অনুভবে-অনুভবে বিছানার কাছে আসিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। ঘুমন্তের নিঃশ্বাস একভাবেই চলিতেছে। হাত বাড়াইতেই একখানা হাত-পাখাও হাতে ঠেকিল। এই জিনিষটাই সে খুঁজিতেছিল, তাই হৃষ্টচিত্তে পাখাখানা তুলিয়া

লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। খাটের উপরকার মানুষটাকে স্পর্শ করিতে তার সাহসে কুলাইল না।

কিছুপরেই ঘুমভাঙ্গার পূর্বলক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত ও দ্রুত হইয়া আসিল! ধীরার একবার মনে হইল পাখা রাখিয়া উঠিয়া যায়। কেমন যেন একটু বাধ বাধ মনে হইল, কিন্তু কোন কারণ না পাইয়া সে পাখা থামাইল না। লজ্জা করা সম্বন্ধে তার জ্ঞান যে বড় কম।

—কে ? অপর্ণা ? না না ; কি বলতে কি বলে ফেলেচি, ধীরা ?

নির্মল আজ চারদিন পরে এই প্রথম কথা কহিল।

সহজ বটে—কিন্তু গোড়াতেই অতবড় মারাত্মক ভুল। অসুখে ভুগিয়া তার স্বর এমন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, শুনিয়া ধীরার ছুটি চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে নতনেত্রে পাখার বাতাসে ঈষৎ জোর দিল। উদ্বেলিত চিত্তভাব অপ্রকাশ রাখিবার জন্য একটা কিছু না করিলে শরীর মনে যে হিল্লোলটা আসিয়াছে সেটা যাইবে কোথা ?

—তুমি কেন বাতাস করচো ধীরা। পাখা রেখে দাও, না না, থাক থাক, কিছু দরকার নেহ, সত্যি দরকার নেই, রাখো রাখো।—নির্মল হাত বাড়াইয়া পাখাখানা টানিয়া লইতে গেল, কিন্তু নাগাল না পাইয়া যেন সে একটা অসঙ্গত নীচ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে--এমনি সন্ত্রস্তভাবে তাহাকে বারম্বার বাধা দিতেই লাগিল। যে প্রেম নারী পুরুষকেই নয়, প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের প্রাণে প্রাণে সংযোগ করিয়া দেয়, যদি উহাতে ঢাক বা ফাঁকি না থাকে তবেই তাহা সার্থক হয়। যাহাকে সর্বস্ব বিলাইয়াছি, তাহারই নিকট নিঃসঙ্কোচে লইতে পারি, কিন্তু যাহাকে যা দিবার কথা তাহা দিতে না পারিয়া কুণ্ঠিত হইয়া আছি তাহার নিকট গ্রহণ করিব কোন মুখে ?

নির্মলকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া ধীরার মনে ব্যথা বাজিয়াছিল। পিতার রোগশয্যায় তার কত বিনিদ্র রাত্রিশেষে প্রভাতের পাখী গাহিয়া উঠিয়াছে, পিতা তাহাকে বারণ করিয়াছেন, বাধা তো দেন নাই! তিনি জানিতেন, ঘুমাইয়া সে যে স্বস্তিটুকু না পাইবে, ঘুম তাড়াইয়া অনায়াসে তদপেক্ষা বেশী

পাইতে সমর্থ। কিন্তু নির্মল ত তাকে জানে না, অথচ এই কিছু না জানা মানুষটিই আজ তার সব! সে তার এই পূজা, এই বড় দৈন্যের পূজা, লইতে না চাহুক, মুখ ফিরাক, তবু সে-ই তাঁর পূজার দেবতা! সে আজ বুঝিয়াছে দেখিবার, শিখিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজের কাছেই এ শিক্ষা তার আপনা হইতে হইয়াছে যে—এই পূজা-সুখের অপেক্ষা জীবনে তার আর কোন সুখই নাই।

নির্মল এবার একটু মাথা তুলিয়া ঝুঁকিয়া পাখাখানা ধরিল, তারপর সেটা তার হাত হইতে খসিয়া আসিলে—দুর্বল হস্তে বারকয়েক নাড়িয়া তাহারই অঙ্গে হাওয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিল—আমার জন্যে ধীরা, নিজেকে একটুও ব্যস্ত করো না। আমি এই দেখতে দেখতে সেরে যাবো; কিন্তু তুমি যদি এর মধ্যে আমার ভাবনা ভেবে, আমার জন্যে কাজ করে ঐ দুর্বল শরীরে অসুখে পড়ো তা হলে আমি নিজেকে সেরে তোলবার সময় দিতেই পারবো না।

নির্মলের এই অবিবেচনায় ব্যথিত বিদ্রোহ মুখে না ফুটাইয়া নিষ্ফল সেবা চেষ্টা ত্যাগ করিয়া ধীরা কিছুক্ষণ সেইখানেই স্থির বসিয়া থাকিল। তারপর অনেকক্ষণ রোগীর ঘরে থাকায় তার মাথাধরার ভাবনায় স্বামীকে বিশেষরূপ উদ্বিগ্ন দেখিয়া সেখান হইতেও শেষে উঠিয়া চলিয়া আসিল। বাহিরে গিয়া তাহার কান্না আসিতে লাগিল। মনে হইল, সে যদি চোখে দেখিতে পাইত, তা হইলে তো তাহাকে এমন করিয়া অপরের দৃষ্টির মধ্যস্থলে দ্রষ্টব্যকে দেখিতে হইত না। কোথাও নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াই দূর হইতে দেখার সুখ চরিতার্থ হইতে পারিত! এমন সুখেও তুমি এতবড় বাদ সাধিলে কেন? কেন ভগবান?

নিজের ঘরে ফিরিয়া—ক্ষমার মা আসিলে ধীরা জিজ্ঞাসা করিল—কাণা হওয়া বড় খারাপ, না রে ক্ষমার মা?

ক্ষমার মা উত্তরে কহিল—না, হ্যাঁ, তা দিদি! তোমার এতই বা কষ্ট কিসের?

—কষ্ট নয়? কাউকে দেখতে পাই নে, কিচ্ছুই করতে পারি নে, এর চেয়ে কষ্ট আছে? আচ্ছা, তুইই বল্‌তো, আছে?

—হ্যাঁ-অ্যাঁ—কত। তোমার আর কষ্ট কি দিদি। একই নেই, আর সবই তো তোমায় ভগবান কম করে দেন নি। রাজা বাপ, অমন স্বোয়ামি, আহা, বেঁচে থাকুন, জামাইবাবু তোমায় বড্ড ভালবাসেন গো, দিদিমণি! তুমি মাটিতে হেঁটে গেলে; যেন বুকে ওনার বেথা বাজে।

তবে কি ইহা ভালবাসারই লক্ষণ! অত্যন্ত ভালবাসাতেই তার স্বামী তাহাকে তাঁর জন্য কিছু করিতে দেন না? সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অবসাদে ক্ষণিকের সেই টানিয়া আনা আনন্দটুকু মুহূর্তেই ছায়ার মতই মিলাইয়া আসিল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল—কিন্তু এমন করে কি থাকা যায়?

এমন করে কেন গা? তুদিন বাদে আবার তোমার রাঙা-খোকা হবে, তখন আবার তাকে নিয়ে—

ধীরা এবার বিছানার মধ্যে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। তার মনে হইল এই পুরাতন দাসীটির গলার স্বর চুরি করিয়া কোন দেবতাই যেন তাহাকে বর দিতে আসিয়াছেন! সে জীবনে একবার একটিমাত্র খোকাকে কোলে করিতে পাইয়াছিল, সে স্পর্শ আজও সে ভুলে নাই। কাঙালের মত ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া কহিয়া উঠিল—কাণাদের কি নিজের খোকা হয় রে, ক্ষমার মা?

—কি যে তুমি বল, দিদি! কেন হবে না? কাণা কি আর মানুষ নয়?

—তারা কাণা হয় না তো?

এ বিষয়ে ক্ষমার মা নিশ্চয়ই মাথা খাটায় নাই, কিছু না ভাবিয়াই তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—উঁহুঁ; তা, কেন হতে যাবে? তা হয় না।

পরম উল্লাসে ধীরার সর্বশরীরে কাঁটা দিয়া যেন সেই বহুদিনের,—সেই বহুপূর্বে তার পিতৃ-বন্ধুর একটি শিশুর অতীত স্পর্শটুকু সর্বশরীর-মনে তার বসন্ত বায়ু হিল্লোলের মত হিল্লোল জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সে লোভাতুর চিত্তে সেই শুভদিনের পানে মনের ভিতর শতচক্ষু হইয়া চাহিয়া দেখিতে গেল,

কিন্তু হায় রে ভিখারীর রাজ্যলাভ স্বপ্ন!—পরক্ষণেই আনন্দের জোয়ারটুকু ভাঁটার টানে সরিয়া আসিল, সুগভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে শুইয়া পড়িয়া যেন আপনাকেই আপনি বলিল,—না, না, আমার খোকা চাই নে, আমি তো তাকে দেখতে পাবো না!

৩২

ব্রজর মত লোক সংসারে বেশী জন্মিলে ভগবানের সৃষ্টিধারার বিশৃঙ্খলা ঘুচাইতে তাঁহারই ব্যাজার ধরিয়া যাইত, মানুষের ধরিবে সে আর বিচিত্র কি? একটা না একটা উলোট পালোট না করিয়া সে যেন দুটো দিনও স্থির থাকিতে পারে না। সেই বর্মী রূপসী ব্রজর এখন ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছে, তার নারীজন অনুচিত লজ্জাহীনতা ব্রজর চক্ষে পূর্ণ উন্নতিরই লক্ষণ। খাদ্যাখাদ্যের অবিচারে বিবাহসম্বন্ধে বিশ্বজনীনতায় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদে দ্বিধাহীনতায় বর্মীদের মত উন্নত তো য়ুরোপীয়েরাও নন। মাপোর চোখ সাধারণ বর্মী চোখের চেয়ে ঈষৎ বড়, গায়ের রং মুখের গঠনেও মঙ্গোলীয় এবং ককেশিয়ের মিশ্রণ। সকল জাতীয়কে বিবাহ করা ও সে বিবাহ অনায়াসে বিবাহান্তরের কল্যাণে বর্মীদের বড়ঘরেও 'সঙ্করের' অভাব বড় একটা নাই। ব্রজর মত অসভ্য বাঙ্গালী মেয়ের চাইতে সেও ভাল! নাকে-কাঁদা, ঘোমটানা বঙ্গবধূর শ্যামলী মূর্তি স্মরণে যে ঘৃণার উদ্রেক করে, এই ভবিষ্য কুটুম্ব বর্মাবাসীর সখের খাদ্য নাপ্পির গন্ধও তেমন নয়।

বিবাহ হয় হয় এমন সময় কোথা হইতে নির্মল গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একটা গোল বাধাইল। পৃথিবীকে না জানাইয়া চুপে চাপে এত বড় বীরত্বের কাজটা করা তো আর চলে না, তখনকার মত বিবাহ বন্ধ রাখিল।

ডাক্তার স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, ব্রজর সহিত দেখা করিয়া সংবাদ দিলেন, নির্মলের জন্য আজ বিশেষ ভয়ের কারণ আছে।

নির্মলের সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্তির সে সংবাদে উৎসাহ সহকারে

বলিয়াছিল,—হবেই তো! বাবার বিচার না থাকলেও জগতের একটা আইন ত আছে!—কিন্তু নির্মলের এই ক'দিনের অসুখেই আফিসের লোকেরা ব্রজকে কাজের বোঝা এতই চাপাইতে লাগিল বাড়ীর খরচ-পত্র ইত্যাদি লইয়াও দরবার চলিল, তখন মনে হইল নির্মল সারিয়া উঠিলে বাঁচা যায়।

ডাক্তারকে সে উত্তর দিল—আমায় সে ভয়ের ভাগটা দিতে এলেন কি জন্যে? আমি তো আপনার চাইতে বড় ডাক্তার নই। আপনারা ভাল করে দেখা শোনা করুন না; কিন্তু দেখবেন, ও যেন বেঁচে ওঠে। ও মারা পড়লে এ আফিস চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব!

ডাক্তারের অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল, কহিলেন,—আফিসের জন্যে না হোক্, ধীরার জন্যে আমি যথাসাধ্যই করবো। আপনাকে এই জন্যে জানিয়া রাখা, নেহাৎ যদি না পারি—আপনাকে জানাই নি বলে যেন দুষবেন না।

নির্মল ভাল হইয়া উঠিবার পরে একদিন ব্রজর সহিত সাক্ষাৎ করিল। ব্রজর এ পর্যন্ত সে সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই।

—এই যে নির্মল, বেশ উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছো দেখছি যে। যাক্ বাঁচা গেল! কবে থেকে আফিসে জয়েন করবে?

নির্মলের শরীর এখনও দুর্বল। ডাক্তারের আদেশ—সে কিছুদিন পরিশ্রমসাধ্য কাজ না করে। কিছু বিপন্নভাবে বলিতে হইল—ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে ঠিক করতে হবে।

ব্রজ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।—আরে যা নয় তা, ডাক্তার আবার কে কবে রোগী হাত ছাড়া করে? ওরা তো বলবেই, 'রেষ্ট নাও'—'চেঞ্জে যাও'—'আরও দু-চার শিশি টনিক খাও'।—ওদের মত নিয়ে চললে কাউকে আর কাজ করে খেতে হবে না।

নির্মলের মনে প্রশ্ন ছিল, ব্রজ তার বুদ্ধিকে ভাল কাজে লাগায় না বলিয়াই এমন সন্দেহ করা সঙ্গত নয় যে তারমধ্যে সে বস্তুর অভাব আছে। বুদ্ধি থাকিলেই তাহা যে সুবুদ্ধি হইতে হইবে—বুদ্ধিদাতার সহিত এমন বুঝাপড়া করা হয় নাই তো। কি সে প্রশ্ন—সে কথা সে বুঝিল এবং সে নির্মলকে

আকর্ণ আরক্ত করিয়া বারবার ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া গোপনে সে বড় হাসিটাই হাসিল।

এবার নির্মল মরিয়া হইয়া উঠিয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিল—বলিতে গিয়া লজ্জায় ও কুণ্ঠায় সে যেন মরিয়া যাইতেছিল—আশ্চর্য একটা গুজব উঠেছে।

ব্রজ সকৌতুকে চাহিল,—কি রকম শুনি?

—আপনি না কি, নাঃ, হয় তো মিথ্যে খবর, ধীরা ভারি কাঁদচে।

—তা নয় কাঁদচে, কাঁদলেই বা আমার কি! আমি না কি, কি? ওঃ! বর্মী বিয়ে করচি; এই না? কেন, তাতে কি?

এর পর তর্ক চলে না। অনেক কষ্টে কি যেন বলিতে যাইতেছিল; ব্রজ তার পিঠে হাত দিয়ে হাসিয়া বলিল—থাক্, থাক্,—তুমি যা যা বলবে তার গোটাকতক আমিও বলতে পারি।—ওরা মঙ্গোলিয়ান্,—আমাদের সঙ্গে একজাতিই। হিন্দু তো দূরে থাক,—আরো ঢের—কিন্তু আমিও বলি, অন্ধের চাইতে পাত্রী হিসাবে সে মন্দ হবে না, অন্ততঃ শুভদৃষ্টিটা তো হতে পারবে!—

এই নির্মম পরিহাসের কঠোর আঘাতে ব্যথাহত চিত্তে সে ফিরিয়া গেল।

৩৭

ব্রজর তর সাহিতেছিল না। মাপোকে ঘরের ঘরণী করিবার জন্য সে যেন মাতিয়া উঠিয়াছে। গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইতেছিল, ইংলিশ স্টাইলে শুধু তো আর চলিবে না। বর্মী আবহাওয়া তো আনিতে হইবে, নতুবা বর্মীয়ানী টিঁকিবে কিরূপে। বিবাহেরই বা আর দিন কই? অপর্যাপ্ত অর্থব্যয়ে ভোজের সভা সাজান হইয়াছে। বিবাহের পর 'মধু-বাসর' যাপনের জন্য এক নূতন স্টীমার টাকা খরচা করিয়া কেনা এবং তাহাতে সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। বাকি শুধু বিবাহটা।

সারা বিকাল মোটরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কতকগুলি হীরা জহরৎ কেনাকাটা হইলে গাড়ী আসিয়া কনের বাড়ীর দরজায় থামে থামে, এমনই সময় একজন

চীনা পথিকের সহিত ব্রজর ভাবী পত্নীর দৃষ্টির বিনিময় হইল। চীনাটি গাড়ীর শেষ গতির সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া আসিয়া ব্রজকে ছাড়িয়া তাহার সঙ্গিনীকে নিজেদের প্রথায় সহাস্য অভিবাদন করিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া তার অভিবাদনের হাসির এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। চীনা ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্রজ ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। তার মনে হইতেছিল এত বড় উদ্ভট ভাষা পৃথিবীর ভাবরাজ্যে কখনও প্রবেশাধিকার পায় নাই! কেবল চ্যাং, চুচু, চিংচুং—এমনি একটা একান্ত হাস্যকর বিকট শব্দমাত্র কষ্টে বোধগম্য হইতেছিল।

লোকটা চলিয়া গেলে নিজে নামিয়া সঙ্গিনীকে নামাইতে নামাইতে ব্রজ অপ্রসন্ন অনুযোগে প্রশ্ন করিল—কি তোমরা অত বলাবলি করে হেসে কুটিকুটি হচ্ছিলে? আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে চীনেটাকে দেখাচ্ছিলেই বা কি?

বাগ্দত্তা বধূ ভাবী স্বামীর কর গ্রহণ করিয়া চলিতে চলিতে ক্ষুদ্র রক্তাধরে মধুর মৃদু হাসি হাসিয়া উত্তর দিল—ও আমার দ্বিতীয়বারের স্বামী ছিল কি না, ওকে আমি ছেড়ে দিয়েছি—তবে ওর মেয়েকে ক'দিনের জন্য নিজের দেশে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, এসেছিল—তোমায় দেখে কে হই—জানতে চাইছিল।

ব্রজ চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল—তোমার দ্বিতীয় বারের স্বামী! প্রথমটি কে?

চঞ্চল চটুল চক্ষে হাসির বিদ্যুৎ ছুটাইয়া, সুন্দরী তাচ্ছল্যভরে কহিলেন, সে একজন য়ুরোপিয়ান—ইটালীতে তার বাড়ী।—সে তো অনেক দিনের কথা, লোকটা সম্ভবতঃ মরেই গেছে! এখান হতে অসুখ হয়েই দেশে যায়, তার ছেলেটিও এই কিছুদিন হলো মারা পড়েছে।

ব্রজ ভাবী পত্নীর হাত ছাড়িয়া দিল,—তা বেশ! আমি আমি হচ্চি—তৃতীয়? তারপর?—চতুর্থ স্থানে কোন দেশ থেকে কিনি আসবেন, সেটা ঠিক করা আছে ত? হনলুলু হটেনটটে বোধ করি বাধা নাই? মাগো!—

সে কি বলিতে যাইতেছিল—বাধা পড়িল। এই সময় বাড়ীর ভিতর দিক

হইতে তাদের সাড়া পাইয়া বিচিত্র চায়না সিল্কের পোষাক পরা একটি ক্ষুদ্র বালিকা উচ্চ আনন্দ-চীৎকারের সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া মাপোকে জড়াইয়া ধরিল। বর্মী ভাষায় মুখে বলিতেছিল— মা! মা! আমি তোমার কাছে ফিরে এসেচি, আমায় কোলে নাও আদর করো।

ব্রজ অর্ধ মুহূর্তের জন্য বিচ্ছেদাবসানের পর মাতাপুত্রীর মধুময় সম্মিলন দৃশ্য ব্যঙ্গমিশ্র তীব্রতার সহিত দীপ্তনেত্রে চাহিয়া দেখিয়া পিছন ফিরিল। নিজেকে গাড়ীর মধ্যের একটা আসনে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া সে বিস্ময় বিমূঢ় সোফারকে ডাকিয়া বলিল—বাড়ী চল্।

ওর সব কাজেই সমান ত্বরা! যখন যে দিকে ইচ্ছাকে পরিচালিত করে, রাশ টানিয়া চালায় না, তার চিত্তরথী মনরূপী আরবী ঘোড়াকে পবনবেগে ছুটাইয়া দিতেই অভ্যস্ত। আজও ব্যতিক্রম ঘটিল না।

সেই কাণ্ডের অব্যবহিত পরেই গরীব কেরানী আলোকনাথ ঘোষালের সামান্য কাঠের ঘরের সামনে অকস্মাৎ বন্যাপ্লাবনের ন্যায় রোলস্ রয়েসে আবির্ভূত হইয়া ব্রজ তার চতুর্দিকে একটা শঙ্কিত সংশয়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। তার মোটরের অভদ্র তর্জনে সশঙ্কচিত্ত আলোকনাথ যেমন ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি সেই ভৌতিক যান হইতে ভূতের মতই ত্বরিতে নামিয়া ভূমিকা না করিয়াই একনিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, তোমার একটি আইবুড় মেয়ে আছে না? তার বিয়ে দেবে তো?

ব্রজর পিতার অনেক দিনের পুরাতন কর্মচারী আলোকনাথ ঘোষাল মনে করিল, হয় ত নির্মলের কাছেই তার সাংসারিক দুর্গতির খবর কন্যাদায়ের খবর জানিয়া এই পথে যাইতে একটু অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছেন। হয় ত বা এ মাস হইতে দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া বিশটি টাকার উপর পাচটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে, বাপের মত কন্যাদায়ের জন্য নগদ সাহায্য কি আর করিবেন? তবে বলা যায় না। হাজার হউক সে বাপেরই ছেলে তো! বিমর্ষমুখে সে জবাব দিল,—আজ্ঞে দিতে ত হবে, তবে দিই কি করে? একে পয়সা নেই, তাতে

মেয়ের অঙ্গে বিধাতা একটু রূপও তো দেন নি। এ বিদেশে কেমন করেই বা বিকুবে!

ব্রজ কহিল, আমার হাতে কন্যা-সম্প্রদান করলে কি তোমার জাতে ঠেলা হবার ভয় আছে?

—অ্যাঁ!—আজ্ঞে?

—বলছি কি—আমায় মেয়ে দিলে তোমাকে লোকে একঘরে টরে করবে না তো? জানোই তো বাপু, আমি মোটেই শুদ্ধাচারী নই, অনাচার কদাচার যথেষ্ট করেছি। তা, সে ভয় যদি না থাকে তো, তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে আমি রাজী আছি।

এ রকম কথা কোটীপতি মনিবের মুখে শুনিলে, তাহারই অফিসের কুড়ি টাকা বেতনের কেরানীর মুখের হাঁ বুজিতে সময় লাগে কি না?—

ব্রজ বিলম্ব সহিতেছিল না। একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা এখনই চাই! লোকটার হতভম্ব ভাব দেখিয়া হাসিও পাইল, আবার রাগও ধরিল। স্বর একটু চড়াইয়া বলিল—দেরি করবার মতন অত সময় নেই! হ্যাঁ কি না, যাহোক একটা বলে দাও—মত থাকে তো পাঁজিখানা আনো; এক্ষনি আমি বিয়ের দিন ঠিক করে তবে ফিরে যাব!

আলোকনাথ এইবার কথা খুঁজিয়া পাইল—গরীব বলে আপনি আমায় তামাসা কল্লেন ছোট সাহেব! পেটের দায়ে মান অপমান রাখি নে বটে, কিন্তু স্ত্রী-কন্যে সম্বন্ধে—

—ভাল জ্বালা! কি এমন করলুম রে বাপু যে তুমি অতকথা শুনিয়ে নাকে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে? অপরাধের মধ্যে—তোমার যে মেয়ের রূপের জন্যে আর রূপোর জন্যে বিয়ে হচ্চে না, তাকেই না হয় দায়ে ঠেকে বিয়ে করতে চেয়েছি। না দাও স্পষ্ট বলে দিলেই হয়। কনে আমার জুটবেই।

—কি বলছেন আপনি? আমার সেই কালো মেয়ে?—আলোকনাথের চোখ দুইটা বাহির হইতে চাহিতেছিল! এও কি জগতে হয়? ভোজবাজী নয়ত? স্বপ্ন?—

ব্রজ হাসিয়া উঠিল; কহিল—হলোই বা কালো? কালো বলেই তো তোমার মেয়ে বিয়ে করতে চাইচি, তা না হলে অন্যত্র খুঁজতে যেতাম— তোমার কাছে আসতামই না। আমি কালোই চাই। তার মনে রূপের গরব থাকবে না। কালো আমায় কালো বলে তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। আমি যখন কালো হয়ে জন্মেছি, আমার পক্ষে কালোই ভাল।

আলোকনাথ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণে একটু কিছু যেন বুঝিয়াছে, এমনই সন্দেহ জন্মিতে লাগিল; কহিল—আচ্ছা, আমার মেয়ে দেখতে ইচ্ছে করেন, আমি তাকে আনচি। আপনি আমাদের অন্নদাতা প্রভু আপনার সাক্ষাতে বার হতে তার লজ্জা নেই। তবে কোথায়ই বা বসবেন? এই ভাঙ্গা বেঞ্চিটুকুই আমায় বৈঠকখানা। ভিতরে মোটে দুটি কুঠরি। তাও আবার—

—থাক থাক, আমি এইখানেই বসছি! মেয়ে দেখাবার দরকার ছিল না, কিন্তু দেখলে যদি তোমার মনে তৃপ্তি হয়, না হয় দেখাই যাক, কিন্তু দেরি করো না।

দেরি হইল না। রং-পাউডারের কৃত্রিমতা এ বাড়ীতে ছিলই না, আর থাকিলেও সেই অকৃত্রিম কালোর নিকট তাহারা পরাভবের লজ্জায় মাথা হেঁটই করিত। বাপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া মেয়েটি ব্রজর পাম্প-সু পরা পায়ের গোড়ায় গড় হইয়া প্রণাম করিল। সেদিন ব্রজ ধুতী পরিয়াই বাহির হইয়াছিল। সে মেয়েটির আপাদমস্তক একবার মাত্র পরীক্ষার দৃষ্টি হানিয়া পিতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল বেশ! তোমার নাম কি গো?—এ কথাটা অবশ্য মেয়েটিকেই বলা।

মেয়েটি ভূমিসংলগ্ন নেত্রে দাঁড়াইয়া রীতিমত গলদ্‌ঘর্ম হইতেছিল। প্রথমটা ভয়ে সঙ্কোচে উত্তর দিল না; পরক্ষণে পিতার হাতের ঈষৎ ঠেলায় মৃদুস্বরে কহিল—প্রিয়ম্বদা।

—বাঃ বাঃ ঠিক ঐ জিনিষটিই তো আমি চাচ্চি? তুমি লেখাপড়া কিছুই হয়ত জানো না, প্রিয়ম্বদা?

এবার প্রশ্নের উত্তরটা পরীক্ষার্থিনীর পক্ষে বড় সহজ। সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়াই জবাব দিল—না।

আরো ভাল! তোমার তো অমত নেই, হ্যাঁ হে আলোকনাথ? বেশ! আমি তাহলে কথাটা পাকা করবার জন্যে এক্ষনি কন্যা আশীর্বাদটা সেরেই যেতে চাই। সরে এসো তো প্রিয়ম্বদা! ধান-দূর্ব্বো আমি পকেটে করেই এনেছিলুম। আচ্ছা, তুমিও এই থেকে দুটো নিয়ে আমায় একটুখানি আশীর্ব্বাদ করে ফেলো না, আলোকনাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ খাসা হবে! আচ্ছা নমস্কার করছি তোমাকে উঁহু—আপনাকে। আর প্রিয়ম্বদা এই আংটিটি তুমি পরো, আর আশীর্বাদ করি যেন মিষ্টি নামটি জীবনে সার্থক করে তুলতে পারো।—তা হলে আমি চলি। এই মাসের ২৩শে ঐ যে দিনটা আছে না, ওই দিনটা ঠিক করবেন। দেরী করা আমি পছন্দ করি নে।

৩৪

অপর্ণা কিন্তু এতখানি সাহস করিতে পারিল না, আরও একটা কারণ ছিল। সে জানিত রান্না বন্ধ করিলে মায়ের পথ্যাদিও বন্ধ হইবে। ব্যবস্থা হইল সে রাঁধিয়া দিয়া চলিয়া আসিবে, বিহারী পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইবে। অর্পণা আনন্দে এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। রন্ধনে তার আলস্য নাই। পরিবেষণের ভয়েই রান্নাঘর তার পক্ষে যমালয়ে পরিণত হইয়াছে।

বৈকালে অর্পণা নিজের মনকে তৈরী করিয়াই নিচে নামিয়াছিল, মনে মনে বলিয়াছিল,—মা সবই জানতে পারেন। তাতে ওঁর কষ্ট হয়। যে যাই বলুক, এবার হতে সব সয়ে থাকব জবাবটিও করবো না। দেখি ওরা কি করে!

অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষেরই সন্ধিতে কাটিল! ক্ষ্যান্তমণি অপর্ণার দেখা পাইয়া একরাশি চুলের গুছি, সরু করিয়া বিনানো চুলের দড়ি এবং সবুজ ফিতা কাঠের চিরুণি রূপার পান কাঁটা গুঁজিকাঠি দিয়া বড় করিয়া খোঁপা

বাঁধাইয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে আন্দি বিন্দি কালিন্দি নাগবালা—ভাইঝি এবং ফুলগাঁয়ের বউ—বড়ভাজ কুমোরপাড়ার বউ—সেজভাজ—আর ইলিস-পোতার নতুন বৌ—সকলে এক একটি ফিরিঙ্গী-খোঁপার লোভে, কেহ চুলে বিনান চিটাপড়া দড়ি, কেহ রাঙা ঘুন্‌সি, কেহ বা পাটের থোপা দেওয়া কালো স্থতার মোটা হালি লইয়া উপস্থিত হইলেন। রান্না চড়াইয়া দিয়া মাঝখানের অবকাশের মধ্যে সে যথাসম্ভব সকলকেই খুশী করিল। বাকি রহিয়া গেল শুধু নিজের মাথাটাই—সেটা এখন নিত্যই বাকী পড়ে।

শুধু ত বসিয়া বসিয়া রান্না নয়, মসলা বাটা, কুটনো কোটা, চাল ধোয়া, ডাল বাছা এই সব রাঁধুনির কাজের আনুষঙ্গিক। এবেলা কি ভাবিয়া কর্ত্রী —অর্থাৎ গিন্নির মা—দিদিমা ঠাকুরাণী—ভাঁড়ার বাহির করিবার সময় পাশে দাঁড়াইয়া টিক্‌টিক্ করিতে করিতে জিনিসের পরিমাণ হ্রাস করাইতেছিলেন। কোটা কুটনা হইতেও তিনি এদিক ওদিক ঘুরিয়া দুমুঠা আনাজ একটা চুপড়িতে তুলিয়া রাখিলেন। অপর্ণা চাহিয়া দেখিল মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—অত অত রেঁধে ফেলাফেলি করা কেন? পয়সা লাগে না।—বিনাবাক্যে চালের ধুচুনি লইয়া অপর্ণা পুকুরঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

কোন কোন পল্লীগ্রামের বিধবাদের সহরের চাইতে খাওয়া দাওয়ার কড়াক্কড়ি বেশী। আবার কোথাও খুবই কম। সিদ্ধ চাউলের মুড়ি অধিক বয়স্কারা খান না, কাজেই তাঁদের রাত্রির আহার দুখানা শসা কলা শাঁক আলু একটু আখের গুড়। খেজুরে গুড় কেহ খান, কেহ খান না। পতিতপাবনী নিজের ঘরে বিচার আচার কিছু কিছু করিতেন, এখানে ঘৃতের প্রাচুর্য দেখিয়া লোভে পড়িয়া গেলেন। কন্যাকে বলিলেন—দেখ মা ক্ষান্ত! লুচি ত মা কখন খাই নি, তোমার কল্যাণে যদি হয়েছে, তা দুখান খেলে কেউ কথা কইবে কি? বলিস তো আজকের মতনই না হয় খাই?

ক্ষ্যান্তমণিরও এ বিষয়ে বেশ একটু লোভ ছিল। গালভরা হাসি হাসিলেন,—তা খাবে বই কি,—তা, খাবেই তো! তোমার জামাই জানো মা এ গাঁয়ের মধ্যে একজন মুচ্ছুদি না মোড়ল কি যে বলে, তাই। তা গরম

গরম লুচি ভাজতে বলো মা, 'বার্তাকীর' ভাজা দিয়ে আমরাও তোমার সঙ্গে দুখান পেসাদ পাবোখন।

মা বড় আনন্দে একটা পিতলের গামলায় হড় হড় করিয়া কতকগুলি ময়দা হাঁড়ি হইতে ঢালিয়া লইয়া একমুখ হাসিতে হাসিতে রান্নাঘরে ঢুকিলেন। অর্পণা সেই কতকক্ষণ ফুটন্ত জলে চালগুলি ঢালিয়া দিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতেছিল। মুখ বড় বিষণ্ণ, চাহনি উদ্বেগ ব্যাকুল।

মা-ঠাকুরাণী মাটিতে দুম্ করিয়া গামলাখানা নামাইয়া দরজার গোড়ায় দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িলেন, শোন গা মেয়ে, নাতনি ত বলতে পারি নে, আজ বাদে কাল যখন ব্যাটার বউ হবে, তাই ক্ষ্যান্তর ভাগনি হলেও তোমায় মেয়েই বলচি—মুচমুচে করে ময়ান দিয়ে এই ময়দা কটি মেখে বড় বড় ফুলো ফুলো করে খানকতক লুচি ভেজে দ্যাও দেখি নি। আমরা ক'মায়েঝিয়ে খাই। দেখো বাছা খুব যেন খাস্তা হয়, একটু বরং নুনের ছিটে দিও, ওতে আরও তার হবে, কি গো! ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতন নাপ পেড়ে দৌড় দিচ্চ কোথা? —বলি শোনই না, ও গো ও—

—এসে শুনচি,—বলিতে বলিতে অর্পণা প্রায় ছুটিয়া দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। সে সৌদামিনীর ঘর হইতে অনিবৃত্ত প্রবল কাশির শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল।

যখন ফিরিয়া আসিল, তখন আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর আলোয় দালানে বসিয়া একটা ছোট ধামিতে একধামি মুড়ি ও বাঁ-হাতে কাঁচা লঙ্কা লইয়া একপাল 'ডেরি ডামরি' ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে ক্ষ্যান্তমণি তার প্রবল জঠর জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিতেছিল। বধূরা ও বিধবা ছোট বোন তখন পুকুরঘাট হইতে ফিরিয়া আসে নাই। নিজের ঘরকন্নার কাজকর্ম বড় একটা ছিল না, ওসবের খোঁজ খবর লওয়ার পাঠ কাহারও নাই। বউমানুষের নাকি যখন তখন খাওয়াও রীতিসম্মত নয়, তারা দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইবে। কাজেই তাদের তাড়া কিসের? এক একখানা রংদার চূণের সাবানে গায়ের রং ফিরাইবার চেষ্টা দেখিতে সকলেই ব্যস্ত।

পতিতপাবনী জুতার কালীর কৌটায় রক্ষিত দোক্তাপোড়া ঠোঁটের মধ্যে টিপিয়া দিতে দিতে অপর্ণাকে দেখিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন—কি গো! তোমার কাণ্ডখানা কি শুনি! বলি রাঁধতে এসে তেড়ে তেড়ে ওপোর কোটায় দৌড়াদৌড়ি করা কেন?—আদিখ্যেতা আর কি!

অপর্ণা নিরুত্তরে ঘরে ঢুকিয়া ভাতের হাঁড়ির ভাত পরীক্ষা করিল। তখনও নামাইবার যোগ্য হয় নাই। কাঠগুলা পুড়িতে পুড়িতে চুলার গর্ত প্রায় ছাড়াইয়া আসিয়াছিল, সেগুলা ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া একখানা ঘুঁটে পাতিয়া চিমটা দ্বারা তাহার উপর আগুনের আংরা উঠাইতে লাগিল। মায়ের গায়ের তাপ সেই গনগনে আগুনের চেয়ে খুব বেশী কম নয়, এই কথা ভাবিতেই তার বুকটা ভাতের হাঁড়ির ফুটন্ত ভাতের মতই উর্ধ্বে উথলাইতে চাহিল। হা ভগবান! কি হইবে? মা তার এ অবস্থায় আর ক'টা দিনই বা থাকিতে পারিবেন? বুঝি সময় বড়ই সংক্ষেপ! অবস্থা ওবেলার চেয়ে এবেলা যেন মন্দ হইতেছে।

যাহারা না বকিয়া একদণ্ড থাকিতে পারে না, তারা অপর পক্ষের কথা কহা সহিতে না পারিলেও কথা না কহা আরও অসহ্য বোধ করে।

অপর্ণার নীরবতা পতিতপাবনীর ভাল লাগিল না। অমনি একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—হ্যাঁ গা, তুমি কেমনধারা বে-আক্কেলী ইল্লুত্তে মেয়ে বাছা! বুড়ো ধাড়ী শরীর একটু আক্কেলের নাম গন্ধ নেই? ঐ অচ্ছুত রোগ ঘেঁটে এসে সেই কাপড়ে কি না ছিষ্টি ছুঁয়ে নেপে এক করলে? অবাক্ করলে মা!

অপর্ণা কহিল—আমি কাপড় ছেড়ে এসেছি। দেখুন না, এ কাপড়খানা কোকিলপেড়ে, সেটার চুড়ি পাড় ছিল।

—ওমা এ যে জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ায় গো! কখন আবার কাপড় ছাড়লে? কাগ কি কোকিল জানি নি, এই কাপড়ই তুমি পরে ছিলে।

—এ কাপড় আমি সকালে পরেছিলুম।

—মিছে কথা বলো না বাছা!

অপর্ণার দুই চোখ আরক্ত হইয়া উঠিল—মিছে কথা বলা আমার অভ্যেস

নেই। জবাব দিয়া বিনা পরীক্ষায় ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া উনানে সশব্দে কড়া চাপাইয়া দিল।

—ও মা! ও কি গো! ও কি গো। আগে নুচি ভাজবে না? উনুন পেড়ে ফেল। হাঁ, হাঁ, তেল ঢালো কেন? ঘি দ্যাও—

ভাতের হাঁড়ি কাৎ করিয়া তেলের মধ্যে একসঙ্গে ফোড়ন ও আনাজগুলা ফেলিয়া দিয়া অপর্ণা খুন্তি দিয়া তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল—লুচির ময়দা হোক, ততক্ষণ কি উনোন কামাই যাবে?

—এতক্ষণ তো ময়দাটা মাখলেই হোত বাছা। তোমায় যেটি বলবো ঠিক তার উল্টোটি না করলেই যেন তোমার হয় না। ন্যাও, ওটা ফুটুক না, তুমি এইবার ময়দা কটি ভাল করে মাখ। অধর্মের ভোগ আর কাকে বলে।

—ময়দা আর কেউ মাখুক না, আমি মায়ের ঘরে ধুনো দিয়ে আসবো। —সে হাত ধুইয়া ঘুঁটের উপরকার আংরাগুলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া পতিতপাবনীর আর বরদাস্ত হইল না। ভীষণ ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলিয়া দাঁতে দাঁতে শব্দ করিয়া উঠিলেন,—বটে! বটে। বটে! বড় আস্পর্ধা যে দেখতে পাই! খ্যাংরা মেরে পিঠ ছিঁড়ে দোব—জানিস!

অপর্ণা চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিয়া গেল—খ্যাংরা আজকাল তোমাদের যত সস্তা হয়েছে মানুষের পিঠ এখনও ততটা হয় নি।

—ওলো খেমটানাচুনি! ওলো ভালখাকির বেটি! নাঃ, আমার ব্যাটার বউ শীগ্‌গির শীগ্‌গির হলে হয়, তাহলে দেখি তোকে একবার ভাল করে।

অপর্ণা তখন আরও খানিকদূরে চলিয়া গিয়াছে। পিছনে না ফিরিয়াই উত্তর করিল—তোমার ব্যাটার বউ মরণের পর যদি আবার জন্ম হয়, তখনও হব না, তা এ জন্মে কি!

আবার পিছনে দাঁতের কিড়িমিড়ি ও কণ্ঠ-বজ্রের হুহুঙ্কার শোনা গেল এবং উপরে সৌদামিনীর ঘর হইতেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আস্ফালন শোনা যাইতে লাগিল। পাশ ফিরিয়া শুইয়া সৌদামিনী ক্ষীণস্বরে কহিলেন—একটু তুই কথা না কয়ে থাকতে পারিস নে, অপি?

মায়ের এই সামান্য কথাটি অনেক বড় তিরস্কারের চাইতেও অপর্ণার মনকে বিদ্ধ করিল। মায়ের অন্তর্জ্বালা সে কি বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না? এমনই বা সে অধৈর্য হয় কেন? আঘাত সামলাইয়া অপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল—কিছু বলবো না তো ভাবি। ওরা যে আমায় চুপ করে থাকতে দেয় না মা।

—তুমিই যখন থেমে থাকতে পারো না, তা ওরা কি করে পারবে?

অপর্ণা লজ্জায় মরিয়া গিয়া চুপ করিয়া সহিবার সঙ্কল্প আবার দৃঢ় করিল। একটুখানি হাসি আসিয়া মনে পড়িল; এমন কত প্রতিজ্ঞাই সে তো কতবারই করিয়াছে এবং ভাঙ্গিয়াছে। না এবার আর নয়, এবার নিশ্চয়ই সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে, মারিতে আসিলেও কথাটি কহিবে না।

অপর্ণা সে রাত্রে নীচে নামিল না। বিহারী বাকী কাজ সারিতে গেলে মায়ে ঝিয়ে গায়ের ঝাল মিটাইয়া তাহাকেই সতেজে আক্রমণ করিলেন। মেয়েটি অবশ্য একটুখানি ঘোমটার সাহায্যে লজ্জা বাঁচাইয়া আসরে নামিয়াছিলেন। বিহারী এই নারী-রসনাস্ত্র সমস্তই নিঃশব্দে হজম করিল। কেবলমাত্র একবার বলিয়াছিল—ছেলেমানুষ।

গিন্নিমা ঠোঁটে চুক্‌চুক্ শব্দ করিয়া কহিলেন—মরিরে! ছেলেমানুষের বে জুটলে যে য়্যাদিনে সাতগণ্ডা বেটী ব্যাটা সাত দিকে ট্যাঁ ট্যাঁ করে ফিরতো—জোটে নি তাই না কচি খুকি সেজে বেড়াচ্ছেন! দুখানা গরম লুচি খাবো, তা শতেক খোয়ারী গতরখাকির গতরে সোঁ পোকা ধরলো, কিছুতেই ভেজে দিলে না!

মেয়ে বলিলেন—দেখছিস্ মা! বুড়ো সরকারটার সোহাগ দেখেছিস! ওদের এতটুকু বললে ওর গায়ে লেগে যেন এতখানি হয়ে ওঠে। তবু ওর মা ওকে মাস-মাইনে দিয়ে রাখতো, ত না জানি আরও কি হতো!

অবশ্য একথাগুলি তিনি নেপথ্যাভিনয়েই বলিয়াছিলেন, কিন্তু বিহারীর ইহাতে শ্রবণ সুখে বাধা পড়ে নাই সে কথা বলা বাহুল্য।

এমন করিয়া যে বেশি দিন যাইবে না সে কথা এ পক্ষের লোকেদের বুঝিতে বাকি ছিল না। সেইজন্যেই সৌদামিনী অপর্ণাকে বারংবার শান্ত করিতে

চাহিয়াছিলেন। তিনি যে-কটা দিন আছেন সে দিনকটিও ত অন্ততঃ এক-রকমে কাটিয়া যাক। তারপর বিহারী আছে সে যেমন পারিবে করিবে। তিনি ত দেখিতে আসিবেন না। কিন্তু এটুকুও যেন উত্তরোত্তর কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে।

সকালবেলা নীচে নামিয়া গোলা হাঁড়ি হাতে লইতেই, কোথা হইতে পতিত-পাবনী দুই চোখ রগড়াইয়া সম্মুখস্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—এই দেখ! মরেচে! উঠেই আজ কিনা তোমারই মুখ দেখলুম! রোজ আমার ক্যান্তর মুখটি দেখি, দিনটি আমার আয়ে-পয়ে কাটে। তা দেখ গা, তোমার মাকে বাছা নীচের একটা কোন ঘরে নাবিয়ে নে এসো। অমন ঘ্যাঁচড়া পড়া ছ্যাঁচড়া রোগ, আমার এই কচি বাচ্চার ঘর—বড্ড ছোঁয়া ন্যাপা হচ্ছে। তা ছাড়া আরও একটা কথা—আজ-বাদে কাল ও ত মরবেই সে ত বুঝতে পাচ্চো, আমাদের ওখানে বলে তেশূন্যের উপুর মিত্যু হলে তি-শিরে রাক্ষুসী হয়! তা বাড়ীতে একটা পেরেত নিয়ে বাস করতে হবে এ কেমন কথা? অধর্মের ভোগ আর কি! কোথা থেকে কি সম্পক্ক, আমার এ কাচ্ছাবাচ্চার ঘরে ঐ বিদকুটে রোগে কিনা মরতে এলো!

অপর্ণা সবেগে ঠোঁট খুলিয়াই সবলে তাহা রুদ্ধ করিয়া দাঁত দিয়া জিভের ডগাটা সজোরে কামড়াইয়া রহিল। অন্য কোন প্রকাশপথ না পাইয়া আজ নেত্রপথেই তার ভিতরের দহনজ্বালা দ্রাবকরূপে দেখা দিবার উপক্রম করিতেই হেঁটমুখে অস্পষ্টস্বরে কহিল—মা তো সিঁড়ি নামতে পারবেন না!

পতিতপাবনী তার মুখে এমন নরম স্বর প্রত্যাশাই করেন নাই। যৎ-পরোনাস্তি হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—তা হাতে ধরে ধরে তুমি আস্তে আস্তে নামিয়ে নিওখন। এতে তোমারও ভাল, উপুর নীচু দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না।

অপর্ণা খুবই রাগিতেছিল, কিন্তু সামলাইবার চেষ্টাও ছাড়ে নাই। নম্র-স্বরেই কহিল—একটু সামলাতে দিন; এখন নামাতে গেলে অসুখ আরও বেড়ে যাবে।

—বড় একরোখা মেয়ে তুমি বাছা! ও রক্ত-ওঠা রুগীকে আমি কোন মতেই ওপরের ঘরে মরতে দিতে পারি নে, তা যাই বল। যেমন করে পারো নামওগে যাও,—আমরা তার কি জানি? জন মিন্‌সেদের ডেকে ধরাধরি করিয়ে নামাও না—এমনি যদি নাই পারো!

অপর্ণা হস্তস্থিত গোবর-গোলার হাঁড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দুম্ দুম্ করিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—বেহারি-দা!

বিহারী বাড়ী ছিল না। কৃষ্ণধন একঝুড়ি দাঁত বাহির করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—সরকার মশাই বাড়ী নেই, হেঁ, হেঁ, আমি কি কিছু করবো?

অপর্ণা তাহাকে সঙ্কোচমাত্র না করিয়া হুকুমের সুরে বলিল -হ্যাঁ, বিহারী-দাকে শিগ গির করে ডেকে আনো।

বিহারী গিয়া কর্তার কাছে যথানিয়মিতরূপে এত্তালা করিল। বলিল—এতবড় অবিচারের আপনি কোন প্রতিকার করবেন না। দু দুটো অনাথা খামকা এই বাড়ীতে হত্যে হচ্চে। আপনি নিজে দেখে শুনেই এর উচিত মতন বিচার করবেন, এই আমি আপনাকে করযোড়ে অনুরোধ করচি।

কামাখ্যাচরণ বিহারীকে প্রথম হইতেই সুনজরে দেখেন নাই। এখন তাঁর সেই গর-পছন্দ বিদ্বেষের কাছেই পৌঁছিয়াছিল। বিহারী যে তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখে না, বরং অনধিকারী মনে করে ইহাও তাঁর অজ্ঞাত নয়। একথা তাঁর মনে বিলক্ষণ জাগিয়া আছে। তাহাকে অপদস্থ করিতে চাহিয়াই একটু-খানি ঔদাস্যের ফাঁকা হাসি মাত্র হাসিয়া উত্তর করিলেন—বাড়ীর মধ্যে মেয়েদের ভিতর কি হচ্চে না হচ্চে, তা নিয়ে তোমার মতন চাকর নফরের আলোচনা করাটা কি যুক্তিসঙ্গত বেহারি? মুনিবের ঘরের খবর চেপে থাকাই পুরনো চাকরের কর্তব্য, তা না করে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, তুমিই ওদের বেশি করে উস্কে দিচ্চো—এ স্বভাবটা তো তোমার ভালো নয়!

বিহারী ঈর্ষাদগ্ধ চিত্তের এই হীন অভিনয় বুঝিল। অবস্থা বুঝিয়া এ অপমানটারও খানিকটা পরিপাক করিয়া শুধু বলিল—আমি আপনার চাকর নই। এক পয়সা মাইনে আপনি আমায় এ পর্যন্ত দেন নি।

কামাখ্যাচরণ ক্রুর হাসি হাসিলেন—তা আমি না দিই, আমার ঠাকুর্দা মশাই ত দিতেন। সে এখন একই কথা—মোদ্দা—

বিহারী কহিল—আপনার ঠাকুর্দার আমি দাসানুদাস, দেবতা বলেই মনে করি, কিন্তু মাইনে করা চাকর আমি তাঁরও ছিলাম না। আগেকার সমস্ত খাতাই তো ঐ দপ্তর বাঁধা রয়েছে, একখানি একখানি করে পাতা উল্টে দেখবেন, কোথাও বেহারী চক্রবর্তীর মাইনের হিসাব খুঁজে পান কি না!—সে যাই হোক, স্বর্গীয় কর্তার দৌত্রীর উপর এ নির্যাতনের কোন প্রতিকার হবে কি হবে না, আমি এই কথাটি মাত্র আপনার কাছে জানতে চাই।

হারিয়া গেলে যে হারাইয়াছে তাহার উপর বড় বেশি রাগ হয়। কামাখ্যা ক্রোধে তাম্রবর্ণ হইয়া উত্তর করিলেন—তোমার এ যে বড্ডই বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্চি বেহারি! মন্দ রোগ, একপাশে নিজে হতেই সরে থাকা তাঁর উচিত ছিল, তা যখন নিজে নিজে সে আক্কেল করেন নি, কাজে কাজেই অপরে প্রাণের দায়ে করতে চাচ্চে, তাতে দোষটা এমন হয়েচে কি? হ্যাঁ তাই থাকতে হবে! আমার পাঁচটার ঘর!

বিহারী আর একবার শেষ চেষ্টা করিতে চাহিল, গরজ তো সত্য সত্য তাহারই। কহিল—নীচের ঘরে ও রোগী কতক্ষণ টিঁকবে? পাঁচটার মধ্যে উনিও ত আপনার একজন!

—না টেঁকে তার আমি কি করবো? একটা চালচুলো ছাড়া বিধবা কুটুম্বুর মেয়ের জন্যে কি আমার স্ব-পুরী একগাড় করতে বল তুমি?

—তবে এই কি শেষ কথা? ওঁকে এই মুমূর্ষু অবস্থায় টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নীচের সেঁতা ঘরটাতেই রাখাবেন?

—হ্যাঁ, ভাই। আমার মুখের এক কথা হ্যাঁ! আর অপর্ণার বিয়েটা তাহলে এই ২৪শেই দিয়ে দাও। কেষ্টাও বড্ড ব্যস্ত হয়েছে, এদিকে তোমরাও ত দেরি করতেও ইচ্ছুক ছিলে না। আবার উনিও যদি হঠাৎ মারা যান সেও একটা কথা—

বিহারী স্থিরদৃষ্টিতে প্রস্তাবকারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কিন্তু সচেষ্ট ধৈর্যের সহিত সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল—বর কোথায়?

কর্তাও ঠিক সেইভাবে ও সেই সুরেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন—বর তো ঘরেই রয়েচে। কেন, ঐ কেষ্টধন।

—ঐ হাড়-হাবাতে গুলিখোরটার হাতে দেওয়ার চাইতে ওকে আমি ত্রিবেণীর জলে ভাসিয়ে দোব, সেও ভাল।

—তবে তাই দিও। একটি কলসী ধার করে কিনে এনেও বরং বেঁধে দিও, নৈলে ভেসে উঠবে।

বিহারী সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া সৌদামিনীর ঘরে গেল। সৌদামিনী তার মুখ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—আবার কি হলো মামা?

বিহারী সেই জলদতুল্য গাম্ভীর্যের মধ্যে হইতে তাহারই বিদ্যুৎ-হাস্যের অম্লকল্প হাসি হাসিয়া কহিল—এ বাড়ীতে তোমার মায়ের স্থান হয় নি, মা! এ বাড়ীতে তোমারও শেষকালের দিন ক'টার জন্যে একটুখানি জায়গা হলো না। এ অভিশপ্ত বাড়ী। তুমি তোমার ছেলের কাছে চলো, আর কিছু না পারুক, সে তোমায় এখানের চেয়ে শান্তি দিতে পারবে।

৩৫

উপকথায় আছে: এক গৃহস্থের এক পোষা ভূত ছিল। গৃহস্থের সঙ্গে ভূতের এই সর্ত ছিল, যে গৃহস্থ তাহাকে চব্বিশঘণ্টা কাজে জুড়িয়া রাখিবেন; যদি সে মুহূর্তের অবসর পায়, তন্মুহূর্তে গৃহস্থের ঘাড় ভাঙ্গিবে। গৃহস্থটা নিজ বাড়ীর উঠানে খোঁটা গাড়িয়া সেই খোঁটা বাহিয়া রাত্রিদিন ওঠা নামার কাজ দিয়া—তাহাকে জব্দ এবং নিজেকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এ গল্পের অর্থ, গৃহস্থ শরীরী এবং ভূত দেহাশ্রিত মন। একমাত্র অজপা জপের সহিত প্রাণায়াম-অভ্যাসে মনরূপী ধ্বংসকারী ভূতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। মন

ক্ষণ-চঞ্চল, সে এক মুহূর্তও স্থির থাকিতে জানে না। ভাল কাজ না পাইলে সে দেহীকে কুকর্মে প্রবৃত্ত করিয়া উচ্ছন্ন যাওয়ায়। গল্পটি মাত্র কবি-কল্পনা নয়, সর্বসাধারণেরই ইহা সুপরীক্ষিত।

যে শরীরে বিষ ঢুকিয়াছে তাহাকে চিকিৎসকেরা ঘুরাইয়া নাড়াইয়া পিটাইয়া বিরেচক ঔষধ গিলাইয়া সজাগ রাখিতে চাহেন। বিছানা পাতিয়া শোয়ানোর ব্যবস্থা তাদের জন্য নয়।

নির্মলের আঘাত তাকে দুর্বল করিতে পারে; সেজন্য হয় ত বিশ্রাম আবশ্যকও ছিল, ভূতকে ওঠা নামার হুকুম দিতে গৃহস্থ হয়ত কাহিল বোধ করিতে পারেন; কিন্তু ভূত তার সর্ত ভাঙ্গিতে দিবে কেন? সে হয় কাজ, না হয় অকাজ একটা তো করিবে। ফাঁক পাইয়া নির্মলের মনটাও যেন ভূতের মতই তাহাকে পাইয়া বসিল! যাদের মনে গলদ আছে আবর্তনের পর আবর্তনের স্রোতে আবর্তিত হওয়াই তাদের বিধিলিপি। ভাগ্যে জেলখানা ও পাগলা গারদে খাটিবার ব্যবস্থা আছে!

ইরাবতীর বক্ষে সুবৃহৎ বজরা ইচ্ছাসুখে ভাসিয়া চলিয়াছিল। দুধারে তীরের রেখা সর্বত্র সমদৃশ্যমান নয়। কোথাও অকূল সমুদ্রের মত সীমাহীন শুভ্র সলিলরাশি। অন্য তীরে সবুজ রেখাও এত সূক্ষ্ম যেন মনে হয় সেটি ঐ সাদা শাড়ির সবজে ফিতার পাড়, প্রকৃতি দেবীর বুকের উপর স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। নদী বৃহৎ—কোথাও সুপ্রশস্ত কোথাও শীর্ণাঙ্গী। স্থানে স্থানে নামেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই অজ্ঞাত-কুলশীলা নিজের উৎপত্তির মতই রহস্যময়ী! তিব্বতের একটি চঞ্চলা বালিকা—'ঙাই' উচ্চব্রহ্মে মালি প্রভৃতি সখীসঙ্গিনী পরিবৃতা হইতে হইতে প্রায় সমস্ত ব্রহ্মরাজ্য অতিক্রমপূর্বক একাগ্র সাধনায় শক্তি সঞ্চয় করিতে করিতে পরিশেষে যোগৈশ্বর্যযুক্তা হইয়া বঙ্গোপসাগরের কণ্ঠলগ্না হইয়াছেন।

আরাকান পর্বতমালা অতিক্রম করিবার পর নদীর প্রশস্ততা লাভ হইয়াছিল। বহু স্থলে বর্ষাশেষেও স্থানে স্থানে বজরার গতি রুদ্ধ হইয়াছে। সেখানে নদীর প্রশস্ততা হয় ত পঞ্চাশ ষাট গজ মাত্র। আবার তার পরেই

৩০০।৪০০ গজ হইতে হইতে ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়াছে। এ যেন আকাশের বক্ষে চাঞ্চল্যময়ী বিদ্যুতের খেলা! এ যেন নৃত্যকুশলা নটীর নূপুরনিক্কণের তালে তালে নৃত্যলীলা প্রদর্শন! কোথাও সে নিজে অচলা সঙ্গীতের ভাব-প্রকাশক কলাসহ করাঙ্গুলী ও মৃণালবাহুর নর্তনলীলা চলিতেছে কোথাও ঋজু কুটিল ভঙ্গিভরে মঞ্জীরের মুখর রবে চরণ-যুগলের সঙ্কোচগতি। আবার কখন বর্ণের তরঙ্গে রূপের জ্যোতিতে দর্শকদলকে চমকিত করিয়া পেশোয়াজ ছড়াইয়া পাগোয়াজ মৃদঙ্গ চড়াইয়া দিয়া ঘূর্ণন! নিসর্গ শোভাও কোন স্থলে অনৈসর্গিক। কোথাও ধূর্জটীর ধূসর পিঙ্গল জটাজালের মত ধূম্রবর্ণ পর্বতের পার্শ্ব দিয়া শিবললাটস্থিত শশিকলার ন্যায় প্রথম শরতের নির্মল চন্দ্রখণ্ড হাসিয়া উঠে। জটাভারচুম্বিত জাহ্নবী তরঙ্গের মতই নদীজল পর্বতের নিম্ন দিয়া কল-কল কুলু কুলু রবে বহিয়া যায়। কোনখানে সূর্য-জ্যোতি প্রজ্বলিত শুভ্রালোকে সুশুভ্র পাষাণ শিবলিঙ্গে সবুজপত্র পার্বত্য বন্যকুসুম ও শ্যামদূর্বাদলের অর্ঘ্য দিয়া জলের ধারা দিতে দিতে ভক্তিমতী প্রকৃতিবালা তরঙ্গের সুরে, পাখীর গানে, বাতাসের হিল্লোল-মর্মরে বিশ্বনাথের স্তুতি গাহিয়া বর মাগিতেছেন। মধ্যাহ্নের কনক-চূর্ণ ক্ষেপে নদী জল গলিত স্বর্ণের রূপ ধরে, জনপদবাসী বর্মী নারী-পুরুষ জলে দাঁড়াইয়া কৌতুক ভরে বজরার দিকে চাহিয়া থাকে। তীরের কাছে সন্ধ্যা সকালে তরী ভিড়াইয়া রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা চলে। সেই সময় নির্মল নগর গ্রাম বা নির্জন বনে বেড়াইয়া আসে। সে সব গ্রাম, সহর বা বন সবই নির্মলের নিকট সম্পূর্ণ অজানা। কল্পনায়ও কোন দিন তার কাছে এদের পরিচয় ছিল না। বনে কত অচেনা গাছ। কত যুগের বৃক্ষ-সমাজের গোষ্ঠীপতি, সমাজপতিকে সে দেখিয়া আসে! কতই না অচেনা ফুলের ও পাখীর সহিত পরিচয় হয়। কতবার তার পদশব্দে চকিত হইয়া তরুণী বন-সুন্দরীরা বারেক চকিত কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিয়াই ঘন নিবিড় পত্রান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই চোখের ছবি যেন আর কোন ছায়াচিত্র মনের ভিতর ফুটাইয়া তোলে ; সেও আজ অমনি করিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে বহুদূরেই চলিয়া গিয়াছে, ইহাদেরই মত সেও আজ তাহাকে এতটুকু বিশ্বাসের দৃষ্টিতে

দেখে না। এই কথা স্মরণে আসিতেই প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য কয়লার খনির মত কালো হইয়া উঠে, একটা অকরুণ তীব্র বেদনা দুই হাতে পাঁজরাগুলা মড়মড়িয়া গুঁড়াইয়া দেয়। তাহারা তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—শুধু এ কথাটি যদি কেহ তাহাকে জানাইতে পারিত! ঘৃণ্য স্মৃতির মধ্যে কাঁটার মত ফুটিয়া থাকার পরিবর্তে চিরদিনের মত মুছিয়া যাওয়াই তার আজ একমাত্র কামনা।

তার নিজের মনে যে ব্যথাটা একটা জোড়-লাগান ভাঙ্গা হাড়ের মতই খট্ খট্ করিতেছিল, কাজে ডুবিয়া থাকিয়াও তো এতদিনেও সেটুকু চাপল্য গেল না, অন্যেরই বা জোড় না লাগার ব্যথা অবসান হইয়া গিয়াছে, এমন ধারণা কিসে করিবে? কর্মহীন অবসরের ফাঁকে চিন্তা-সায়রে সে যেন তলাইয়া যাইতেছে, অথচ এ তার স্বেচ্ছাপরাধ নয়! এ অবস্থা হইতে বাঁচিয়া, ভাসিয়া থাকিবার দিকেই সমস্ত শক্তি সে প্রয়োগ করিয়াছে, প্রশ্রয় দেয় নাই। মনকে জবরদস্তি করিয়া বুঝাইয়াছে, অপর্ণা নিশ্চয় সুখে আছে! বিধাতা তাকে চির দুঃখী করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই, সে নিশ্চয়ই সুখে আছে, আর মেয়েকে সুখী দেখিয়া সৌদামিনীও তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। সে সুখে থাক চিরসুখী হোক সে।

এ সান্ত্বনা মনকে কিন্তু শান্তি দিতে পারে না। সে সুখী হইয়াছে সে ভালই হইয়াছে; তার সুখশান্তি অটুট থাক; কিন্তু সে যে তাঁদের চক্ষে চিরকলঙ্ক হইয়া রহিল, সে কালি যে সপ্তসমুদ্রের জলেও ধুইবে না!

আর ধীরা? মানুষ যে চোখ দিয়া সত্যকার দেখা দেখে, তাহা কপালের নীচেকার কালো তারা দেওয়া, কৃষ্ণপক্ষে ঢাকা বাহিরের এই দুটা চোখই না। —এ চোখ দিয়া বস্তুর প্রতিবিম্ব মনোদর্পণে বিম্বিত করিয়া দেয়। ঋষি কল্পনায় যিনি ত্রিকালজ্ঞ তিনি ত্রিলোচন এবং যে আনাদ্যা প্রকৃতি তাঁর নিত্যসঙ্গিনী, তিনিও ত্রিলোচনা। ধীরার সেই তৃতীয়নেত্র—সেই জ্ঞানচক্ষু বড় সহসাই খুলিয়া গিয়াছিল!

যে 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকা' দ্বারা ধীরার এই নব-নেত্র উন্মীলিত হইয়াছিল, উহ

প্রেম, আর সেই মন্ত্রের ঋষি পাতিব্রত্য ধর্ম। অনেক জিনিষ ছোট হইতে একটু একটু করিয়া মায়ের কোলে শিশুর মত চন্দ্রাকলাবৎ বর্ধিত হয়। আবার কিছু কিছু সূর্যের মত একেবারে জ্যোতির্মণ্ডল-মধ্যবর্তী হইয়াই দেখা দেয়। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের উপমা শুধু সৃষ্টিকর্তার করুণার অমৃতময় মাতৃস্নেহ, আর এই দাবানলসদৃশ সতীপ্রেম এক নয়। স্বামীর চিতাগ্নিতে আগুনে পুড়াইয়া নিজেকে যাহা ভস্ম করে সে সর্বসংহা মাতৃহৃদয় নহে। চাঁদ সূর্য এক নয়। যার গতি মৃদু স্থায়িত্বও তার বেশী। বন্যার বেগে উচ্ছ্বসিত জল বাড়ীর উঠানকে পুকুরে পরিণত করে, রাজপথে নৌকা চালায়, ঘর ভাসাইয়া, সন্তান খাইয়া নিজে ঘোলা হইয়া ফিরিয়া যায়।

ধীরার মধ্যেও প্রসুপ্ত নারীপ্রেম অমনি উচ্ছ্বাসের বন্যায় দুকূল ছাপাইয়া জাগিয়াছিল। তার ঘুমন্ত জগৎ প্রভাত মার্তণ্ডের অরুণ আলোয় যখন জাগিল, ত্রস্ত হইয়া ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আলস্যের জড়তা মুছিয়া ফেলিয়া জাগিল। তার অন্ধ জীবনের অতলস্পর্শ অন্ধকার ভেদ করিয়া সৃষ্টির প্রথম কালের মতই স্বামীর প্রতি যে ভালবাসা ভাস্বর হইয়া দেখা দিল, তার সহস্র শিখার অগ্নিময় উজ্জ্বলতায় তাহাকে জ্যোতির্মণ্ডিত করিল। পর্বত-পাষাণরুদ্ধ হৃদয়-ধারাটুকু দেখিতে দেখিতে কোন স্রোতস্বতীর ফেনোচ্ছল বন্যাজলের জোগান পাইয়া হুহু করিয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহাতে কি উন্মাদ তরঙ্গ, কি প্রচণ্ড আবেগ, কত বড় উন্মত্ত ক্ষুধা! সে লইয়া আর সে কি নিজের ছোট গণ্ডীর মধ্যে আটকাইয়া থাকিতে পারে? যতখানি অন্ধকারের কালো ছিল, তার সমান তৌলে আলোর আভায় ভিতরটা যেন ততখানি রাঙিয়া উঠিল। সে আলোর বর্ণ, ইন্দ্রধনুর সমুদয় বর্ণচ্ছয়টা রং করা। ইহারই খানিকটা দেহের পরেও নূতন সৌন্দর্যের-বাতি জ্বালিয়া দিল। যেন শরতের অভ্যুদয়ের আকাশে মেঘের কালি ধুইয়া ফেলা উজ্জ্বল শুকতারাটির মতই তার শরীর মন আলোক-পুলকে ঝলসিত লাগিল।

ধীরা আর সে ধীরা নাই! কেহ শিখাইয়া না দিলেও সে নিজ চিন্তাধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছেই শিখিয়াছিল স্বামী তার একান্ত আপন। সর্বস্ব দিয়া সে তাই

তাঁর পূজার অর্ঘ্য রচনা করিল; হৃদয়মনের ঐকান্তিক ভক্তি প্রীতি প্রেম একত্র করিয়া সেটি তাঁর চরণে উজাড় করিয়া দিল। দিবার বেলায় কোন সঙ্কোচ করিল না বা দিতে কিছু বাকি রাখিল না।

কিন্তু, ওরে ও অবোধ! শুধু দিতে পারলে তো হয় না রে! নিতেও যে জানা চাই! যা দিবে তা ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া দাও; না হয় যেমন যেমন দিতে থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে নগদ দামও চাহিয়া লও। চাহিয়া যদি না পাও—পাইবার জন্য খাতককে তাগিদ দিতে ভুলিও না। মনের মধ্যে ফিরিয়া পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফেনিল বাসনায় ফেনাইয়া উঠিতেছে; অথচ মুখ বুজিয়া দুহাতে দিয়া যাইতেছে—জান না তো বাসুদেব অনেক বিবেচনা করিয়াই কামনা বর্জনের মন্ত্র দান করিয়াছিলেন। কামনা করিলেই কাম্যবস্তু পাওয়া যায়, এমন নিয়ম প্রকৃতির আইনে নাই। কিন্তু তা বলিলে কি হয়, পৃথিবীর নিজেরও তো একটা নিয়ম আছে, কামনার তীব্র মদিরা বড় মিঠা। যদি না বাসনা মদিরার আস্বাদ পাইত এই কঠিন, কর্কশ, পেষণের মধ্যে মানুষ কি বাঁচিয়া থাকিতে পারিত? কল্পনাই মাটি পাথরের রাজ্যে আকাশ কুসুমের স্বর্গোদ্যান রচনা করায়। ধীরাও রক্তমাংসে গড়া এই পঞ্চভূতাত্মক বিশ্বরাজ্যেরই একটি ক্ষুদ্র প্রজা, এই বাসনা কামনার পাকে পাকে ঘেরা পৃথিবীরই একটি ক্ষুদ্রা মানবী, সেও যা দিল, কামনা রাখিয়াই দিল। সে কামনা মোক্ষের নয়; স্বর্গের নয়; শুধু যাহাকে সর্বস্ব দিতেছে, তাহার নিকট হইতে একটুখানি ফিরাইয়া পাওয়ার, তা সে যত কম হোক ক্ষতি ছিল না, হিসাব জ্ঞান তার প্রখর নয়।

কিন্তু ঐখানেই বিপদ। মানুষ নিজের বেলায় যাই করুক, পরের বেলায় কর্তব্য বুদ্ধি বড় সজাগ। পর হিতার্থে যা দিয়েছ, ওর জন্য কি আর দাম লইবে? মা ফলেষু কদাচন—এ যে ভগবানের বাণী!

নির্মল ঠিক এই কথাটিই যে মনে করিত, এত বড় অবিচার করি না। কিন্তু খানিকটা কাজ মানুষ জানিয়া বুঝিয়া করে, আর কতকটা প্রকৃতি তাকে না জানাইয়াও করাইয়া লয়। ধীরা যে তাহাকে দান করিতেছে, এ বার্তা তার

অজ্ঞাত নয়; কিন্তু সে যে কতখানি আর কি হিসাবে, সেই দিকেই সে দৃষ্টি রাখে নাই। তাই ধীরা যে পৌরাণিক যুগের দান-বীর রাজাদের মতই দিতে দিতে সর্বস্বান্ত হইয়া মৃত্তিকার জলপাত্র, এ মাটির দেহখানা মাত্র শুধু সম্বল করিয়াছে, বলির ন্যায় স্বর্গ মর্ত্য বাঁধা দিয়াও দানের পুণ্যসঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা সে জানিল না। দুহাত ভরা দান গ্রহণ করিল, ধন্যবাদ দিল, ধন্য হইল না।

৩৬

নির্মল যে তাকে কম দেয় না ধীরাও তা বোঝে। সে তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বদাই সন্ত্রস্ত। 'ঐ ঠাণ্ডা বাতাস বহিল, ঝি গরম কাপড়টা দাও', 'এ কি! ধীরা এখনও তুমি ঘুমাও নাই? অসুখ করে নি তো? ওডিকলন না কি মেন্‌থল দিয়ে দিই?' 'এসো ছাতে যাই, বড় সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে আকাশটা আজ কি সুন্দর!'—'আঃ, না,—না, একটা বই পড়ে শোনাই গে।' এমন কত রকমেই তার প্রতি সর্বদাই তার করুণা, প্রীতি, স্নেহ ব্যক্ত হয়। ধীরা জানিতে পারে, তার খাওয়া না হইলে নির্মল খায় না। ধীরা বজরার বড় কামরার ভাল খাটে শুইলে দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও বিছানায় পাখা আছে কিনা, জানালার পাখী টানা আছে কি নাই পরীক্ষা করিয়া -তবে পাশের ছোট কামরায় নির্মল শুইতে যায়!

এরও পর কেমন করিয়া বলা চলে, সে তাকে ভালবাসে না? এত বেশী যত্ন সে পায় যে সেই লজ্জায় এই নিরুপায়া মেয়ের যেন মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কেহ শিখাইয়া না দিলেও সে বুঝিয়াছিল, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা ঠিক এই রকম নয়। দৃষ্টান্ত সে চোখ দিয়া দেখে নাই; কিন্তু পিতার নিকট স্বদেশী, বিদেশী, অনেক সতী-পতিব্রতাদের পুণ্যকাহিনী শুনিয়াছে তাঁরা যে তাঁদের স্বামীর পোষা ময়না অথবা 'গুরুপুত্র' গোছ ছিলেন না, তা তর্ক তুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রমাণ হইয়া যায়। ক্ষমার মার কাছে নিজের মায়ের যে পরিচয়টুকু

সে পাইয়াছিল সেও তো সেবা-কুশলা সতী নারীরই একটি পবিত্র সংযত চিত্র। মা তার বাবার জন্য নিজের হাতে দুটি একটি ব্যঞ্জন রাঁধিতেন, ভাতগুলি রূপার থালায় নিজেই বাড়িয়া দিতেন; শ্বেত পাথরের রেকাবে স্বহস্তে তাঁর পছন্দমত জলখাবার সাজাইয়া, হাতের তৈরী আসন পাতিয়া কাছে বসিয়া সযত্নে তাহা খাওয়াইতেন। বাবা আপত্তি করিলে বলিতেন - দেখ, এগার বছর বয়স হতে এই কাজটি করে এসেছি, সেই পুণ্যে আজ আমার কলাপাতা সোণা-রূপোর থালা হয়েছে, তুমি মানা করো না। এই করতে করতে যেন মরতে পারি এই আশীর্বাদই করো।

শুনিয়া ধীরা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, তার পর হইতে কতবারই তার মনে হইয়াছে, সে যদি মায়ের মত দেখিতে পাইত, তবে সেও অমনি সব করিত, ঐ কথাগুলিকেই নিজের করিয়া লইয়াই বলিত। কিন্তু হায়, সে যে দেখিতে পায় না, সে জানে না, নির্মল কি খায়, কি খাইতে ভালবাসে। সে জানে না, কেমন করিয়া খাবার তৈরী করিতে হয়! কেমন করিয়া তাহা সাজাইতে হয়! কাছে বসিয়া খাওয়াইয়া যে চক্ষু সার্থক করিবে সে শক্তিও তার নাই।

তাই নির্মল নিজ মনের অপরাধে পাছে ইহার প্রতি ভুলিয়াও কোন ত্রুটি হয় সেই ভয়ে সমধিক আগ্রহে তার প্রতি যত্নশীলতা বর্দ্ধিত করে, ধীরা কিন্তু ততই বেশী ব্যথা পায়। সে বুঝিতে পারে, অন্ধ বলিয়াই নির্মল তাকে এমন করিয়া স্নেহের সেবায় ভুলাইয়া রাখে, ইহা প্রেম নয়।

এই কথা ভাবিতে দারুন অভিমানে বুক তার পিষিয়া যায়, হইলই বা সে অন্ধ! অন্ধকে কি শুধু দয়াই করিতে হয়, তাকে ভালবাসা কি এত কঠিন? বিদ্যুদুজ্জ্বল আলোক শিখার ন্যায় তেজে পুণ্যে অগ্নিময় সতীপ্রেম তৃষিত বক্ষ পঞ্জরে জ্বালাইয়া আর একটি হৃদয়-মণ্ডপের বাতিগুলি সেই আগুনে জ্বালাইয়া তুলিবার জন্য সে যে এই একান্ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, এর চেয়ে কোন চক্ষুমানের চক্ষুর্জ্যোতি অধিকতর আলো দিতে পারে? কেন সে তাহাকে, তার স্ত্রী, তার সুখ-দুঃখের নিত্য-সঙ্গিনী বলিয়া, হাতে ধরিয়া তার রন্ধন চুল্লীপার্শ্বে বরণ করিয়া লইবে না? কেন তাহাকে পূজার দেবী করিয়া মণ্ডপে খাড়া রাখিবে?

কেন,—কেন, কেন? সবার ভাগ্যে যা হয়, তার ভাগ্যে তাহা ঘটিবে না কেন? ভিতরে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা গর্জিয়া উঠে! ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ন চিত্ত ঘাড় বাঁকাইয়া বলে—কেন আমি দূরে থাকিব? যা সীতা, সাবিত্রী, সতী, আমার মা পাইয়াছেন, আমি কেন তা পাইব না? কি আমি করিয়াছি, আমার কি অপরাধ?

কিন্তু কেন,—কেন, কেন? কেনই বা সে পাইবে? দুঃখের বন্যা বক্ষের পরে আছাড় খাইয়া বলে, কেন তুমি পাইবে? তুমি যে অন্ধ! তাঁরা তাঁদের স্বামীর স্ত্রী ছিলেন, সচিব ছিলেন, সখী ছিলেন, তুমি কি গো! এর কোনটা তুমি? স্বামী কেমন, কি রকম তাঁর আকার, কেমন তাঁর দেহবর্ণ, মুখশ্রী কিরূপ? চক্ষু ভরিয়া দেখিবার জন্য ফাটিয়া মরিতেছ—তাই পারিলে না, কিসের জোরে অতবড় পদটার দাবী কর? তুমি তাঁর ভাত বাড়িতে পারিবে? হাত ধরিয়া কেহ লইয়া না গেলে তাঁর ঘরে গিয়া আপনি তাঁর রোগের সেবা করা তোমার পক্ষে সম্ভব? --এই যে তাঁর সঙ্গে তীরে উঠিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতে চান তাঁহাকে বিব্রত করার লজ্জায় তুমি যাও না কেন গো! কেন, যাও না, যাও সাবিত্রীর মত কাঠের বোঝাটা দরকার হইলে স্বামীর নিকট হইতে লইয়া বহিতে পারিবে তো?

ওরে লোভী! তুই যে অন্ধ রে! অন্ধ, অন্ধ, অন্ধ কি এই আলোকময়ী ধরণীর জীব? না তো, সে অন্ধকার রাজ্যের পথভ্রষ্ট পথিক মাত্র, আঁধারের নিকৃষ্ট কীটাণু! এখানে তোর কেহ নাই তুইও এদের কারো নহিস, শুধু সেই একজন, সেই একজন মাত্র তোর ছিল, যাঁকে সর্বশরীর দিয়া নিঃসঙ্কোচ অধিকারে তুই আপন বলিয়া অনুভব করিতে পারিতিস। যাঁর উত্তপ্ত স্নেহের দৃঢ়বদ্ধ বাহুপাশে তোর ঐ ক্ষুদ্র শরীর পুলক কণ্টকিত করিতে দুর্বল, ছোটহাতে নিজ বক্ষে আলিঙ্গন করিতে তোর বাধিত না! এই যে ক্বচিৎ সংযত স্পর্শ, ওরে নিঃস্ব ফকির! আজ তোর সম্বল এর মলয়-লঘু দৈবাৎ-স্পর্শই তোর সারা অঙ্গের সঞ্চিত রক্তে পুলকের ঢেউ তোলে, সেই রক্ত-রাঙা ঢেউয়ের তালে তালে রঙিন আলোর আবীর-মাখা রাঙা হাওয়া চারিদিককে রাঙাইয়া দেয়, কিন্তু

কেন তখনকার অতি প্রাপ্তির দিনেও যে প্রগাঢ় আলিঙ্গনের বিনিময় দিতে দ্বিধা ছিল না, তৃষা-শুষ্কচিত্ত তোর নিজেই অতৃপ্ত বাসনার প্রতিরোধ করিতে নিজেকে পাগল করে কি জন্য, সবাই যা পারে তুই তো তা পারিস নে! কেমন করিয়া পারিবি? তুই যে অন্ধ! মনে কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তাড়নায় তোষামোদে কেন তাদের বিদায় দিস? মুখের কথা, হাতের ছোঁয়া, পায়ের শব্দ তোর বুকের মধ্যে ফুলের মত ফুটিয়া ওঠে, জলের মত শীতল হইয়া বহিয়া যায়, ফলের মত সরস হইয়া পাকিয়া থাকে; তবে তার গায়ের গন্ধ ঘ্রাণে আসিলে বোবা হইয়া যাস কেন? মুখে কথা যোগায় না কেন? দাবী আসে না কেন? মনে তোর জোর করিবার মত জোর কই? রাত্রে সে যখন তোকে করুণায় গলাইয়া যত্নে ভরাইয়া চলিয়া যায় কত রাত্রি অনাথার মত পড়িয়া পড়িয়া, প্রার্থিতের সুপ্তি-শান্ত নিশ্বাসের সমতাল উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে শুনিতে অভিমানে কেন চোখে জলও আসে না? ডাকিয়া, জাগাইয়া, স্বাধিকার গ্রহণে কি জন্য দ্বিধা, কিসের সঙ্কোচ? কেনই বা স্বভাবদত্ত বিবিদত্ত, মানবদত্ত স্থান হইতে হৃদয়জাত ভীরুতায় দূরে সরিয়া থাকিস? জোর করিয়াই তো লইতে পারিস, কেন সে জোর তোর মধ্যে নাই?

কেন? তুই যে অন্ধ! সে আলোর, তুই অন্ধকারের! সে তোকে স্নেহ করিতে, দয়া করিতে, এমন কি ভালবাসিতে পারে; তুই তাকে শ্রদ্ধা করিতে, ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে, সেই ভালবাসার পায়ে আত্ম বিসর্জন দিতেও পারিস, তবু দুজনে দুজনকে আপন করিতে পারিস না।

অব্যক্ত বিষাদের আঁধারের নিবিড়তা অসহনীয় করিয়া নবোন্মেষিত হৃদয়-পদ্ম সঙ্কোচে মুদিয়া আসে। তবে—কেন দিলে? যদি এই অন্ধকারের অন্ধ-প্রেম চক্ষুষ্মানের যোগ্যই নয়, তবে বৃথা ইহাকে জন্ম দিবার কি প্রয়োজন ছিল? এই যে পূজার জন্য ব্যাকুলতা, এ কি নিজে পূজার অঞ্জলি লইয়া শান্ত হয়? যদি জগতের মধ্যের বড় পাওনাটাই তাকে না দিবারই ইচ্ছা ছিল, তবে তাকে মানবদেহ ত না দিলেই পারিতে? পাষাণ মূর্তির মতই দৃষ্টিহীনা, পাষাণী করিয়া সৃজন করিলে মানব জগত তো কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। যে

মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে, কেবল মানব-সুলভ একটি জিনিষ নাই বলিয়াই সে কেমন করিয়া আশা তৃষ্ণাভরা এই পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রা মানবী না হইয়া—দেবী হইয়া উঠিবে? ভগবান! ওগো তুমি একি করিলে? কিসের জন্য তাহাকে এখানে পাঠাইলে? আর সবই যদি দিলে, তবে এত বড় বঞ্চনা করিয়া দিলে কেন? তার চোখের সামনে আকাশে কত বাহার খোলে, শুধু পৃথিবীর নয় গোটা সৌরজগত আলোয় আলোকিত, সেই আলো তার চোখের সম্মুখে উদয়াস্ত জ্বলিতেছে, সে তার তীব্র তাপ অনুভব করে; কিন্তু এত বড় জ্যোতিষ্মানও তার কাছে একটা ঘনীভূত অন্ধকার।

শুনিয়াছে, সূর্যাস্তের পরও পৃথিবী তমসায় ভরিয়া উঠে না; তখন পৃথিবীর আকাশে চাঁদ উঠে। সেও আলো দেয়, বড় স্নিগ্ধ, বড় সুন্দর সে আলো! সূর্য-চন্দ্রের ছেলেমেয়েদের মত নক্ষত্রগুলিও নাকি আলোময়! এর উপরেও মানুষ আলো জ্বালে! শুধু ধীরার বিশ্বেই প্রভাত নাই, সন্ধ্যা নাই, সূর্যোদয় হয় না, চাঁদ উঠে না, নক্ষত্র জ্বলে না, সেখানে প্রলয়ের অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার অফুরন্ত মহানিশা।

ওগো দাও, বারেক দেখিতে দাও, এ কার জন্য এমন করিয়া সর্বস্বান্ত হইলাম! কাহাকে জীবনের দেবতা করিলাম! কাহাকে এত কাছে পাইয়াও এতটুকু আপন করিতে পাইলাম না! দেখাও দেখাও! একবার, একদণ্ড, একপল—আরও কম—আরও অল্প—তবু দেখাও! এত বড় বঞ্চনা করিও না।

৩৭

রজতাম্বরা নিশীথিনী নক্ষত্রভূষণে বিভূষিতা। শুনা যায় মহতেরা নিজে ভোগ করিয়াই তৃপ্ত হন না। তাই উদার আকাশ বক্ষভূষণ তারা-হার নিম্নে নদীবক্ষে পরাইয়া দিয়া তাহার বাত্যান্দোলনহীন বীচিবিক্ষেপ পরিশূন্য স্থির সলিলরাশিকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। আকাশে তারাফুল, নদীর জলে নক্ষত্রমালা। বনাকীর্ণ তটভূমেও জ্বলন্ত খদ্যোত জ্যোতির্বিন্দুবৎ রসাল। বিশ্ব-মণ্ডলে উল্কাক্রীড়া চলিতেছে।

বজরার ছাদে শয্যাতলে অর্ধশায়িতা ধীরা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল, প্রস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল নির্মল। নির্মল বংশী-বাদনে বিশেষ নিপুণ না হইলেও অজ্ঞ নহে। বাঁশী তার কাছে বড় মন্দ বাজে না। কলিকাতায় থাকিতে সখের কনসার্ট পার্টির পাল্লায় পড়িয়া এই বাজনাটা শিখিয়াছিল, এখানে একটা বাঁশী কিনিয়াছে, বাজাইবার সুযোগ পায় নাই। এবার সেটা সঙ্গে আনিয়াছিল। ইহাতে খানিক সময় কাটে, আর সে বুঝিয়াছিল ধীরা তার বাজনা শুনিতে ভালবাসে—সম্ভবতঃ সকল অন্ধই গীতবাদ্যপ্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু কথা এই, মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবটা প্রবল থাকে সৃষ্টির মধ্যেও সেই ভাবই অভিব্যক্ত হয়, দুঃখে যে পুড়িয়া মরিতেছে—সে অন্যের জন্য আনন্দের সৃষ্টি করিবে কি দিয়া? সৃষ্টির উপাদানই যে তার দুঃখার্ত! উপাদানের গুণ সৃষ্ট পদার্থে সংক্রমিত না হইয়া—এক পদার্থ অন্য গুণশালী হয় কি? মৃৎ-কলস মৃত্তিকা-গুণযুক্ত না হইয়া সুবর্ণ হইবে কেমন করিয়া? নির্মলের উদ্দেশ্য পত্নীর মনোরঞ্জন করা; কিন্তু সে আপন মনে বাজাইয়া চলিয়াছে, অশ্রুপুঞ্জসৃজনকারী দুঃখবিগলিত হতাশারই সুর!

ধীরার মর্মে এই সুরের রোদন—একটা সান্ত্বনাহীন আশাপরিশূন্য করুণ ক্রন্দনের মতই কাঁদিয়া কাঁদিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। নদীজলের মত স্বচ্ছ, তেমনিই নিস্তরঙ্গ দুটি মেঘচ্ছায়াবিভাষিত নীলনেত্রে পত্রানুগামী সলিল-বিন্দু টলটলায়মান হইয়া রহিয়াছে—যেন একটু নাড়া পাইলেই পড়ে! বর্ষার জলে শীর্ণ স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবনী হইয়া উঠিয়াছে। তাই সে উচ্ছলিত সলিল-তরঙ্গ—সামান্য বায়ু বহিলে শুধু আন্দোলন-চঞ্চলই হয় না, তরঙ্গে তরঙ্গে তট প্রহত করিতে থাকে। মন্ত্রবশীভূতা সর্পিণীর ন্যায় কি মুগ্ধ চিত্তে শ্রবণাশ্রয়ী হইয়া সে বংশীরব শ্রবণ করে। শুনিতে শুনিতে কান্নার বেগে ফুলিতে থাকে। গঙ্গোত্রীর ন্যায় প্রবল অশ্রুপ্রবাহের দুরন্ত নির্ঝর অপহৃত শক্তি দর্শনেন্দ্রিয়কে বিদীর্ণ করিয়া বহির্মুখী হয়;—তথাপি এই সুরের নেশায় সে আকৃষ্ট-অভিভূত না হইয়া পারে না। মনে হয়,—যেন তার অতৃপ্ত তৃষ্ণা—বাঁশীর সুরে মূর্তরূপ ধরিয়াছে।

বাঁশী বাজিয়া চলিল। ক্ষণস্থায়ী চন্দ্র জ্যোৎস্নাজাল সংবরণ করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। নক্ষত্রালোকে নীল আকাশ নীল জল কৃষ্ণাভা ধারণ করিল। তীরতরুরা পৈশাচী সোনার ন্যায় স্ফীতবক্ষ, জোনাকীগুলার চাকচিক্যময় উত্থানপতন যেন তাদেরই জ্বলন্ত নেত্রের ঈক্ষণপাত। বাঁশী থামিল, বাতাস মন্দ মন্দ বহিয়া গেল, ঝিঁঝিঁর ঝিঝিট রাগিণী বারেক জোরে বাজিল, নদীতে একটু ঢেউ উঠিল—বজরার তলায় জল গাহিয়া উঠিল কুল্ কুল্ কুল্। সবাই মিলিয়া যেন অনুরোধ করিয়া বলিল, থামিলে কেন? আবার বাজাও! —নির্মল চমকিয়া কোন সুদূর হইতে প্রত্যাবর্তন করিল, দেখিল, ধীরা তার কাছে সরিয়া আসিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিতেছে—আর একটু বাজাবে না?···স্বর তার অস্ফুট, অশ্রুমথিত, স্বপ্নবিজড়িত। নির্মল বাম হস্তে বাষ্পবিজড়িত উভয়নেত্র মার্জনা করিয়া নীরবে আবার বাঁশী তুলিয়া লইল। আবারও সেই ব্যর্থ ক্রন্দন! অস্পন্দ বিশ্বসংসার ব্যথাজড়িত কান পাতিল। নিদ্রাহীনা বিশ্বপ্রকৃতির বৈতালিক দল মানবচিত্তের এই ভাষাহীন সুরের বেদনায় নিজ প্রাণের প্রতপ্ত অনুভূতি ঢালিয়া দিয়া তাহারই সঙ্গে সুর মিলাইতে লাগিল। আর ইহার একটিমাত্র মানবী-শ্রোত্রী এই হতাশ করুণ সুরের সমস্ত নৈরাশ্যটুকু নিজের দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ প্রাণের মাঝখানে টানিয়া লইয়া নিজেরও অজ্ঞাতে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিল।

৩৮

এ সংসারে বোধকরি একমাত্র লোক সৌদামিনীর নিকট কি একটা কর্মসূত্রে আবদ্ধ ছিল, সেই ঋণ সে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতেও চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। প্রতিশ্রুতি মত বিহারী তাঁহাকে শেষ দিন কটায় শান্তি দিতে পারিয়াছিল।

এ অবস্থায় রোগী লইয়া কলহ করিয়া দেশছাড়ার দুঃসাহস বিহারীকে সকলের কাছেই নিন্দিত করিয়াছিল। বিশেষ, পাড়ার মাতব্বরেরা কেষ্টধনের সহিত অপর্ণার বিবাহ না দেওয়ার জন্য মুক্তকণ্ঠেই অর্বাচীন প্রৌঢ়কে দুষিয়া-

ছিলেন। কৃষ্ণধনের গুণে না হোক, দেহ বর্ণে অভিভাবক দত্ত নামের অর্থসঙ্গতি রক্ষিত ছিল। আকর্ণ বিস্তৃত শুভ্র ওষ্ঠাধর, মানসিক স্ফূর্তিতে এবং আভ্যন্তরিক দন্ততাড়নায় সর্বদাই বিকশিত, মনে হয়, দড়ি-বাঁধা ভল্লুককে শাঁকআলু খাইতে দেওয়া হইয়াছে! যাদের বয়স কম তারা খুঁজিয়া মেলা ভার, বুঁচের মত রক্তচক্ষু, সপ্তশিরা বাহির করা পুরুষপুঙ্গবের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল—আহা মেয়েটির যেন একগাছি দড়ির অভাব না ঘটে! কিন্তু অধিকাংশই মন্তব্য করিলেন—আরে রামোঃ! ধেড়ে মেয়ের বর জুটছিল এই কত-না! এতো আবার বাছ বিচার কেন? মেয়েটার নেহাৎ জাতজন্ম রাখবে না!

ক্ষ্যান্তমণি আসিয়া কিছু প্রসন্ন কিছু অপ্রসন্ন মুখে অনুযোগ করিলেন। কহিলেন, দেখ ঠাকুরঝি! তুমি ভাই অমন ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বেস ফেলতে ফেলতে বাড়ীর বার হয়ো না ভাই! মা বলে ওতে আমার মন্নি লাগবে। কেন ভাই! আমার অ-মন্দ করবে তুমি? আমি তোমার কি করেচি?

সৌদামিনী কষ্টশ্বাস রোধ করিয়া জিভ কাটিলেন; কষ্টে কহিলেন, সে কি ভাই! এ আমি রোগে হাঁপাচ্চি, এতে তোমার অমঙ্গল কেন হবে? না ভাই, আশীর্বাদ কচ্চি, তোমার ছেলেরা ভাল থাক, মেয়েরা তোমার রাজরাণী হোক, তুমি জন্ম এয়োস্ত্রী হও।

ত্রিবেণীর মুক্ত সঙ্গমের কিছু দূরে আরও দু-চারখানা ছোটখাট বাড়ীর মধ্যে একখানা মাসিক পাঁচটাকায় ভাড়া লইয়া বিহারী ছত্রি ঘেরা গোরুর গাড়ি হইতে যখন কোলে তুলিয়া সৌদামিনীকে নামাইয়া ঘরে লইয়া গেল, তখন আর একদিনের কথা তার মনে পড়িতেছিল। কতদিনই বা পূর্বে পলাশডাঙ্গা হইতে এই রকমই একখানি গোযানে এই দুই নারীকে তাদের একমাত্র আত্মীয় গৃহে আনিয়াছিল। আজ সেই আশ্রয় হইতে সে-ই তাঁদের টানিয়া বাহির করিয়াছে। রামচন্দ্র, রামচন্দ্রই জানেন, সে অন্যায় করিল কি না! কিন্তু, না, এখানে, সম্পূর্ণ পর বিহারীকে আশ্রয় করিয়া তাঁদের ভাগ্যে আর যা-ই থাক, অপমান যে নাই, এইটুকুই শুধু সে বলিতে পারে, আর উহাতেই তার মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গেল।

কে জানে কোন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ কোন ছলে, কিসের অহঙ্কারের ফলে সৌদামিনীকে পুনর্মূষিক হইবার শাপ দিয়া গিয়াছেন, তবে সে অভিশাপ সম্পূর্ণরূপে ফলে নাই, তখন তো সেবাপরায়ণ বিহারী তাঁর সহায় ছিল না। এ যে বিধাতার অতি বড় প্রাণখোলা দান! কোন ভাল জিনিস তিনি তাকে হাত তুলিয়া দেন নাই বটে, কিন্তু এই যে দিয়াছেন, এ মন খুলিয়া আশীর্বাদের সঙ্গেই দিয়াছেন।

বিহারীর আত্মোৎসর্গের সীমা ছিল না। কেমন করিয়া সে এই মৃত্যুপথ-বর্তিনীকে একটুখানি সুখে রাখিবে ইহাই হইয়া উঠিয়াছিল তার ইষ্টমন্ত্র। নূতন গৃহস্থের পুঁজি বড় অল্প। নগদ টাকা যে কটি ছিল রাহাখরচ, বাড়ীর এক মাসের অগ্রিম ভাড়াতেই ফুরাইয়া গিয়াছে। সম্বল সুদে পড়া যে কয়খানি গহনা রাধিকাপ্রসন্ন সৌদামিনীকে দিয়া বলিয়াছিলেন, অন্নপুন্নো-বেটির রাঁধুনিগিরির মাইনে দিলুম—সেই মরাসোণার লবঙ্গফুল, পাঁচনলি, একখানি বাজুই পরিবারটির ভরসা। হোগলা-পাকের বালা দুগাছি অপর্ণার হাতে আছে, প্রয়োজনে পাওয়া যাইবে।

ত্রিবেণী স্থানটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল, এখনও গতগৌরবের বহু চিহ্ন দেদীপ্যমান। বিশেষ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া আশেপাশের মত অতটা ধ্বংসপ্রাপ্তিও ঘটে নাই। মাঘ মাসে স্নানার্থীর সমাগমের সীমা থাকে না। ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেহত্যাগের লোভও হিন্দুর পক্ষে সামান্য নয়! এ সত্বেও এই সব পুরাণেতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান পরিত্যক্ত হইয়া পড়িতেছে, এর জন্য আধুনিক সহরঘেঁসা সভ্যতা, এবং ম্যালেরিয়াই বহুলাংশে দায়ী।

আরণ্য লতা ও অশ্বত্থ বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন মানব-পরিত্যক্ত গৃহের পাশে যে ছোট্ট বাড়ীটি বিহারী ভাড়া লইয়াছিল সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যায়। সৌদামিনী বিছানায় শুইয়া জানালা দিয়া সেই দিকে দৃষ্টি দিতেই তাঁর মনটা শান্ত শীতল বারিরাশির মতই শান্ত এবং শীতল হইয়া গেল। মাথা তুলিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইলেন। কামাখ্যাচরণ এবং পতিতপাবনীর উপরও যেন শ্রদ্ধা জন্মিল। এমনটা না ঘটিলে তো তাঁকে ঘরে শুইয়াই মরিতে হইত! আহা! কে

তোমরা গো, বিপক্ষরূপী ভগবান! রাবণ কংসের মত তাঁকে উদ্ধার করিতে আবির্ভূত হইলে!

কথা বলিবার সময় এবং শক্তি এক সঙ্গে ফুরাইয়া আসিতেছে, বুঝিতে পারিলেন, বিহারীকে ডাকিয়া বলিলেন—এমন নিরালায় শান্তিতে যে যেতে পারবো, এ ভরসা আমার তো স্বপ্নেও ছিল না। তোমায় পাওয়ার পুণ্যে এই মস্ত বড় সোয়াস্তিটুকু মা-গঙ্গা আমায় দিলেন! মামা, তোমার ঋণ শতজন্মেও শোধ যাবে না।

বিহারী স্থানীয় একজন কবিরাজকে একটি টাকা দর্শনী দিয়া ডাকিয়া-আনিয়াছিল। কবিরাজীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁর পুত্র ক্যাম্বেল-মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইয়াছিল, সে ছেলে সেদিন বাড়ী আসিয়াছে। পরীক্ষান্তে বাহিরে আসিয়া বিহারীকে বলিল—ফুসফুসে টাকা আধুলি প্রমাণ ছিদ্র অনেকগুলিই জন্মিয়াছে, মৃত্যু-সমীপাগত। বিহারী এ কথা শুনিয়া রোগিনীর কাছ ছাড়িয়া বড় একটা নড়ে নাই। অপর্ণা অনেক রাগারাগি করিয়া বাজারে পাঠাইয়া সাবুদানা, মিছরি ও দিয়াশালাই আনাইয়া লইয়াছে। এখন সে ছুতা করিয়া এই ঘরেই এটা সেটা নাড়িয়া ঘুরিতেছিল। সৌদামিনীর কথায় কান্না আসিল। নিজের কাহারও জন্য এ পর্যন্ত নাকি কাঁদিতে হয় নাই; তাই কোথাকার কে, পরের জন্য ভগবান বারেবারে তাহাকে কাঁদাইয়া শোধ তুলিতেছেন নাকি? এ কি সংসার! এ কয়লার খনিতে নামিলে গায়ে কালি না মাখিয়া কি উপায় নাই!

—বারে বারে কেন ওসব কথা বলো মা! করার মতন একটা কাজও যদি তোমার এ অক্ষম ছেলে করতে পারতো, তাও কথা ছিল! পেটে বিদ্যের আঁচড় থাকলে ছেলের রোজগারেই তো আজ এখনও তুমি একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতে।

বিহারী কি কথা আনিতেছে সৌদামিনী বুঝিলেন। এই অফলা অপ্রিয় আলোচনায় তাঁর বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছে। এসব ভাবিবার বা শুনিবার ক্ষমতা আর নাই। কতকটা ভীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—তা হোক মামা! ছেলে

মেয়ের ভাল—মায়ের সব চেয়ে প্রার্থনার, কিন্তু যা হবার নয়, মায়ের বুক ফাটিয়ে দিলেও তা হয় না, আমার এই ছার জন্মটাতেই সে আমি খুবই দেখে গেলুম! না ই হোক মামা! আমার কারোকে কিছু বলবার নেই। মানুষ নিজের নিজের কপাল সঙ্গে করে আনে, সে কি কেউ বদলাতে পারে? এই যে তোমার হাতের সেবা নিয়ে গঙ্গাতীরে মরণ এও অবিশ্যি আমার পূর্বজন্মের পাওনা, না হলে দাদাবাবু থাকতে থাকতেই বা মৃত্যু আমার হলো না কেন? তবু ভাবি বেহারি মামা তোমায় যদি না পেতেম আজ আমাদের কি হতো?

বিহারী এবার স্পষ্টই কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মা! তোমার কি হতো, তিনিই জানেন, কিন্তু আমার যে কি হতো—তাই ভাবি! মা কেমন ছিলেন মনে পড়ে না মা! তোমায় পেয়ে—মা পেয়েছিলুম। সত্যি বলচি মা! এই চূণের ঘরে বসে তোমার সাক্ষাতে বলচি, গর্ভে জন্মাতে পারি নি বটে, কিন্তু—

সৌদামিনীর চোখে জল টলটল করিতেছিল। তার উপরই হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিলেন—ওইখানেই বোধ করি আমার সব চাইতে পুণ্যের জোর ছিল, বেহারি মামা। এই যে যাচ্ছি, ঐ আইবুড় মেয়ে যে তোমার গলায় দিয়ে যাচ্চি, শুধু ঐ ভরসাটুকুই রইলো, আর আমার অনুমতিও রইলো, মাতাল, জোচ্চোরের হাতে দেওয়ার চাইতে তুমি নিজে ওকে—

—খুব মজার লোক তুমি তো বেহারি দা! চারটি কাঁচা কাঠ দিয়ে এসে মজা করে বসে আছ! নতুন উনুন, ঐ জলসুদ্ধ ভিজে কাঠ ধরে? মা আজ কি উপোস করবেন?

ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপনের পরক্ষণে ঘুম ভাঙিয়া গেলে যেমন অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করা যায়, এই ভয়াবহ আলোচনার হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া বিহারী যেন বাঁচিয়া গেল! সৌদামিনী কোন পথে তাঁর শেষ চিন্তা লইয়া গিয়াছেন, তার যে অতি ভীষণ ইঙ্গিত তাঁর কথায় ব্যক্ত হইতেছিল তাহাতে শীতের দিনেও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে অপর্ণার অপারগতার ক্ষোভে ক্ষুব্ধ মুখের পানে করুণা-ব্যাকুল চোখে চাহিয়া মনে মনে বারবার উচ্চারণ করিল—সীতারাম!

সীতারাম! রামচন্দ্র তোমায় রক্ষা করুন! মধুসূদন! মধুসূদন! প্রকাশ্যে কহিল—আচ্ছা দিদি! তুমি বসো; আমি ভাল কাঠ এনে দিচ্ছি।

মা যে বাঁচিবেন না, অপর্ণাও তা জানে। ভাগ্য-প্রতিপালিতাদের এগুলি জানিতে সময় লাগে, কিন্তু অকৃপা-পাত্রীদিগের এ খবর নিত্যকার।

মা হারাইবার মত দুঃখ এ সংসারে সন্তানের পক্ষে অল্পই আছে, বিশেষ মা বই যার আর কেহ নাই। কিন্তু মায়ের আকর্ষণ যদি অকৃত্রিম হয়, সমাগত প্রায় বিচ্ছেদ বেদনাকে সে বড় করিতে পারে না। নিজের জন্য বুক ফাটিতে থাকিলেও মন বলিবে, তিনি তো সকল জ্বালার হাত এড়াইবেন! সম্মুখে এই যে অপরিজ্ঞাত শান্তির প্রলোভনের ফাঁদ পাতা, ইহারই মোহে মানুষ বড় বড় ত্যাগের যজ্ঞে প্রাণের প্রাণকেও আহুতি দিয়া বাঁচিয়া থাকে। শুধু তাই নয়, সময় সময় গৌরব ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধও করে। অপর্ণাও মায়ের জন্য বড় শান্তির আরাম-কুঞ্জ রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছে নিজের ভিতর তাই সে একটা জ্বালাময় সুখানুভব করিতেছিল। যাত্রাতিথি অগ্রসর হইতেছে, প্রাণটা থাকিয়া থাকিয়া যেন আর্তনাদ করিলে সে তাকে থাবড়া দিয়া থামাইয়া বলে, মরে যে তোর হাত এড়াইবেন, তাতেও তোর বাদ!

ফাল্গুনের শেষ সন্ধ্যা। বাতাসের শীত-শিহরণ নাই। আকাশে ঈষৎ ধূসর মেঘ, আজ না হোক শীঘ্রই বাদল নামিতে পারে। সৌদামিনীর সামনের জানালা খোলা; অদূরে মা গঙ্গার প্রশস্ত ধারা প্রকাণ্ড রূপার পাতের মত পড়িয়া আছে; কাছে হইলে দেখা যাইত সে জলে বেশ বীচিবিক্ষেপকারী একটি মৃদু গতি আছে। বাঁধা ও আবাঁধা ঘাটগুলিতে কর্ম্ম কাজের খাতিরে লোক চলাচলও রহিয়াছে।

সৌদামিনী চোখ মুদিয়া শুইয়াছিলেন। চোখ চাহিয়া গঙ্গার অফুরন্ত রূপরাশি দর্শন করিবার শক্তিও তাঁর হ্রাস পাইয়াছে। শরীরে মনে ঘুমের আবল্যের ন্যায়, নেশার আবেশের মত, দারুন একটা অবসাদ তাঁহাকে নিজের অতলে তলাইয়া লইতেছিল। এ জীবন কাল শুধিয়া জীবনের যোগ-বন্ধন কাটিবার ছুরিকাই এই শূন্যময়ী বিস্মৃতি!

অপর্ণা আজ মার কাছ ছাড়ে নাই। একবার একটু দুধ গরম করিয়া আনিয়াছিল, তাহাই বারে বারে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে। আহার কয়দিন হইতেই কমিয়া গিয়াছে। দুধ গলা দিয়া নামিতে চাহে না। চামচ-সুদ্ধ হাত বিরক্তির সহিত সরাইয়া দিয়া সৌদামিনী খাইতে অনিচ্ছা জানাইলে অপর্ণা তখন আর বিরক্ত করিল না। আঁচলে মুখ মুছাইয়া গায়ের চাদরটা গায়ে টানিয়া দিল। আবার একটু পরে খাওয়াইতে গেলে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া সৌদামিনী অসন্তোষের সহিত কহিলেন—খেতে আর পাচ্ছি নে অপি, ফেলে দে।

অপর্ণা মিনতি করিয়া কহিল—একটু না খেলে হবে কেন মা?

সৌদামিনী হাসিলেন; কহিলেন—কি হবে না মা? হবে যা, সে তো জানতেই পারো, তবে কেন আর পীড়ন করো!

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন—বলতে যা বাকি আছে এই বেলা বলে নিই। অপি! বেশি বলতে ভগবান আমায় দেন নি, শুধু তোমায় আমি এই বলে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, এ পৃথিবীতে যতদিন থাকতে পাবে, সুখী বা দুঃখী যেমন রাখবেন, সয়ে থেকো। তাঁকে আমার বলবার কিছু নেই, ঢের বলেছি। তোমায় বলচি যেন মাথা উঁচু করে এখান থেকে শেষ বিদায় নিতে পারো।

অপর্ণা মায়ের এই অন্তিম আশীর্বাদ চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে গ্রহণ করিল। পরে বাষ্প-রোধহীন শান্ত স্বরে বলিল—তাই যেন পারি।

সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন—এ সংসারে যা পেয়েছি সে জন্যে নিজেকেই দায়ী করি, বিধাতাকেও করি না, কিন্তু আজ এই যে যাবার সময় পৃথিবীর ময়লা মাটি ঝেড়ে ফেলে খাড়া মাথায় তাঁর সামনে যাবার অহঙ্কারটুকুই সম্বল করে যাচ্ছি, এর জন্যে তাঁকেই প্রণাম জানাই। তিনি বল না দিলে এ আমার সাধ্যে কুলোতো না। এ অহঙ্কার নয় মেয়েমানুষের, সকল মানুষের, এই গর্বটুকুই যেন তুমি—যেন সব মানুষেই সম্বল রাখে, এই আমার শেষ আশীর্বাদ।

পরদিন দ্রুতগতিতে জ্বর কমিতে লাগিল, কাশির সঙ্গে অনেক রক্তও

উঠিল। বিহারী মুখ কালি করিয়া কবিরাজ ডাকিয়া আনিলে তিনি নাড়ী টিপিয়া চোখের ইঙ্গিতে আসল খবর জানাইয়া গেলেন। তবু বলিয়া গেলেন, কুকসীমার পাতার রসে এক মোড়া মকরধ্বজ মাড়িয়া খাওয়াইতে পারো।

বিহারী কবিরাজের পশ্চাতে অনুপান সংগ্রহের চেষ্টায় ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, সৌদামিনী ডাকিলেন—বেহারি!

গলার স্বর বসিয়া গিয়াছে, খুব কাছে না বসিলে শুনা যায় না—সে কণ্ঠ শুনিয়া অপর্ণা দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিল। বিহারী অস্পষ্ট শব্দে মুখ ফিরাইতেই তাঁর উৎসুক দৃষ্টিতে আহ্বান অনুভব করিয়া ফিরিয়া আসিল।—ওষুধটা ঠিক করে আনি মা।

সৌদামিনী ইঙ্গিতে কাছে বসিতে বলিলেন। আদেশ পালিত হইলে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—ওষুধের দরকার নেই সে ত জানতেই পারচো, আর কেন?

অপর্ণা এ ধাক্কাও প্রাণপণে সামলাইয়া রহিল। বিহারীর চোখ দিয়া জলের ধারা ঝরিতে লাগিল। সৌদামিনী দুজনকারই মুখের দিকে চাহিয়া তারপর বলিলেন—অপিকে তোমায় দিয়ে যাচ্চি, তোমায় কিছুই বলবার দরকার নেই, তা জানি—তুমি এইটুকু দেখো যেন হিন্দুর মেয়ে নিজের কুলধর্ম, জাত, মান বজায় রেখে মরতে পারে। তুমি নিজেই ওকে বিয়ে—

—মা! মা! ছোট মা! চুপ করো; চুপ করো বলো না, বলো না, না, না, না!—

বিহারী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শেষের কথাটায় মরণাহতা তাহাকে যেন জলন্ত লৌহগোলক ছুঁড়িয়া মারিলেন। অপর্ণা পাছে শুনিতে পায়, বিহারী শঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। একটা কাশির ধমকের পর সেটা ক্ষণিকের জন্য প্রশমিত হওয়ায় রোগিণী কহিলেন—আজ সবার উপর হতেই দুঃখ অভিমান ভুলে, সব্বাইকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি। কিন্তু এ কি মনের পাপ, শুধু তাকেই কেন পারি নি? মনে হয়, আমি মাপ

করি নি বলে ভগবানও যেন তাকে করতে পারচেন না। আর এও বুঝতে পারচি, সেই পাতকেই দেহ থেকে প্রাণ বার হয়েও হচ্চে না! সেই যে আমার অপর্ণার বিধিদত্ত বর! নিজেই সে একদিন বিধাতার সেই প্রত্যাদেশ নিজের কানেই যে শুনেছিল—কিন্তু তারপর? দারুন লোভে তাকে মহা-পাতক করালে। দুঃখী-অনাথার সঙ্গে নির্মল বিশ্বাসঘাতকতা করলে, না কখনও, যদি কখনও ওর বিয়ে হয়ও ভোগ হবে না। জন্ম-জন্মান্তরের পতি না পেলে সতী-মেয়ের কি ভোগে লাগে? এ সম্বন্ধ যে কোন যুগযুগান্তরের, এ জোড় কেউ জোর করে মেলাতে পারে না। তাই তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে! এত বড় সম্বন্ধে কি কেউ কারুকে জোর করে আনতে পারে? তাই মেয়ে আমার আজ কাঙ্গালিনী অনাথিনী।

অপর্ণার দংশিত অধরে রক্ত জমিয়া নীল হইয়া উঠিল। সৌদামিনীকে কেহ কখন এত কথা এবং এ ভাবের কথা কহিতে শুনে নাই! বিহারী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বুঝিল এতদিনকার ছাই চাপা আগুন আজ শেষ জ্বালায় জ্বলিয়া এই সর্বনাশী শিখায় দেখা দিয়াছে। ইহার পরিণাম ভস্ম হওয়া। সনিশ্বাসে কহিল—ভগবান যাকে দিয়ে যা করান মা!

সৌদামিনী উহারই ভিতর একটু গর্জিয়া উঠিলেন—না মামা! ভগবান করান না, মানুষই তার কর্মফলে করে। তবে একটা বিষয়ে আমি তাঁকে দায়ী করি। তিনি মানুষের মনটাকে নোংরা করে কুটিল করে করলেন? মনই যখন সমস্ত ভাল-মন্দর কর্তা তবে তাকে শিব না করে বানর কেন গড়তে গেলেন, বুঝি না! যাক গে তিনি যেমন বুঝেছেন, করেচেন, মানুষকে মন্দ প্রবৃত্তি দিলেও ভাল হতে তো মানা করেন নি।

সৌদামিনী এই রোগেরই ধর্মে ক্লান্তি না মানিয়া বকিয়া যাইতেছেন বটে, কিন্তু আর যে বেশীক্ষণ তাঁর ক্ষত শুষ্ক রসহীন জিহ্বা শব্দ-উচ্চারণক্ষম থাকিবে না, অপর্ণা ও বিহারী তাঁর মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছিল।

স্বর ভাঙ্গিয়া ক্ষীণ হইয়া গেল, তবু কথা ফুরায় না। ঐ শোন, কে যেন বলচে—আশ্চর্য! না, না, ওকে ক্ষমা না করে আমার যাবার উপায় নেই!

সে যে মা বলে ডেকে দুহাত বাড়িয়ে কোলের কাছে এসে—আমি ডাকি নি, আপনি এসেছিল—সে দিনের মত সুখ, এ পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে আমি পাই নি। আজ যাবার দিনে তাকে ক্ষমা যদি না করে যাই, মাতৃনামে যে কলঙ্ক হবে। বেহারি! ওকে প্রাণের সঙ্গেই ক্ষমা করে যাবো।

নিঃশ্বাস বড় দ্রুত বহিল; অর্ধ-নিমীলিত চোখের তারা একটু কাঁপিয়া নিশ্চল হইয়া আসিল। কাঁদিয়া উঠিয়া বিহারী ডাকিল—মা গো, ছোট মা! তোমার এই হতভাগ্য ছেলেকে আজ যথার্থই মাতৃহীন করে গেলে মা।

সৌদামিনী ততক্ষণ বোধ করি পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়া এক পা উঠিয়া গিয়াছেন। জ্যোতিঃশূন্য নেত্রতারা যাত্রাপথের বিশালতা নিরূপণার্থেই ঊর্ধ্বে দৃষ্টি স্থির করিল।

৩৯

অপরাহ্নে মন্দ-মধুর আলোকে বাতাসে নদীর জল প্রিয়করস্পর্শে সরমবতী নবোঢ়ার ন্যায় পুলকে রঞ্জিত এবং কম্পিত হইতেছিল। বজরার চিত্রিত অঙ্গে মন্দ জলোচ্ছ্বাস যেন আদরভরেই মৃদু আঘাত করিয়া, অর্ধস্ফুট তানে সোহাগ বাণী শুনাইতেছিল। বজরার সঙ্গে ছোট পানসীতে রান্নার উদ্যোগ হইতেছে। বজরার মাঝি-মাল্লারা নদীতীরের সুপরিষ্কৃত বালুকায় পশ্চিমাস্য হইয়া নমাজ করিতেছে। নির্মল বজরার ছাদে বসিয়া নদীজলের অফুরন্ত চলা দেখিতেছিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলিয়াছে, আবার নব তরঙ্গ তাদের অনুবর্তন করিতেছে। তার পর আবার—আবার—আবার উঠিতেছে, চলিতেছে। এ চলার বিশ্রাম নাই!

মৃদু শব্দ হইল। ধীরা এক হাতে জলখাবারের রেকাব, অপর হস্তে সুবাসিত সরবৎ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অতি ব্যস্ততায় মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর-হারা না হইলে, নির্মল দেখিত—কি আনন্দের দীপ্তিতে দীপ্তিমান সে মুখ!

নির্মলের কর্তব্যবোধ সে আনন্দের অংশ লইতে পারিল না। সে রেকাব ও গ্লাস গ্রহণ করিয়া ভৎ'সনার ভাবে কহিল—একি ধীরা! সিঁড়িতে দুহাত জোড়া করে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে যদি, নীচে আমায় ডাকলেই হতো, না হয়, ঝিকে বললে না কেন, দিয়ে যেতো!

হায় ধীরারই শুধু মনে থাকে না, কিন্তু আর সবারই সব সময় স্মরণ থাকে সে অন্ধ! কিন্তু কেন? অন্ধের কি এতটুকু সেবারও অধিকার নাই? নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল—সিঁড়িতে ওঠা অভ্যাস হয়ে গেছে।

আজ সে অনেক কথা বলিবে যে অধিকারের মধ্যে প্রবেশপথ পায় নাই, অসঙ্কোচে নিজের সেই সিংহাসনে উঠিয়া বসিবে, এই আশা করিয়া সে আসিয়াছিল। কিন্তু এ সুযোগ তাকে এ ব্যক্তি না দিবারই পণ করিয়াছে, কেমন করিয়া গভীর সঙ্কোচের বাধা কাটাইয়া সে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবে?

কতকগুলা দিন এমন করিয়া কাটিয়া গেল। আজকাল অধিকাংশ রাত্রেই ধীরা জাগিয়া থাকিয়া ছটফট করে! প্রায় মধ্যরাত্রে ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। ঝড় যদিও প্রবল নয়, বৃষ্টিও সামান্য, তথাপি জলের উপর বজরার দোলায় বাতাসের গর্জনে জলকল্লোলে ধীরার দুর্বল চিত্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠে। মনে হয় ঝটিকা হয়ত কোন সময় তাদের বজরার ছাদখানা উড়াইয়া লইবে! উচ্ছৃঙ্খল জলোচ্ছাস হয়ত তাদের আশ্রয়তরী গ্রাস করিবে! তা নিজের জন্য বেশি ভয় হয় না, আর একটা নিষ্ঠুর সম্ভাবনায় সর্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠে! ধীরার কঠিন প্রাণ; সে জলে পড়িলেও হয়ত ডুবিবে না; কিন্তু? কোনক্রমেই চোখের পাতা আর এক হয় না। অধীর উৎকণ্ঠায় কান পাতিয়া ঝড়ের তাণ্ডবধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভয়ে মরিয়া থাকে।

সে রাত্রে বৃষ্টি চাপিয়া আসিলেও ঝড় থামিল না। মত্ত বায়ু বজ্র হানিয়া বিদ্যুৎ নাচাইয়া বড়ই মাতিয়া উঠিল। নির্মল মাঝিদের সহিত কথা কহিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মাঝিরা বলে—ভয়ের কারণ নাই। ডবল নোঙ্গর ফেলা, কাছিও শক্ত, ছিঁড়িবে না।

নির্মল শুইয়াছিল—ঘুমায় নাই, সহসা অতি নিকটে ভয়ার্ত দ্রুত শ্বাস অনুভব

করিল। কে যেন খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে এমনও মনে হইল; প্রথমে ভাবিয়াছিল, বাতাসের শব্দ, কিন্তু আবার সেই দ্রুত শ্বাস! যেন কোন ভয় পাওয়া শিশু আশ্বাসলাভের আশায় বহু দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে! বিস্ময়ের সহিত উঠিয়া বসিল; বলিতে গেল, ধীরা! কিন্তু না বলিয়া তার জিহ্বা কেন যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ক্ষণপূর্বের চিন্তাধারার অনুবর্তনে উচ্চারণ করিল—অপর্ণা!

পার্শ্ববর্তিনী মৃদুনিক্ষিপ্ত শ্বাসে উত্তর করিল—ধীরা।

ব্যস্তভাবশতঃ স্বকৃত উচ্চারণ-ভ্রান্তি নির্মল জানিতে পারে নাই। সে অন্ধকারে হাত বাড়াতেই ধীরার দেহে হস্তস্পর্শ হইল। অমনি নীড়ভ্রষ্ট ভয়ত্রস্ত পাখীর মত সে ঝাঁপাইয়া তার বক্ষলগ্ন হইল। গভীর স্নেহে বুকের মধ্যে তাহাকে চাপিয়া নির্মল সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—ভয় করচে?

ধীরার মুখ নির্মলের বুকের ভিতরে, সেখানের ইন্দ্রালয়ে সে ভয় ভাবনা অস্বাচ্ছন্দ্য এক মুহূর্তে বিস্মৃত হইয়াছিল। সেই সহানুভূতিপূর্ণ উত্তপ্ত হৃদয়ের সান্নিধ্য-প্রাপ্তিতে সমস্ত শরীর মন তার কি এক অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে শান্ত হইয়া গিয়াছিল, নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিল—না।

নির্মল এক হাতে বক্ষলীনা বালিকাকে ধরিয়া রাখিয়া অপর হস্তের অঙ্গুলিগুলা তাহার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে চালনা করিতেছিল। অবিশ্বাসের মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল—নিশ্চয় তোমার ভয় করছিল, আমায় কেন ঐখান থেকেই ডাকলে না?

একটু পরে আবার বলিল—কিচ্ছু ভয় নেই, ঘুমিয়ে পড়ো।

গভীর সুখে ধীরার চোখের দুখানি পাতা স্বতঃই নামিয়া আসিল।

পরদিন প্রভাতে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। সন্ধ্যায় বজরার ছাতে বসিয়া নির্মল ধীরাকে এক বিখ্যাত লেখকের লেখা পড়িয়া মর্ম বুঝাইতে ছিল; মধ্যে মধ্যে তাহাকে সে ভাল ভাল বই পড়িয়া শুনাইত।

রাত্রে ধীরা শয্যায় শয়ন করিলে নির্মল পাশের কুঠরিতে শুইতে যায়, ধীরা আজ না শুইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। নির্মল বলিল—শোও।

ধীরা তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কাছে আসিয়া নির্মল তার হাত ধরিয়া আদরের সহিত বলিল—রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, শোবে এস।

সেই স্পর্শে সর্বাঙ্গে পুলকিত হইয়া ধীরা তার হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিল, কহিল—যদি এরকম ঝড় হয়?

নির্মল সান্ত্বনা দিয়া কহিল—আজ আর হবে না; আকাশ খুব পরিষ্কার আছে, যদিই হয় আমায় ডেকো।

ধীরা ধৃতহস্ত সবলে চাপিয়া ধরিল। সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব সরাইয়া ফেলিয়া আর্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—না, না, একলা থাকতে পারবো না!

এইটুকু বলিতে তাহাকে যে কি লজ্জা সংবরণ করিতে হইয়াছিল, সেই জানে! ঝড়ের শব্দের আতঙ্ক, অথবা গত রজনীর যে অনাস্বাদিত সুধারস সে তার তৃষিত চিত্ত ভরিয়া পান করিতে পাইয়াছে, তাহারই লোভ—দুইয়ের মধ্যের কোনটি যে আজিকার এ অভিব্যক্তির মূল, বলা যায় না। বোধ করি বা প্রথমটার অপেক্ষা দ্বিতীয় কারণটাই প্রবলতর! কাল অভাগী ধীরা স্বামীর বিকারবিহীন স্নেহালিঙ্গনে সেই যে ক্ষণকাল নিজেকে সংবদ্ধ রাখিতে পাইয়াছিল; সেই হইতে তার এই অন্ধতমসাবৃত অন্ধ-জগৎ যে নবরবি-কিরণ-সম্পাত-সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! আজিকার সারা দিনমান যে অননুভূত সুখস্বপ্নে কাটিয়া গিয়াছে! সেই স্বপ্নসুখের মধ্যে অনাগত রজনীর সদ্য-সমাগমের জন্য একটা অধীর প্রতীক্ষামাত্র সে সুখের ব্যাঘাতক হইতেছিল। স্বামীর আবরণহীন তপ্ত বক্ষ থাকিয়া থাকিয়া দুরু দুরু কম্পিত বক্ষতাল অনুভব করিয়া গোপন আনন্দে শতবার পুলককম্পনে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাঁর মৃদু নিক্ষিপ্ত শ্বাস মুখের উপর অনুভব করিয়া মুখের স্বাভাবিক পাণ্ডুতা ক্ষণে ক্ষণে ঘুচিয়া তাহাকে প্রেমময়ী নববধূর ন্যায় লজ্জারাগে আরক্তাভা প্রদান করিয়াছিল। অনুভব করিতেছিল, তার এই নিভৃত বনের শুষ্ক বিতানে গত রাত্রের ঝড়ের মধ্যে অকস্মাৎ রুদ্ধ দুয়ার ঠেলিয়া নববসন্তের অধিষ্ঠাত্রী অরুণ-রাঙা চরণ-পাতে জীবনটাকে যেন রঙীন করিয়া দিয়াছেন। অন্তর বাহির ভরিয়া আজ তাই সেই নবজীবনের জন্মতিথি-পূজার উৎসব চলিতেছে। নদীর একঘেয়ে কল কল,

ছল ছল, আজ আর নাই, তার মধ্যে আজ নূতন স্থর। তীরের বন্যপাদপে পাখীও নিত্যকার পুরাতন স্থরে ডাকে নাই। নির্মলের যে কথাটি, যেটুকু হাসি সারাদিনে তৃষিত কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, মনে হইয়াছে—সে যেন তালে-মানে বাঁধা সঙ্গীতের ঝঙ্কার! প্রচণ্ড লোভে রাত্রির প্রতীক্ষা করিয়া আছে। প্রকৃতির অশান্ত তাণ্ডব মুহূর্তে যে অমৃত সে পান করিয়াছে, সে তো চুরির ধন নয়, একান্তই নিজস্ব। কেন তবে সে এই স্থধা-সমুদ্রের তীরে বসিয়া এমন বুভুক্ষিত? কেন সে স্থবর্ণ-মন্দির ফেলিয়া দুয়ারে লুটাইতেছে; কার অভিশাপে?

নির্মল তার এই ভয় দেখিয়া হাসিল। মাথাটা সস্নেহে নাড়িয়া দিয়া কহিল—ছোট খাট যে দুজনকে তো কুলবে না। এই তো আমি পাশেই রইলুম, একটু ডাকলেই হলো। কেমন, না? আচ্ছা, আমি যাই?

ধীরা যে হাতটা ধরিয়াছিল, সে হাত সে ছাড়িল না, নতমুখে শুধু ঘাড় নাড়িল—না। কণ্ঠে তার জালাভরা অশ্রু সাগর মথিত হইতেছিল; কথা কহিতে পারিল না।

—যাবো না? বেশ, যাবো না, তুমি শোও, আমি তোমায় ঘুম পাড়াই। কেমন খুশী?—এই বলিয়া সে ধীরার শয্যা প্রান্তে বসিয়া পড়িল! ধীরা হাত ছাড়িয়া দিল।

—দাঁড়িয়ে কেন? শোবে এসো, আমি বাতাস করি। গল্প বলবো? অনেক রাত হয়ে গেছে কিন্তু, ঘুমুলেই ভাল হয়! কাল তোমায় খুব ভাল একটা গল্প বলবো; আজ থাক না! লক্ষ্মীটি ঘুমিয়ে পড়ো।

ধীরার চিত্তে দুর্জয় অভিমান ধূমায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। শান্ত নিস্তরঙ্গ হৃদয়-নদীতে প্রমত্ত বেগে বিদ্রোহের বন্যা জাগিয়া উঠিল, একবার মনে করিল, তাঁর কোন কথা সে শুনিবে না, কিছুতেই না, গল্প শুনিবে না, বাতাস খাইবে না, কিছুই না। কেন শুনিবে? সে কি কচিখুকী যে তাহাকে গল্প বলিয়া, বই পড়িয়া, বাতাস খাওয়াইয়া—সারাদিন পুতুল বানাইয়া রাখিতে হইবে? এর নাম স্বামীর ভালবাসা? এর জন্য এমন করিয়া সর্বস্বান্ত হওয়া!

কিছুক্ষণ পরে নীরব ধীরাকে নিদ্রিতবোধে নির্মল পাখা রাখিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। তখন সেই বিজন কক্ষ-মধ্যে বিনিদ্র শয্যাতলে একা পড়িয়া ধীরা তার প্রাণপণে-রুদ্ধ করা এতক্ষণকার নিঃসীম বেদনা পরিপূর্ণ আকুল অভিমানাশ্রুরাশি তেমনিই নিঃশব্দ রোদনে অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিল। অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগে কাঁদিয়া কঁদিয়া দুঃখীর একমাত্র সহায়কেই নালিশ জানাইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, যদি এমন করে বঞ্চিত করবে, তবে কেন দিলে? যদি দিলে তবে সবাইকে যেমন করে দাও তেমনি করে দিলে না কেন? আমি তোমার কাছে কি করেছি যে, আমায় সব দিয়েও এমন সর্ব-বঞ্চিত করেছ? এমন করে আর আমি বাঁচতে পারি না।

মনে হইল নির্মল তাকে ভালবাসে না। ভালবাসিলে মানুষ কি ভালবাসার বস্তুকে এমন করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে? ভালবাসিলে কি মানুষ ভুলিয়া যায়, যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ভগবান আমার মত দৃষ্টি দেন নাই। দেখা দিতে হইলে তাকে আপনার চেয়েও আপনার হইতে দিতে হয়! স্পর্শই একমাত্র যে অন্ধের দৃষ্টি, এই এতবড় কথাটার কি তা হলে এমন করিয়া ভুল হয়?

সে না হয় অন্ধ; হতভাগ্য অন্ধ! কিন্তু ওগো অন্ধের দেবতা! তুমিও কি তাই? তুমি কি তোমার এই অধম সেবিকার মত কিছুই দেখিতে পাও না? পূজার জন্য যে ব্যাকুলা তার সেই পূজার সুখ পদাঘাতে দলিত করিয়া তুমি তাহাকে একি প্রতিদান দিতেছ? পূজারীকে দেবতা সাজাইয়া এ কি তোমার নির্মম পরিহাস? ওগো! না না, আর না, আর সহিতেছে না, এ খেলার সমাপ্তি কর। যেখানে যার স্থান, সেইখানে স্থাপন করিয়া তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে দাও, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত কবিতাকে ছন্দ-ভ্রষ্ট করিও না। ওগো বাঁচাও! অন্ধ কাঙ্গালের মুখে যে অনাস্বাদিত সুধাপাত্র মুহূর্তের জন্য তুলিয়া ধরিয়াছিলে, তাহা হইতে—ওগো মহাজন! তোমার তো কিছুরই অভাব নাই—সর্ব-বঞ্চিতাকে বঞ্চিত করিও না। কিন্তু, হায়, অন্ধের এ দুঃখ তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে!

বিহারী বাটনা-বাটা শিলে ভোঁতা কাটারি শানাইতেছিল, এমন সময় অপর্ণা জলপূর্ণ পিত্তল কলস অদূরে নামাইয়া সবেগে কহিল—তোমার মতলবখানা যে কি, বুঝতেই পারলাম না বেহারিদা। কি যে তুমি ঠাউরে রেখেছ বলতো!

অকস্মাৎ এভাবে সম্ভাষিত হইয়া কর্মতন্ময়চিত্ত বিহারী চমকাইয়া গিয়াছিল। সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া পরক্ষণে মৃদু হাসিয়া সে আবার কাজে মন দিল, কহিল—কেন দিদি?

—কেন দিদি, কি বেহারিদা? কিছুই যেন তুমি জানো না। সত্যি বলচি, তোমার ও ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না, বেহারিদা! পৃথিবীর সবাই যা জানে, তুমি এতই খোকা যে, তোমাকেই শুধু তা বুঝিয়ে দিতে হয়?

অপর্ণা ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া রহিল, কাপড় ছাড়িবার জন্যও শীঘ্র যে সরিবে, এমন গতিক নয়। আর্দ্র বস্ত্র হইতে জল ঝরিয়া পায়ের তলার মাটি ভিজিতেছিল, সেই জলে লক্ষ্মীর পায়ের মত ছোটদুটি পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতেছে। বিহারী দেখিল তার মুখ বড় কঠিন, হাসির এতটুকু আভাসও নাই, সে ঈষৎ ভীত হইল নতমুখে মৃদুস্বরে কহিল—কি করেছি তাই বলো?

অপর্ণা এ প্রশ্নে আরও রাগিয়া গেল। তীব্র কটু কণ্ঠে বলিল—বলবো, আবার কি? তোমার জন্যে পাঁচজনের কাছে আর বাক্যযন্ত্রণা সইতে পারি নে। হয় একটা ঝি রাখ, না হয়, এর একটা বিহিত করো—

—আমার জন্যে তোমায় কথা শুনতে হয়!

বিহারীর মুখখানা ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল, আহতভাবে সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেওয়াল চাপিয়া ধরিল, সে যেন বেত্রাহত হইয়াছিল। অপর্ণা ইহা দেখিল, কিন্তু নরম হইল না। তেমনি করিয়াই বলিল—হ্যাঁ, তোমার জন্যে নয় তো কার? কেন তুমি আমায় গলগ্রহ করে রেখেছ? নিশ্চয় নিজের কিছু স্বার্থ আছে, নৈলে শুধু শুধুই কি চুপচাপ বসে আছ? সত্য কথা বলতে কি আমারও এ আর ভাল ঠেকছে না।

বিহারী এতক্ষণে হাঁপ ছাড়িল। উচ্চ পরিহাসের হাস্যে গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছাও মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু রুদ্ধ শ্বাসটাও লঘু হইল না, আর হাসিটাও কোথা দিয়া কোথায় যেন চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ অবরুদ্ধবাক্ থাকিয়া সকরুণ কণ্ঠে উত্তরে কহিল—খুঁজচি তো দিদি, পাচ্চি কই? ভাল বর বর পেলে কি আর দেরি করি? আমার কি অসাধ!—বলিতে বলিতে তার যেন কান্না আসিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবীর সমুদয় লোকের উপরেই দারুন আক্রোশ জাগিয়া উঠিল, অপর্ণার উপরেও বড় অভিমান হইল। বিবাহটা এতই কি প্রয়োজনীয়, যে তার জন্য দেশ-বিদেশে সকলকার এত মাথাব্যথা পড়িয়াছে? অপরে না হয় যা বলিতে হয় বলুক, শেষে পাঁচজনের কথায় অপর্ণাও কি না সেই বিবাহের জন্য এমন করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল! বিবাহ করিয়া পরের ঘরে চলিয়া গেলে নিঃসহায় বিহারীটার কি দশা হইবে, এ কথা দশজনের মত তার কাছেও কি কিছুই নয়! তার মৌন অভিমানের গোপন ক্রন্দন অপর্ণার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে খাপরার আগুনের মত গনগনিয়া জ্বলিতেছিল। ঘাটে জল আনিতে গিয়া ইতঃপূর্বেও মধ্যে মধ্যে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছে, কিন্তু আজ উহা চরমে উঠিয়াছিল। বিহারীর সহিত সম্বন্ধ লইয়া আজ এক ধনী-গৃহিণী বড় কঠিন পরিহাস করিয়াছেন। আর একজনকে শুনাইয়া বলিতেছিলেন—বুড়োটা কেন বিয়ে দেয় না জানিস নি? মতলব,—ঐ ছবি ছবি চেহারাখানার জোরে ব্যবসা করবে, কোঠাবালাখানা ওঠাবে!—সে দ্বিগুণ ঝাঁকিয়া কহিল—কাকে তুমি বোকা বোঝাতে চাইছ বেহারিদা? আমি ন্যাকা নই যে, ঐ ছেলে-ভুলান কথায় গলে পড়বো? বুঝি সব!

এইটুকু শুনিয়াই বেহারীর বুক ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। অপর্ণা হয়ত তার গোপন দুর্বলতা ধরিয়া ফেলিয়াছে! বুড়া হইয়া বিহারী নিজের কথা যে এতখানি ভাবিতে শিখিবে—ইহা যে তার স্বপ্নের অগোচর ছিল, হায়, হায়! মানুষ কিসের লোভে বাঁচিয়া থাকিতে চায়?

অপর্ণা কহিয়া যাইতে লাগিল—চেষ্টা করলে না কি বিয়ে আটকায়?

কেন বাংলাদেশে কি এখন তৃতীয় পক্ষেও কারু বউ মরে না? এ দেশের মেয়েরা বুঝি মার্কণ্ডের প্রমাই পাচ্চে? ফরমাস দিয়ে গড়তে দিলে অবশ্য গড়া শেষ হতে যুগ উলটে যেতে পারে! শোন বেহারিদা! এই আমি সোজা কথা বলে দিচ্ছি, আষাঢ় মাসের মধ্যে যদি তুমি ঘাটের মড়াই হোক—যা-ই হোক একটা যোগাড় করতে না পার, তোমার ভাল হবে না—

বলিয়াই সে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল; এবং অনেক দেরি করিয়া কাপড় বদলাইয়া আসিয়া দেখিল, বিহারী যথাপূর্ব দাড়াইয়া আছে। কাছে আসিয়া দয়ার্দ্রকণ্ঠে ডাকিল—বেহারিদা!

বিহারী শুষ্ক মুখে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সেই সদানন্দ হাসিটুকুর সহিত সাগ্রহ—'কেন দিদি?' আজ তার বিমর্ষ অধর ভেদ করিল না।

—আমাকে নিয়ে তোমার অনেক জ্বালা, জানি—কি করবে বল? আর জন্মে নিশ্চয়ই আমরা তোমার পাওনাদার ছিলুম, তা নইলে কি কেউ কারু কাছ থেকে এতটা আদায় করতে পারে? তা যাই হোক, আপদের শান্তি করে ফেল। তুমিও বাঁচো, লোকেও বাঁচুক। নিজের কথা সে উল্লেখ করিল না।

নিষ্ফল রোষে জ্বলিয়া মরিতে মরিতে যদি একটা ঝাল ঝাড়িবার পাত্র মিলে তবে অতিবড় নিরীহও তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। অপর্ণার কথায় বিহারী হঠাৎ তেমনি ক্রুদ্ধ উৎসাহে বোমার মত ফাটিয়া পড়িল—লোকের কিসের মাথাব্যথা! বলুকগে লোকে যা বলতে হয়। যারা অবস্থা না দেখে বলার সুখে বলে, তাদের আমি মানুষ মনে করি নে।—বলিতে বলিতে তার শিরাসঙ্কুল শীর্ণ হস্ত মুঠি বাঁধিয়া উঠিল; মনে হইল যারা অপর্ণাকে বাক্যযন্ত্রণা দিয়া তার বিবাহ-বিতৃষ্ণ চিত্তকে এতখানি উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে, তাদের হাতে পাইলে, সে বোধ করি গলা টিপিয়াই মারিত! কিন্তু তাদের মারিলে কি হইবে? উপ্ত বীজ অপর্ণার চিত্তোদ্যানে এমনি কঠিন-ভাবে অঙ্কুরিত হইয়া গিয়াছে যে, সে যে শুকাইয়া মরিবে—এমন আশা নাই!

অপর্ণা আবারও কঠিন হইয়া উঠিল। নীরস-স্বরে কহিল—তুমি লোকের কথা বড় মনে না করতে পারো, পুরুষমানুষ তুমি, তোমার তাতে ক্ষতি

নেই, কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, লোকের কথাকে এতটা তুচ্ছ করতে আমি পারি নে। যে মেয়ে দুর্নামকে ডরায় না, স্বর্গে মর্ত্যে কাকেই বা তার ভয়? কোন কথা শুনতে চাই নে বেহারিদা! যেমন করে পারো এই মাসেই বিয়ের ঠিক করো। দেখ না খোঁজ নিয়ে, কারু বউ-টউ এই এত বড় সহরে কি আর মরে নি? লক্ষ্মীটি! একবার যাও।—শেষ দিকে আদেশের স্বর অনুরোধের ভাবে নরম হইয়া আসিয়াছিল।—কত তো ঘুরেছ, আর একটু মন দাও না, পেয়ে যাবে।

বেহারী এবার বুঝি সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল!

—ও কি বেহারিদা! বেটাছেলের চোখ অমন পানসে কেন? আচ্ছা বেহারিদা! আজ আমি দুটো উচিত কথা বলেছি বলে, যেন তোমার পরে কতই অবিচার করেছি, এমনি করে কাঁদলে? কিন্তু তুমি যখন নাহোক পঞ্চাশটে বর ধরে ধরে বেড়িয়েছিলে, তখন ত তোমার চোখে এক ফোঁটাও জল পড়ে নি? সাধ করে কি বলি, বেহারিদা। লোকে যা বলে হয়ত সবটাই মিথ্যে না! হয়তো তোমার সে গঙ্গাজলে ধোয়া মন আর নেই! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকে বোধ হয়—

—দিদিমণি! দিদিমণি! চুপ করো, চুপ করো; ছি ছি! কি বলচো তুমি? কি বলচো!—বিহারী অকস্মাৎ সর্বশরীরে কাঁপিয়া বুক ফাটা আর্তনাদের মত কথা কয়টা উচ্চারণ করিল। তার দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া শীতার্তের মত একটা শব্দ বাহির হইতেছিল, চোখ মুখ যেন এক মুহূর্তে কোথায় বসিয়া গিয়াছে, পা দুটো এমন কাঁপন কাঁপিতেছে যেন চৌচাপটে এখনি পড়িয়া যাইবে। অপর্ণা নীরবে তার ছাইয়ের মত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু দেখিয়া যে লজ্জা পাইয়াছে, এমন মনে হইল না! তীরটা যে অব্যর্থলক্ষ্যে বিঁধিয়াছে বুঝিতে বিলম্ব ঘটে নাই। কিন্তু বুঝিলে কি হয় শিকারীর করে শিকার করা জীবের শোণিতাক্ত মূর্তি দেখিয়া আদি কবির মত করুণা সিন্ধু উথলাইয়া উঠে? মারিবার জন্যই তো জল্লাদ ফাঁসের দড়ি টানে, মুমূর্ষুর চোখ কপালে উঠিল বলিয়া চেঁচাইয়া কাঁদে নাকি? অপর্ণা রান্নাঘরে ঢুকিল।

বিহারী দাঁড়াইয়া রহিল। অপর্ণা যে তাহাকে এত বড় অবিচার করিতে পারে, ইহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। আজ তার সন্দেহের কাঁটা ভীমরুলের হুলের মত তাহাকে বিঁধিয়া জর্জর করিয়া দিল, ইহা তাহাকে বড় জ্বালাই দিয়াছে।

সমস্ত বেলা কাটাইয়া অভুক্ত বিহারী অপরাহ্নের দিকে শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিল। শোবার ঘরের দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া অপর্ণা তাহাকে আর একচোট বকিল। বলিতে বলিতে আসিল—এতক্ষণ কোথায় ছিলে বেহারিদা? হাঁড়ি হেঁসেল কি উঠবে না? তোমার দিন দিন কি আক্কেল বুদ্ধিই হচ্চে!

সে দুম করিয়া একখানা পিঁড়ি পাতিয়া এক গ্লাস জল আনিয়া সেইখানে ঠক করিয়া বসাইয়া দিল।—নাও, বসো, দুবেলার খাওয়া একসঙ্গেই খেয়ে নাও!

বিহারীর এতক্ষণে সব কথা মনে পড়িল। সারাদিন উপবাস গিয়াছে বটে! লজ্জায় তাহার শুষ্ক মুখ অধিকতর শুকাইয়া গেল।—তোমারও কি খাওয়া হয় নি? তুমি কেন—

'তুমি কেন'র পর আর কি বলিবে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া, চুপ করিয়া গেল, কি বলিলে কি, ঘটে সেকথা তার জানাই আছে।

আজ উহা ঘটিল না। অপর্ণা ভাত বাড়িতে বাড়িতে ঘরের মধ্য হইতে জবাব দিল—আমার বয়ে গেছে আমার অনেককাল খাওয়া হয়ে গেছে, আমি তো নেশা ভাঙ করি নি, যে আক্কেলের মাথা খেয়ে বসে থাকব।

অন্যদিন হইলে এ খবরটা হয়ত বিহারীকে রান্না ঘরের দ্বারে উঁকি পাড়াইত; কিন্তু আজ তাহার মনের সে শক্তি ছিল না, এমনি একটা প্রবল অবসাদ জমিয়া উঠিতেছিল যে, তারই শূন্যতায় প্রাণটা একটা পাখীর পালকের মতই লঘু হইয়া কোন অনির্দেশ্যে ভাসিয়া চলিয়াছিল, হাওয়ার সহিত যুঝিয়া আকর্ষণ কেন্দ্র পৃথিবীর বুকে ফিরিবার সাধ্য ছিল না।

বিহারী কিছুই খাইতে পারিল না। ভাতের গ্রাস চিবাইয়া গলা দিয়া

নামাইতে গেলে চোখ দিয়া জল বাহির হইতে চায়। মেঘে যেন আকাশ ভরা, পৃথিবী বর্ষণ পিপাসাতুর। অপর্ণা তার আহারে অ-প্রবৃত্তি চাহিয়া দেখিল। অন্যদিন হইলে এতক্ষণে এই লইয়া অভিমানের ঝাপটা না মারিয়া থাকিত না। বলিয়া বসিত—আমার হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, দুদিন না হয় মুনিব বাড়ী বামুনভোজন করে এসো। কাল থেকে আর রাঁধবো না।

বিহারীর নূতন মনিব ঈশান সরখেল আলিপুরের উকিল। বিহারী তাঁর কাছে মুহুরিগিরি করিয়া সংসার চালাইতেছিল। ভগবানের ইচ্ছায় সংসারটি যথেষ্ট ছোট এবং মানুষের কৃপায় ভবানীপুর ও কালীঘাটের মধ্যবর্তী জেলেপাড়া ষ্ট্রীটের বাড়ীখানি যদিও স্থাপত্য-বিদ্যার হাতেখড়ি বলিলে চলে, মানুষের হাতে এমন কদর্য বস্তু প্রায় গড়িয়া উঠে না, এর প্রধান গুণ ভাড়া যথোপযুক্তরূপেই সস্তা। আজ সে হাসি-ঠাট্টার ধার দিয়াও গেল না। বিহারীর ইচ্ছা সরিয়া পড়া, কিন্তু বাধা পড়িল, যেমন না খাওয়ার নামান্তর খাওয়া শেষ করিয়া জলের গ্লাসটা তুলিয়াছে, প্রশ্ন হইল—কি হলো বেহারিদা ? খবর মিললো ?

বিহারীর হাত কাঁপিয়া জলসুদ্ধ গ্লাস থালায় পড়িয়া ভাতে-জলে একসা করিয়া দিল। অপর্ণা এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না ; হাসিবার জন্য তার বুকে বাতাস লাগা জলের মত একটা উর্দ্ধোৎক্ষেপ তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছিল ; কিন্তু সে যে আজ না হাসিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ; তাই দাতে ঠোঁট চাপিয়া সেটাকে কোন মতে নিজের ভিতর হজম করিল।

বিহারী এই আকস্মিক বিপৎপাতে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেও, কিছুক্ষণের জন্যও যে এই বিবাহ-পাগলিনী কনের কঠিন সওয়াল হইতে রক্ষা পাইবে, এমন ভরসা সে বড়ই আশার সহিত করিয়াছিল, দেখিল সেটা মনে করা মনেরই বিড়ম্বনা! পর্বত ছাড়িয়া সিন্ধুর উদ্দেশ্যে প্রবাহিতা নদীর মত এ মেয়ে নিজের সম্বন্ধে একটা হেস্ত নেস্ত না করিয়া ছাড়িবে না। পান হাতে দিয়া ডাগর চোখে মুখের দিকে চাহিতেই বিহারী আবার নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ করিল। বুকের মধ্যে ষ্টীমারের চাকা চালার শব্দটা সুস্পষ্ট শুনিয়া, অপর্ণা এখনি কি না

জানি ভাবিতেছে? সেই কল্পনায় মানসিক দুর্দশার যেটুকু বা তার বাকি ছিল, তাহাও ঘটিয়া গেল। তারপর অপর্ণাকে কথা বলিতে উদ্যত দেখিয়া এবার নিজেকে আর সম্বরণ করাইতে পারিল না। তীব্রস্বরে কহিয়া উঠিল—যার তার হাতে দিয়ে তোমায় আমি জলে ভাসাতে পারব না, তা যতই আমায় গাল দাও।

—কেন বিহারীদা! কি এমন আমি অপ্সরী যে, স্বর্গ থেকে বিদ্যাধরকে আমার জন্য নেমে আসতে হবে? তোমার তিনকুলে ত কেউ ছিল না, একটা বানরী পুষে তার আদিখ্যেতাতেই গেলে!—বলিতে বলিতে ধরাগলার স্বরটা স্পষ্ট করিয়া লইয়া—ওমা বেরাল ঢুকলো না কি!—বলিয়াই তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে হাঁড়ির ভাতগুলায় এক ঘটি জল ঢালিয়া ব্যঞ্জনে বাটি ঢাকা দিয়া সেগুলাকে যথাস্থানে রাখিয়া সেদিনকার মত রন্ধনের সার্থকতা লাভ করিল। নিজে কলসীর জল এক ঘটি আলগোছে পেটে পুরিল, তারপর মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। দেখিয়া শুনিয়া বিহারী একটি ছিলিম তামাক সাজিতে না বসিয়াই ছেড়া চাদরখানা লইয়া তখনই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। আজ সকাল হইতে জীবনসর্বস্ব তামাকটুকুর কথাও তার মনে পড়ে নাই। শুধু মন ভরিয়া আছে এই কথাটাতেই যে, অপর্ণা নিতান্ত অকৃতজ্ঞার মত তার এই দুঃখের আশ্রয় ছাড়িয়া কোন এক অচেনা অজানা যে তার সম্বন্ধে ঐ বিরাট শুব্ধ আকাশখানারই মত, ঐ প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া বটগাছটারই মত উদাসীন, তারই অপরিচিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত সংসারে চলিয়া যাইবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে; এবং যতক্ষণ এই নির্বান্ধব বিহারীকে তার শেষ অবলম্বনের যষ্টিটুকু হারা না করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ মুখে আহার এবং চোখে নিদ্রা তার থাকিবে না।

পরের ঘরে তো যাইতেই হইত, এই বিহারীই তো এত দিন তার জন্য এই পরের ঘরখানি দশদিক উল্টাইয়া খুঁজিতেছিল, কিন্তু যাহা অতি অবশ্যই হইবে, তার জন্য এত ত্বরা কিসের? যে দিন কটা অভাগা বিহারী জীবনের বাকি দিনগুলার জন্য সঞ্চয় করিয়া লইতেছিল, তা হইতে একটুখানি কমাইয়া

দিবার এতই আগ্রহ কেন? অপর্ণার বিবাহের পরদিনের দৃশ্য কল্পনায় আসিয়া বিহারীকে কি যেন করিয়া দেয়। অপর্ণার বর খোঁজার উৎসাহ বিলুপ্ত হয়। এই দারুন অপরাধের বোঝা হইতে নিজেকে অপর্ণার ঐ শানানো খাঁড়ার মত ক্ষুরধার মনের কাছ গোপন রাখা—বিহারীর ভাবনাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। অপর্ণার ভাল বরে ভাল ঘরে বিয়ে হয় খুবই ভাল; নইলে যাহার তাহার দুঃখ দারিদ্রের অংশ লইতে অন্যত্র গিয়া লাভ কি। এই ভাবনাটা ভাবিতে গেলেই এটা যে শিকড়ের কাণ্ড—সেইটাই মনে পড়ে। অপর্ণার মার শেষ চিন্তা কোন পথে গিয়াছিল—বিহারী তাহা জানিত এবং তাঁর অনুজ্ঞাও পাইয়াছিল। কিন্তু, উঃ—না, ভগবান! তুমি কি সত্যসত্যই এতবড় অভিশাপ মার মুখ দিয়া মেয়েকে পাঠাইতে চাহিয়াছ? না না ইহা অসম্ভব। দুষ্টা-সরস্বতীর এই কাণ্ড!

কিন্তু, একটা কিন্তু কোথায় আছে। কিন্তু সেই যা মনে করাও অপরাধ না হয় নাই করিল, কিন্তু—এ ও তো হইতে পারে, অপর্ণার মা যখন বিহারী-কেই মেয়ের ভার দিয়াছেন, আর বিহারীর মত অক্ষম যখন বাঙ্গলাদেশে দুইটি নাই, অপর্ণা যেমন আছে, তাই থাক না? যখন তোড়ার মাথায় দিন মিলল না, তখন গাছের ডালই কি নিরাপদ নয়, বিহারী নিশ্চিন্ত ছিল।

আজ তার স্বপ্ন টুটিয়াছে! অপর্ণা যে নিজের বিষয়ে সহসা এত বড় সজাগ হইয়া উঠিতে পারে এ সন্দেহ তার কল্পনাতেও ছিল না বলিয়াই বুঝি এমন ভাবেই সম্ভব হইল!

৪১

বিহারীর দিদিমণি সম্বন্ধীয় অগাধ সাধের মধ্যে একটি মাত্র সাধ সে মিটাইতে পারিয়াছিল। কোন মহৎ মর্যাদার মানদণ্ডস্বরূপ ধনীগৃহের শুদ্ধান্তঃপুরে যদিচ তাহাকে পট্ট-ভট্টারিকারূপে সংস্থাপন করিতে পারে নাই, অসূর্যম্পশ্যা অবরোধবাসিনীর সম্মান হইতে বঞ্চিত করে নাই। এই বাড়ীখানির ঊর্ধ্বে

আর যা থাক, আকাশ ছিল কি না দেখা যায় না। বাতাস, রৌদ্র এবং জ্যোৎস্না এ তিন সহচরী সম্বন্ধে বলিতে গেলে ন তত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্র তারকা—ইত্যাদিকে এ সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে লম্বালম্বিভাবে কাঠের পর্দায় দুভাগ করা একখানি ঘর, ইহারই একটি রন্ধনশালা, আর দোতলায় একটি চিলেকোঠা। কল আনিয়া এই বাড়ীর উপর পয়সা নষ্ট করিতে কোন বাড়ীওয়ালার প্রবৃত্তি হয়? বিশেষ সে বাড়ী যখন ভাঙ্গিয়া পড়িলেও খালি পড়িবে না। অর্দ্ধ অন্ধকার এই গৃহের গৃহিণীটির আর কোথাও অভাব বোধ ছিল না, শুধু জলের অভাবে বাড়ীর বাহির হইতে বাধ্য হওয়ার অপমানটাই তাহাকে বাজিত। পলাশডাঙ্গায় বাকুলে ত্রিবেণীতে সে ঘাটে পথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর যখন মনের কাছে একান্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই ব্যথার গোড়ায় খোঁচা দিলে তাহাতে যন্ত্রণায় আড়ষ্ট করে না, রুষ্ট করে পাশে এক মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীর ঘর। বৈঠকখানার জানালার দুই কবাট খোলা—ঘরের মধ্যে টেরিকাটা চশমাচোখে বাবুর দল তাহাকে বাহির হইতে দেখিলেই যতদূর দৃষ্টি যায় পিছনে পিছনে ধাওয়া করে। ভাগ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ের গতি সীমা নির্দ্দিষ্ট, তাই রক্ষা! কিন্তু ভবানীপুরের অনতি প্রশস্ত রাস্তাটিতেও নারী সৌন্দর্য্যের ইস্পাতে শীলতার মাথা ঠুকিয়া ভাঙ্গিতে স্বেচ্ছাব্রতীর অভাব ছিল না। দ্রষ্টব্য করিয়া ভগবান যে জিনিষ তৈরি করিয়াছেন, দেখিবার জন্যই সৃষ্ট যে চোখ, তাহা ফিরাইলে বিশ্বনিয়মের কোন বিধানটাকে খর্ব করা হয়, সে কথা বুঝিতে পারা কঠিন বইকি! যেদিন আদিগঙ্গার ঘোলা জলে হাসির ঢেউ তুলিয়া পাড়ার রূপসীরা তামাসার মাত্রা কিছু চড়াইলেন সেদিন পাশের বাড়ীর বৈঠকখানায় বাড়ীর বাবু একাই ছিলেন। একা থাকার সুযোগকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া দরজার সামনে আসিয়া, গলা খাঁকরাইয়া, কাশিয়া, পথমধ্যবর্ত্তীর দৃষ্টি, এবং হয়ত বা মনটাকেও তাঁর পরিপাটি টেরীকাটা সাবান ধোওয়া, লাবণ্যহীন মুখের দিকে ফিরাইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। একে অপমানে মন ভিজা কাঠের মত ধোঁয়াইতেছিল, তার উপর শুকনা কাঠের ইন্ধন চড়িল! আগুনটা তাই তেজের সঙ্গেই

জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! একবার তার কান্না পাইল, কিন্তু কান্না তার স্বভাবের বিপরীত। অগ্নিমূর্তি ধরিয়া বিহারীকে দাহ করিতে ছুটিল। তা ভিন্ন আর কাহাকে, কোন হৃদয়হীন পর, কোন অনাত্মীয়ের উক্ত কার্য সে সমাধা করিবে? তার আছে কে?

পরদিন প্রত্যুষে পথে ময়লা গাড়ির সাড়া উঠিতেই ঘড়া কাঁকালে ঘাটের পথে বাহির হইয়া পড়িল। পাশের বাড়ীর নির্লজ্জ দৃষ্টির অপমান সর্ব দেহ মনে কাঁটার মতই ফুটিয়া আছে। মনে ভয় ছিল, আর একবার যদি সেই দৃষ্টির অধিকারী তার প্রাণপণে সঙ্কোচ-কাটান পথ চলাটাকে বিশ্রী বিজড়িত করিতে আসে, হয়ত বারুদের মত ফাটিয়া পড়া হইতে নিজেকে সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

পথ প্রায় নির্জন, ঘাট জনহীন, ওপারে আলিপুরের বাগানে অন্ধকার অতি নিবিড়। অপর্ণার নির্ভীক চিত্তেও ভয় ভয় করিতেছিল। পূবের আকাশ পানে মুখ করিয়া সে তাড়াতাড়ি ডুব দিয়া জলভরা ঘড়া কাঁখে বাড়ীর দিকে ফিরিল। পথে তখন লোক ছিল না, একটা পুরাদস্তুর মাতাল শুধু টলিতে টলিতে, বকিতে বকিতে, 'রাজা উজির মারিয়া', রাত্রির শেষে ঘরে ফিরিতেছে। গভীর আতঙ্কে অপর্ণা ছুটিয়া বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িল। মাতালটা একটু বেশী মাতাল, সে উহাকে লক্ষ্যও করে নাই।

—ভয় পেয়েছ? ভয় কি? ও কিছু বলবে না—পিছনে কথার সাড়া পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে ফিরিতেই দেখা গেল, মাতাল নয়, কিন্তু পাশের বাড়ীর সেই বাবুটি। যার দর্প ভিন্ন আর কিছু নাই—দর্পহারী তার সেই দর্প টুকুই চূর্ণ করিতে, বুঝি আনন্দ পান? বাবুটি তার সাড়া পাইয়া—অথবা দৈবাৎ সেই অতি প্রত্যূষেই উঠিয়া আসিয়াছিল, বলা যায় না। অপর্ণা তার অভয়বাণী ও উৎসুক দৃষ্টি সহিয়াই বাড়ী ঢুকিল। বিহারী তখনও ঘুমাইতেছে।

প্রভাতে মা দুর্গার নাম লইতে গিয়া বিহারীর তাঁরই নামান্তরের কথা মনে পড়িল। আজ আবার অপর্ণা কি করে? কালকের কথা ভুলিয়া গিয়াছে অথবা যেমন কিছুই ভোলা তার স্বভাব নয়—এও ঠিক মনে করিয়া বসিয়া

রহিল? তাল পাকাইয়া ভাবনাগুলা মনের মধ্যে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘরের মধ্যে থাকিতে অথবা বাহিরে যাইতে ভয় ভয় করিতেছিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ তো আর ভয় করিয়া বসিয়া থাকা চলে না, ভয়ে ভয়েই বাহির হইতে হইল। দেখিয়া বিস্মিত হইল ইতিমধ্যে অপর্ণার স্নান সারা হইয়া গিয়াছে, লম্বা চুলের শেষে গ্রন্থি বাঁধিয়া কালো চুলের রাশি কাপড়ের উপর ছড়াইয়া দিয়া সেই রূপসী তরুণী দরিদ্রের সুখস্বপ্নের মত অন্ধকার পুরী আলো করিয়া বাটনা বাটিতেছে। শিলের উপর নোড়া ঘসিলে যে হাতের এমন বাহার খুলে এ ধারণা কার থাকে? সরু সাদা শাঁখা পরা ভুজ মৃণালের আন্দোলন-চঞ্চল দুখানি হাতের পানেই তার প্রৌঢ় চোখের দৃষ্টি অনিমেষ হইয়া রহিল।

—বেহারিদা! সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বাজার আনতে হবে, না আজও তোমার অক্ষিধে?—এই কথা বলিতে বলিতে অপর্ণা সহজ-ভাবেই মুখ তুলিল।—ডাল এনো, নুন, গুড়, হলুদ, এগুলোও ফুরিয়ে গেছে।

এই যে হুকুম বিহারী পাইল, এর বদলে আর কি পাইলে সে এই রকম খুশি হইত, দুঘণ্টা ভাবিলেও সে আন্দাজ করিতে পারিত না! হনহন করিয়া বাহির হইয়া গিয়া কালীঘাটের বাজার হইতে আবশ্যক এবং অনাবশ্যক জিনিস পত্র যা পারিল, গামছা ভরিয়া আনিয়া হাজির করিল। ইচ্ছা করিয়াই একটু অনুচিত খরচ করিয়া আসিল, যাহাতে করিয়া অপর্ণা তার বাঁকা ভ্রুজোড়ায় গুণ টানিয়া অমিতব্যয়িতার জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে পারে! কাল সেই সাংঘাতিক বিষবাণ ছুঁড়িবার পর এ পর্যন্ত আর তো তার সঙ্গে মুখের কথাও একটা কহে নাই!

অপর্ণারও আজ ইহাতে অনিচ্ছা ছিল না। চাবুকের ঘায়ে পিঠ ছিঁড়িয়া বুকের মাঝখানে আঘাত লাগিতে লাগিতে পাছে দণ্ডশেষের পূর্বেই দণ্ডিতের প্রাণটা দণ্ডদাতাকে ফাঁকি দিয়া পালায়, তাই দণ্ডিত হতভাগ্যকে পুলিসে যেমন একটু দম লইতে দেয়, সেও সেইরূপ কর্তব্যজ্ঞান প্রণোদিত হইয়া এই অভাগাটাকে আজ একটুখানি দয়া করিতে চাহিয়াছিল। বাজার দেখিয়া

মনে মনে হাসিল। মুখে বিরক্তি প্রকাশও করিতে ছাড়িল না—এ কি করেছ বেহারিদা! বাজার যে উজাড় করে এনেচো! কাল উপোস করিয়েছ বলে আজ ঘটা করে পারণ করিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে না কি?

বিহারীকে এই সহাস্য অনুযোগ ছুরির খোঁচা মারিল! সে তখনি ব্যাকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—সে কি দিদি কাল তুমি কিছু খাও নি? তবে খেয়েছ বললে কেন?

—কেন বলবো না? তুমি কি ভাল করে খোঁজ নিয়েছিলে।—অপর্ণা মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াওয়ালা চিংড়ি মাছ চুপড়িতে তুলিতে লাগিল। তাদের মধ্যের জীবন্তটা লাফাইয়া লাফাইয়া চুবড়ি-সই হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল। বিহারীর গলার কাছে কিসের একটা পুঁটুলি ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। তার যে কি যন্ত্রণায় দিবারাত্রি কাটিতেছে, সে যে কেন তার খাওয়ার খবর লইতে সাহস করে নাই, তাহা সেই জানে।

বাহিরে অপরিচিত নারীকণ্ঠে কে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—হ্যাঁ, গা, এই না একের সাত জেলেপাড়া ইষ্টিরিট? এই বাড়ীতে চক্কোত্তি মশাই বাস করে?

—কি মশাই—তা জানি নি, মহাশয় একটি থাকেন, তোমার অত খোঁজ কেন?

—চক্কোত্তি মশায়ের কাছে পাত্তরের খবর নিয়ে এসেচি গো!

—অ্যাঁ! তা আমার খবরটাও তাঁদিগে একটু দিয়ে দিও না, আমিও তো একটি পাত্তর রয়েচি এমন মন্দই বা কি?

অপর্ণা মুখ তুলিয়া দেখিল, বিহারী কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। আগন্তুকার প্রাতঃ প্রণামে—সে তাহাকে বাহ্য ভদ্রতার খাতিরে একটা আশীর্বাদের ছলনা পর্যন্ত করিতে পারিল না, বরং তার মুখে এই ভাবটাই ফুটিয়া উঠিল—মরবার আর ঠাঁই পাও নি! হুট করে একেবারে এখানে এসে উপস্থিত হলে? দুষ্ট গ্রহের যে কুদৃষ্টিটুকু কাটিয়া আসিতেছিল ইহার ঘাড়ে চাপিয়া ফিরিয়া আসিল!

ঘটকী ঠাকুরাণী আসন জল পাদ্য এবং অর্ঘ্য, দূরের কথা, মুখের একটা 'এসো' 'বসো' না শুনিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবসার খাতিরে এঁদের অনেক রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে হয়, সহিতেও হয় কিছু কিছু—তাই এই নির্লিপ্ত মৌনতার সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্য গায়ে না মাখিয়া বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁগা বাবা ঠাকুর! এইটি বুঝি তোমার কনে? যা বলেচ—রূপসী বটে! লাখের মধ্যের একটা! তা দেখ গা! তুমি ঐ রাজার ঘরেই এনাকে দিয়ে ভাও। এতে আর দো-মনা হয়ো না। ভাগোর মেয়ে, রূপের ডালি মেয়ে, হলোই বা সতীনে! সতীনটে তো কালো শুঁটকো; তারা সোন্দর মেয়ে দেখিয়ে ঐ মেয়ের সঙ্গে বে দিয়েচে। সেই রাগে রাণীমা বরণ করে বউ তোলেন নি! আর কুমার বাহাদুরও দিনের তরেও সেই কালপেঁচাটার মুখ দেখেন না, এমন কি পাছে চোক্ষের দেখাটুকুন হয়ে যায়, সেই ভয়ে বাড়ীর মধ্যেই ঢোকেন না। এই মেয়ে নিয়ে তাদের ঘরে দেখালে, মা-বেটাতে নেচে ওঠে! মরি! মরি! যেন পোটোর হাতের এঁকে তোলা বিবির পট! যেন মা জগদ্ধাত্রির প্রতিমে!

অপর্ণার আত্ম-প্রশংসায় যেটুকু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল, ইহার আনিত বরের খবরে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি সেটুকু রাহুর মতই গ্রাস করিয়াছিল। সে বিহারীর পানে কটাক্ষ করিয়া তার অটুট সহিষ্ণুতায় উত্যক্ত চিত্তে অধর দংশন করিল। কোথা হইতে এ মাগিকে জুটাইয়া আনিল! নিজে বুঝি আর মেহনত করিতে মন লাগে না! কেন? গতরে হইয়াছে কি? সে কি পৃথিবীসুদ্ধ ঢেঁড়া পিটিতে বলিয়াছিল?

বিহারীর ভাব দেখিয়া ঘটকী কিছু বিরক্ত হইতেছিল, কহিল—কিগো, চুপ করেই রইলে যে? কি করবে তাই বল? তারা এবার মেয়ে নে গিয়ে নিজের চক্ষে দেখতে চায়।

বিহারী কুণ্ঠিত মুখে অপর্ণার মুখের দিকে চাহিল। এই ঘটকী মাগিকে তাহার, এমন কি মারিয়া বিদায় করিতেও ইচ্ছা যাইলে কি হয়—ইহার ভয়েই সে মুখ বুজিয়া আছে—পাছে সে এই রাজবাড়ীর সম্বন্ধ ভাঙ্গিলে

বিহারীকে দোষে। অপর্ণা তো আর সে অপর্ণা নাই! কিন্তু তাই বলিয়া বেহারীই বা এতটা কি করিয়া সহ্য করে? এমন একদিন ছিল যে দিন অপর্ণাকে বাড়ী আসিয়া পাত্র দেখার জন্য মাথা খুঁড়িয়াও বিহারী রাজী করিতে পারে নাই। আর আজ? সেঁকরা বাড়ীর অলঙ্কারের মত সে অন্যের বাড়ী বহিয়া ওজন হইতে যাইবে? তারপর একটা কুচরিত্র, পত্নীত্যাগী মাতালের হাতে বিহারীর এই পূজার ফুল হইবে বিলাসের খেলনা! বিহারী বাঁচিয়া থাকিয়া চোখ দুইটার মাথা না খাইয়া ইহা দেখিবে? অপর্ণার মুখেও অসন্তোষের চিহ্ন! কিন্তু সেটা কিসের, তা সুস্পষ্ট নয়! বিপন্ন বিহারী কুণ্ঠার সহিত কহিতে লাগিল—তাঁরা যদি দেখেন সে তো ভালই। তা তাহলে সে কবে—তার মানে কি, কোন দিন—কখন তাঁদের বাড়ী আমাদের যেতে হবে, সেইটা তাহলে—তার মানে কি, এই তুমি গিয়ে নিজেই ঠিক—

নিজের কানে নিজ বাক্যের অর্থবোধ হইতেছিল না বলিয়া বিহারী মানেটা অপরকে বিশদভাবে বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু এ গ্রহের ভোগ-কাল নাকি স্বল্পস্থায়ী, অপর্ণা হঠাৎ প্রখর চোখের দৃষ্টিতে বিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ঘটক-কন্যার পানে সন্ধ্যা তারার মত দীপ্ত দৃষ্টি স্থির করিল; কহিল—এই জন্যই বলে বুড়ো হয়ে বাঁচতে নেই! দেখ গা! তুমি রাজবাড়ীতে অন্য বউ এনে দাও গে, আমাদের গরীবের রাজরাজড়া পোষাবে না।

ঘটকী এই বয়সে অনেক বরকনেরই ঘটকালি করিয়াছে, কিন্তু কোথাও স্বয়ংসিদ্ধা কনের ঘটকালি করে নাই। বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল—তা মা, হলে কিন্তু মোহরের গদি পেতে বসতে! কি সুখ, কি ঐশ্বর্য্যি সে তো চক্কবত্তি মশাই নিজ চক্ষে দেখেই এয়েচে—হয় নয় ওনাকেই জিজ্ঞুস না! বাবাঠাকুর যে এক্কেবারে সাঁজ জালার পর গেলেন, একে পুরুষ বেটাছেলে, তায় ধনের অন্ত নেই, পাঁচটা ইয়ার নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ আর করবে নি? উনি ঐতে খাপ্পা হয়ে চলে এলেন! একি তোমার গে, ডেপুটি মুনসোব, না উকীল-ডাক্তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কি এরা মহারাণীর মুখ দেখে! এদের লোর সিন্দুকে টাকায় ছাতা ধরে, ধামা ভরে পুকুরঘাটে ধুয়ে আনে।

কত বড় বনেদি ঘর! দেশে দু-দুটো হাতী বাঁধা। যদি বল সতীন—সেও তো বন্ধ্যা একেবারে তেজ্যি!

অত বড় জানোয়ার দুইটার লোভেও অপর্ণার একরোখা মন টলিল না, সে অনায়াসেই বলিয়া গেল—ও বাছা এদের চলবে না। আর খবর থাকে তো বলো।

বিহারীর এতক্ষণকার যম-যন্ত্রণা অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছিল, আবার উদ্বেগের কম্প দেখা দিল। নম্বর দুইও তার অজ্ঞাত নয়।

ঘটকী-ঠাকুরাণীর লাভ লোকসান নাই। পাত্র দুইটির জন্যই তার হাতের কনে একটি ব্রহ্মাস্ত্র! যেখানেই প্রয়োগ করুক, দুজনের অবস্থার যা প্রভেদ তার পাওনায় তা হইবে না। বিহারীকে ছাড়িয়া এবার এই বরের খবর অপর্ণাকেই ঘটা করিয়া দিল। বর মাত্র বৎসর চারেক সরকারের কাছে পেনসন পাইয়াছেন। তৎপূর্বে বড় একটা কেও-কেটা ছিলেন না, সদরে সদরে 'আধা' জজের কাজ করিয়াছেন। পুনর্বিবাহে ইচ্ছা তাঁর ছিল না। স্ত্রী প্রায় দশ বৎসর মারা গিয়াছেন, কিন্তু গত অঘ্রাণে কুড়ি বৎসরের একমাত্র পুত্র বিবাহের সাতদিন মাত্র পরেই পিতৃপুরুষদের জলপিণ্ডের আশা বিলুপ্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল, নিরুপায়েই শুদ্ধ বংশরক্ষার খাতিরে বধূ আনিতে হইতেছে। পাত্রের অবস্থা অত্যধিক ভাল। একে বড় চাকরে তার উপর ঘরে এক বিপুল ধনবতী বিধবা কন্যা আছে। মেয়েটি নিঃসন্তানা তার সম্পত্তিতে ভাগীদারও নাই। সধবা অন্য মেয়ে পতিগৃহে বহু কন্যাপুত্র পরিবৃতা। রাজপুত্রীরা যেমন স্বয়ম্বর-সভায় দাঁড়াইয়া মগধের অথবা উজ্জয়িনীর রাজপুত্রের কণ্ঠে হস্তধৃত মাল্য অর্পণ করিবেন, কঞ্চুকী প্রমুখাৎ রাজা-রাজপুত্রদের পরিচয়-কীর্তিগাথা শ্রবণান্তে সে বিষয়ে ঈষৎ চিন্তা করিয়া লইতেন বোধ করি তাহারও মনে সেইরূপ সমস্যাই সমুপস্থিত হইয়া থাকিবে! সপত্নী-যুক্ত বরটির বয়স কম, সতীন বেচারীর মুখ চাহিয়া 'হস্তিপুরে'ই প্রবিষ্ট হওয়া হয়ত উচিত। হাসি পাইল, বেহারিদার রাজরাণী করার সাধটাও অন্ততঃ মেটে, কিন্তু ভোরবেলার সেই মাতালটাকে মনে পড়িতেই বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। ওরে

বাবা! অমনি একটি দুরন্ত-জীব লইয়া জীবনযাপনের চাইতে নিরীহ বৃদ্ধই নিরাপদ!

বাক্যবিমুখ বিহারীর দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়াই বলিল—আমার মত আছে; ওদের বলে দিও।

স্প্রিঙের মত লাফাইয়া উঠিয়া, তেমনি কাঁপা গলায় বিহারী চিৎকার শব্দে কহিয়া উঠিল—না, না, না—আমার একটুও মত নেই! আমি ওখানে বিয়ে হতে দেবো না কোন মতেই না। ভাল পাত্তর খুঁজবো—

—তুমি ওর কথা শুনচো কেন বাছা, তুমি যাও। বলি নি কি তোমায় বুড়ো হয়ে ওর ভিমরতি ধরেছে? দেখতে পাচ্ছো না দশা!

—তবে এই কথাই রইলো মা—দেখবেন শেষটা আমায় জোচ্চোর হতে না হয়। আহা মা গো! কথায় বলে লক্ষ্মীর মা ভিক্ষে মাগে এ দেখচি ঠিক তাই! তোমার এই রূপ, এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় কি তোমায় মানায় মা? আজ তবে এসি! দেখা শোনা তারা করবে না, আমার কথাই তাদের বেদ। এক্কেবারে এসচে রোববারে সাথে করে আশির্বাদ করতে নে আসবো।

—তা করবে মা! একখানা ভাল গয়না দিয়েই আশীর্বাদ করবে। সে সব গয়নাই বা কি! এক একখানা যেন থান ইঁট! এই তোমার গায়ের রঙের মতই সব বন্ন! তা এমন রং নইলে কি সোণা মানায়! বলে, এনা চন্নন কে না পরে, কপালগুণে চন্নন ঝলমল করে।

৪২

নির্মল উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ধীরার অসুস্থতার স্বভাব-মৃদু চলন অধিকতর মন্দ হইয়াছে—স্বল্প ভাষা প্রায় বন্ধ, মুখে সকরুণ হাসির যে রেখাটুকু স্পন্দিত হইত, সেও যেন করুণতর দেখাইয়া নির্মলের চিত্তকে বেদনাশ্রু মাখাইতেছিল। অপরাহ্নে ছাদে বসিয়া পড়া ও শোনা চলিত। পূর্বের ন্যায় ছাদে আসলেও বুঝা যায়, সে যেন বঙ্কিমবাবুর পুস্তকে মন দিতেছে না। মন যেন উদাস হইয়া

কোন বিজনে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুস্তক হইতে চোখ তুলিয়া দেখিয়াছে সে গভীর অন্যমনস্ক। চক্ষু দেখে না যার, কর্ণ তাহার একাগ্র হইয়া শোনে, কিন্তু আজ সেই দৃষ্টিহীন বিশাল নেত্রদুটির ন্যায় কর্ণদ্বারও যেন নিরুদ্ধ! বইখানি মুড়িয়া এ দিন নির্মল কাছে সরিয়া আসিল। উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল—শরীর ভাল নেই?

আবার সেই শরীর! ধীরার বক্ষে দুর্জয় অভিমানের তুমুল তরঙ্গ বেগে আঘাত করিয়া উঠিল। হতভাগিনী ধীরার এই ছাই ভস্ম শরীরটাই কি সব? ধীরা বলিতে কি শুধু তার এই ছার দেহখানাকেই বুঝায়? আর কি কিছুই নাই? কঠোর তিরস্কারের অনুকল্প ক্ষীণ হাসিমাত্র হাসিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—ভাল আছে।

—ঠিক বলচো? অসুখ যেন লুকিও না। এখান থেকে সহর বেশ কিছুটা দূর। এখানে এমন কি একখানি গাঁ পর্যন্ত নেই।

ধীরা ইহার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধে চুপ করিয়া রহিল। নির্মল বলিতে লাগিল—কদিন থেকে মনে হচ্চে, তোমার কি যেন অসুখ করেছে! নতুন-ঝি বলছিল, কিছু নাকি খাচ্চো না। রাত্রে মনে হলো, যেন কেবলি পাশ ফিরচো। মুখটাও বেশ শুকিয়ে গেছে। কেন ধীরা! কি হয়েছে, আমায় বলচো না কেন? মাথা ধরেছে? সর্দি হয় নি তো? কি হয়েছে বল? সেই ঝড়ের রাত্রে ঠাণ্ডা লেগেছিল বুঝি? এবার না হয় বাড়ী ফিরি! কোন সময়ে ঠাণ্ডা লেগে যাবে, কি হতে কি হবে, আর জলের উপর থাকে না।

বাড়ী ফিরিবার কথায় ধীরা যেন আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। বন্দীর মনে কারাগারের স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। আবার সেই নিরানন্দ গৃহ-কোটরে বদ্ধ হইতে হইবে?

নিরানন্দ? গৃহ-কোটর? হা অদৃষ্ট! তার আবার আনন্দ কোনখানে! স্বাধীনতার মুক্ত-ভূমিই বা কোথায়? কিন্তু হোক তা, এও তবু ঢের ভাল! কেন সে বেশী লোভ করিতে যায়? সেখানে এটুকুও যে পাইবে না!

নতুন-ঝি বলিল—দিদিমণি! তোমার শরীরটে দেখি ভাল নেই! খাওয়া দাওয়া তো একপেরকার ত্যেজ্যই করেচ। ওষুধ পত্তর খাও না বাবু, জামাই বাবুকে বলবো—

যে কখন কাহাকে 'তুমি' ভিন্ন 'তুই' বলে না, সেই বিনীত-মূর্তি ধীরা সহসা এই কথায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—পোড়ারমুখি! ওষুধ খাবে না ছাই খাবে।—খবরদার কারুকে কিছু বলতে পাবি নি।

ঝি অবাক হইয়া গিয়া কহিল—ওমা সে কি দিদিমণি! একে তোমার এই কাহিল শরীর সময়ে ওষুধ না পড়লে বড় ব্যায়রাম হয়ে যাবে যে!

সেই রকম জ্বালাময় কঠিন কণ্ঠে ধীরা পুনশ্চ গর্জিয়া উঠিল—হয় হবে, আমার হবে, তোর কি? তুই চুপ করে থাক।—তারপর অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বালিসে মুখ গুঁজিল। ঝি অপ্রতিভের একশেষ হইয়া চাহিয়া রহিল।

ধীরা এই যে নিজের বুভুক্ষু চিত্তের নিদারুণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া সুগভীর অভিমানে আবক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া রহিল, ইহার ফল কিছু ফলিল কি? কি করিয়া ফলিবে? সংসারের জীব হইয়াও তো নির্মল সংসারী নয়। সে কেতাবে পড়িয়াছে, পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা পরম ধর্ম! তাই সে সর্বস্ব পণ করিয়া পরার্থ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ধীরার জন্য ভাবনায় সে রাত্রে ঘুমাইয়া স্বস্তি পায় না। কিসে সে ভাল থাকে, সুখে থাকে, এই চিন্তায় দিনের অর্দ্ধেকটাই কাটিয়া যায়। আহা বিধিবিড়ম্বিতা! কিন্তু বিধাতা যা করেন তাঁকেই সাজে, মানুষ সে তার এই অপার দুঃখের উপর আরও দুঃখ দিতে পারে না। সকল লোকেই নিজের স্ত্রীকে যত্ন আদর করে, ভালও বাসে একথা তার অজ্ঞাত নয়; সে ভালবাসা স্বার্থ মিশ্রিত। তাদের দেওয়ার অর্দ্ধাংশই নিজের প্রাপ্য। স্বার্থ-সুখ বিজড়িত সে ভালবাসার কথা ভাবিতে সে লজ্জায় মরিয়া যায়! ধীরার শরীর মনের উপর বিন্দুমাত্র দাবী না রাখিয়া এই যে সে তাহাকে ভালবাসিতেছিল; এইটাই তার কাছে স্বামীত্বের আদর্শ। ধীরার মানসিক বার্তা এইজন্যই তার মনের তড়িতে কখনও স্পর্শ

করিতে পারে নাই। তাহার কর্তব্যে সে এতটুকু ত্রুটি ঘটিতে দেয় নাই, দিবেও না।

একদিন অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল! মধ্য-শরতের এক চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল সন্ধ্যায় সুদূর ব্রহ্মদেশে এই নির্জন নদীবক্ষে সহসাই প্রিয়তম বন্ধু যতীশ্বরের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। এ সাক্ষাৎ একান্তই অপ্রত্যাশিত! এ সংসারে দুষ্প্রাপ্য বস্তুলাভের মত আনন্দদায়ক বুঝি কিছুই নাই! ইহাকে পাইয়া গভীর সুখে বিভোর নির্মল শিশুর মত ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল।—উঃ! কত দিন পরে যতি, কত দিন পরেই যে তোমায় আবার দেখলাম!

যতীশ্বর নির্মলের অপেক্ষা মাস কয়েকের ছোট। দুজনে আবাল্য বন্ধুত্ব। হাসিয়া উত্তর করিল—তোমার কাছে কি এখনও কালচক্র পূর্বের মতই চলচে নাকি, নিমুদা? আমরা বলি, বুঝি সে অচল হয়ে গেছে।—প্রথম সাক্ষাতেই প্রচ্ছন্ন অভিমান ব্যক্ত হইল।

কিন্তু এই সূক্ষ্ম সূচিকাবেধে নির্মলের কি করিবে? সে তখন আশাতীত আনন্দে বালকের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অজস্রধারে প্রশ্ন বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কে কেমন আছেন ও আছে? পিসিমা? পিসেমশাই? —বড়দা (পিসিমার জ্যেষ্ঠপুত্র)? নবীন (সর্বকনিষ্ঠ)? মেয়েরা? একজনের নাম শুধু মুখে আনিতে পারিল না। কণ্ঠাগ্রে হরকালকূটের ন্যায় আটকাইয়া রহিল, তাই বুঝি এমন আনন্দোচ্ছ্বাসটাও সহসা দুষ্ট-স্মৃতির তাড়নায় প্রহতও হইল। যতি কি সব শুনিয়াছে? তিনি কি জগৎসমক্ষে এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক চাপিয়া রাখিবেন? কেন রাখিবেন?

যতীশ্বর কহিল—দেখলেম, তোমার এই সাগরপারে যাত্রার ঋষি অগস্ত্য, ছন্দ মহাপ্রস্থান, অগণ্যা সুযোগ উপস্থিত দেখে নিজেই লাফ মারলেম! সত্যি নিমুদা! ব্যাপারখানা কি তোমার বলো তো? বউ কি আর কারু হয় না? কিন্তু বধূ-সমুদ্রে এমন করে তলিয়ে যেতে সব্বাই যে পারে না, এও ঠিক! মা বলেন --

পশ্চাতে মৃদু মৃদু অলঙ্কার-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া দুজনেই ফিরিল। নির্মল যতীর হাত ছাড়িয়া কাছে আসিল—ধীরা! যার কথা তোমায় উঠতে বসতে বলি আমার সেই ভাই যতী এসেছে।

ধীরা কলের মত কহিয়া উঠিল—খুব খুশী হয়েছি। আপনার কথা আমি অনেকবার শুনেছি।

যতীশ্বর বৌদিদির লজ্জাহীনতায় ঈষন্মাত্রায় বিস্মিত হইলেও নমস্কার করিয়া সহাস্যে কহিল—এসেছি বটে, তবে ভয়ে ভয়ে, আশা ত্যাগ করেই এসেছি।

বিস্মিতা ধীরা প্রশ্ন করিল—কেন?

—কি জানি ভাই! তোমার কটাক্ষশরে আমার নিমুদার মত মহাদেবও যখন কায়-মনে অসার-সংসারের সার গ্রহণ করেছেন, তখন ক্ষুদ্র প্রাণী আমাদের আর ভরসা কি? জানতাম এ নাকি কামরূপ কামাখ্যারই একচেটে ছিল, এখন দেখছি—ভারতের সব বিদ্যার মত কটাক্ষ-বিদ্যাও সাগর লঙ্ঘন করেছে!

ধীরা ও নির্মল উভয়েরই বক্ষ ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র একটা শ্বাস একসঙ্গে উত্থিত এবং একসঙ্গেই পতিত হইল। যতী শব্দ পাইলেও এর মর্ম বুঝিল না, মনের ঝোঁকেই বলিয়া যাইতে লাগিল—অনেকদিন ধরেই আসবো আসবো করছি, মা রাজী হন না। বোধ করি বা মনে করেন, একটি একটি করে বাড়ীর ছেলে-গুলির যদি মানব জন্ম ঘুচে 'ভেড়া' জন্ম দাঁড়ায়, তাহলে সুবিধে হবে না! অনেক করে বুঝিয়ে এসেছি ত্রিরাত্রি বাস করে, ঐ নিরীহ জীবের উপনিবেশ বৃদ্ধি করবো না—বাণাহত হবার উপক্রম দেখলেই—

ধীরা ঈষৎ চঞ্চল হইয়া—নতুন ঝিকে ডেকে দিই, ঠাকুরপোকে খাবার দিক।—বলিয়া চলিয়া গেল। প্রসঙ্গটা চাপা পড়িল। নির্মলকে নীরব দেখিয়া যতীশ্বর ব্যঙ্গ করিল—কি নিমুদা। 'ট্রেসপাস্' করিচি বলে রাগ করলে না কি?

নির্মল চটকভাঙ্গা হইয়া উত্তর করিল—না, তুমি বোধ করি জান না?

—কি?

—আমার স্ত্রী অন্ধ—

—সত্যি!—বলিয়া যতী বিস্ময়ে আঁৎকাইয়া উঠিল—ওঃ! বুঝেছি! আমায় মাপ করো। আমি, আমরা কেমন করে জানবো বলো? কামাখ্যায় আর সাগরপারের তাহলে আসমান-জমিন ফারাক!

৪৩

যতীশ্বর ডাক্তার। কলিকাতায় প্র্যাকটিস সুরু করিয়াছে। এক ধনী মাড়ওয়ারী রোগী ব্যবসা উপলক্ষে আসায় সে সঙ্গে আসিয়াছে। তিনি-চার দিনের ছুটি লইয়া জলপথেই সে এদের খোঁজে আসিয়াছিল—নিশানা দিবার লোক ব্রজর নিকট চাহিয়া লইয়াছিল।

নির্মলের পক্ষে এ কটা দিন সুখ স্বপ্নের মতই অপূর্ব! দুই বৎসরাধিক দেশ ও আত্মীয়জন হইতে সে নির্বাসিত। সে সব তার কাছে এখন যেন কোন সুদূর অতীতের স্মৃতি! একঘেয়ে জীবনের মাঝখানে এই কয়টি দিনের আকস্মিক অভ্যুদয় তার নিকট একান্ত আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল। এ কয়দিন নিজের সুখে সে যেন বর্তমানকে ভুলিয়া গেল; এমন কি, ধীরার তত্ত্বাবধানেও ত্রুটি ঘটিতে লাগিল।

যতী একদিন কথাটা পাড়িল। বলিল—সব জিনিষই দেখছি দূরে থেকে দেখায় ভাল! দেশে থাকতে মনে করতুম—তোমার খুব সুখ। সত্যি কথা বলতে কি বহু চেষ্টায়ও যখন সারাদিনে দুটো টাকাও আনতে পারি নে-তখন এক এক সময় তোমার উপরও একটু হিংসাও হয়েছে! ভেবেছি তোমার কি বরাতের জোর! উপকথাকে সার্থক করে রাজকন্যে আর অর্ধ রাজ্য পেয়ে মজা মারচো; আর আমরা—যাক এখানে এসে সে ভ্রম ঘুচলো। মোহরের গদি পেতে বসলেই মানুষ সুখী হয় না।

নির্মল এর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। করিতে গিয়াছিল, পারিল না! বাস্তবিক সে কি সুখী হইয়াছে?

দুজনে বজরার ছাদে নক্ষত্রালোকে বসিয়াছিল। যতীশ্বর বলিতেছিল—তুমি দেশে যাও না, মা দুঃখ করেন; বলেন—এত করে মানুষ করলুম, ধনী হয়ে নিমু আমায় একেবারেই ভুলে গেল! আমাদেরও এতে কষ্ট হতো, রাগও হতো। কিন্তু দেখছি তোমার পায়ে সোণার শিকল বাঁধা, নড়বার উপায় নেই! আচ্ছা নিমুদা চিরদিন এই কাণা ঘাড়ে বয়ে তোমার কি সুখ হবে ভেবেছ? এর চেয়ে গরীব থাকলে মনের সুখে ত থাকতে। এ যে বিষম গলগ্রহ!

নির্ম্মল ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিয়া করুণকণ্ঠে কহিল—ভুল বুঝো না যতি! ধীরা অন্ধ বলে আমার খেদ নেই। সে যদি এমন দুর্ভাগ্য না হতো, তা হলেই বরং আমার এ অবস্থা সহ্য করা কঠিন হতো।

নদীতীরে কোথাও সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া থাকিবে, বাতাস গন্ধভারাকুল। জল আনন্দে বহিয়া যাইতেছে। যতীশ্বর অস্ফুট সন্দেহে নির্ম্মলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল—সে আবার কি?

নির্ম্মলের মুখ বিষাদ-প্রচ্ছন্ন, সে ধীরে ধীরে উত্তর করিল সে কথা আমি তোমায় বলতে পারবো না। তবে জেনে রেখ, তুমি যে ক্রমাগত আমায় প্রশ্ন করচো—তোমার সে হাসিমুখ গেল কোথায়? তোমার মনে সুখ কই? তুমি অমন হয়ে গেছ কেন? যদি সত্যই তেমন কিছু ঘটে থাকে, আমার স্ত্রীর অন্ধত্ব তার হেতু নয়।

যতী এ কৈফিয়তে আস্থা স্থাপন না করিলেও উহার কণ্ঠস্বরে যেন অবিশ্বাস করিতে বাধিল। তথাপি প্রতিবাদ করিল—তা তুমি যাই বলেই ঢাকা দাও নিমুদা—ঢাকা ত ভাই পড়চে না। আমি জোর করে বলছি, ঐশ্বর্যের এই রত্নসিংহাসনে বসেও তুমি একটুও সুখী নও! শুধু সুখী নও নয়, অসুখী! বলবে বিষয়-চিন্তা? না! বিষয়-চিন্তা কি এই রম্য প্রকৃতির মাঝখানে পরস্পরাশ্রয়ী নবদম্পতির মধ্যে এমন বিরাট কালো ছায়া ফেলে রাখতে পারে? তোমাদের মধ্যে প্রেম কই? বলতে চাও—স্ত্রীকে তুমি সত্যকার ভালবাস?

নির্মল এই দৃঢ় প্রশ্নে বিচলিত হইল কিন্তু স্থির স্বরেই উত্তর করিল—হাঁ, বলতে চাই ধীরাকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। হয়ত যাদের চোখে দৃষ্টি আছে তাদের যত ভালবাসা যায় তার চাইতেও ভালবাসি। ওকে সুখে রাখাই জীবনের এখন আমার ব্রত। এ জন্মে অন্য কোন কাজই নেই।

—ঈস! পরার্থে আত্মবিসর্জন?

—তা কেন? আমি তাকে ভালবাসি। ভালবাসার কাছে আত্মবিসর্জন কি এই প্রথম?

—ভাল ত ছাই বাসো! যে তোমায় চোখেই দেখলে না, তাকে কেমন করে সত্যিকার ভালবাসতে পারো? আচ্ছা যদি এত ভালই বাস—দুজনে স্বতন্ত্র থাক কেন? এ সব কি ভালবাসার পরিচয়?

নির্মল মৃদু হাসিল - এটাকে দুর্লক্ষণ মনে হলো? আমি তাকে নিজের জন্যে ভালবাসি নে তারই জন্যে বাসি। ইচ্ছা আছে চিরদিন যাতে এই ভাবেই বাসতে পারি সেই চেষ্টাই করবো।

যতীশ্বর একটু চুপ করিয়া রহিল। তার পর স্রোত ফিরাইয়া বলিয়া ফেলিল—তা নেহাৎ মন্দ ঠাওরাও নি! কিন্তু ভাবচি তোমাদের এই বিপুল সম্পত্তির ভবিষ্যতে হবে কি? সন্তান যদি না হয় ভোগ করবে কে? শুনেছি তোমার শ্বশুরের অনেক কষ্টের টাকা।

—জনসাধারণের চাইতে ভোগ করবার যোগ্য পাত্র আর কে আছে?

তা বটে—তবু। যাক ওসব ভেবে কুলকিনারা পাওয়া যায় না। এদিকেও তো মস্ত বড় ভাবনার কথা রয়েছে। ধর যদি তোমার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মায় সেও হয়ত মায়ের অন্ধত্ব নিয়ে জন্মাতে পারে। তার চেয়ে সন্তান না হয় সেই ভাল। তুমি এই দিকটাই দেখেছ দেখছি। জন্মটা তোমার কাটবে ভাল!

নির্মলের এ প্রসঙ্গ চালাইতে ভাল লাগিতেছিল না। এ সব তার আলোচনার বস্তু নয়—নেহাৎ বাল্যবন্ধু ও বহুদিনের অদর্শনের পর দেখা তাই অনেকখানি চিত্তদ্বার সে ইহার নিকট মুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। যতটা হইয়া গিয়াছে

সেই যথেষ্ট, আর নয়। সে নীচে নামিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া হাসিয়া কহিল—কেটে যাবে এক রকমে।

যতীও উঠিল—নাঃ পৃথিবী জায়গাটা সুবিধের নয়! ক্রমেই দেখছি চারিদিকে গলদ! সুখ কোথাও খুঁজে পেলাম না। আচ্ছা নিমুদা! আমাদের বাড়ীর বামুনমাসিকে মনে পড়ে?

নির্মল উত্তর দিল না, দাঁড়াইয়া ছিল, বসিল। দেখিয়া যতীশ্বরও ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিল, এবং এই কার্যে উৎসাহিত হইয়া প্রশ্ন ব্যতিরেকেও উত্তর পূরণ করিতে লাগিল।

—বামুনমাসিকে আমরা খুবই ভাল বলে জানি। রূপে গুণে বুদ্ধি বিবেচনায় তাঁর মত মেয়ে সর্বদা দেখা যায় না, কিন্তু সে বেচারি চিরদিনটা কি কষ্টেই না কাটালে! আবার তাঁর অমন যে মেয়ে—সেই মেয়েরই বা কপাল কি? বুঝতে পারচো বোধ হয়, অপর্ণার কথা বলছি? অপর্ণাকে মনে আছে ত? নিশ্চয়ই আছে! তেমন মেয়েরও এ দেশে জন্মে কদর নেই! এই সব দেখে সংসারে সমাজে অভক্তি ধরে যায়।

নির্মল সব কথা হয়ত শুনিতেও পায় নাই। তার চিত্ত ব্যাপিয়া ছবি বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অন্তর বাহির আবার যেন সহসা অপর্ণাময় হইয়া গেল। বিশ্বসংসার, নৈশপ্রকৃতি, বন্ধু যতীশ্বর, এমন কি একান্ত নির্ভরশীলা ধীরা সমস্তই যেন মুছিয়া গেল। ধীরার প্রতি চিরবিশ্বস্ত ভালবাসার শপথ বুঝি স্মরণও রহিল না! কেবলমাত্র সেই গর্ব বিলোপের মধ্যে জাগিয়া উঠিল,—অপর্ণার মুখ! কৈশোর-শ্রীবিমণ্ডিত অনবদ্য মূর্তি। কানে বাজিতে লাগিল, প্রতিজ্ঞার অর্ধোক্তির সহিত—অপর্ণা! অপর্ণা! অপর্ণা!

কতদিন পরে পিপাসাতুর মানব-চকোর নিদাঘতপ্ত মধ্যাহ্নে এক বিন্দু বারি লাভ করিয়াছিল। হৃদয়সাগর পূর্ণ ই ত ছিল, সামান্য বাতাসেই বীচিবিক্ষেপ আরম্ভ হইল। প্রলয়ের স্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ ব্রহ্মের আবির্ভাব হইল নাকি? অপর্ণা! অপর্ণা!

নির্মল সমধিক গম্ভীর হইয়া রহিয়াছে। হাসি তার মুখে বড় একটা থাকে

না ; যেটুকু ছিল, তাও ফুরাইয়াছে। যতী অবাক হইয়া মুখ দেখে, আর ভাবে, পয়সা হইলে যদি মানুষের তেমন মুখ এমন হয়, তবে কাজ নেই অমন পয়সায়! সে দেখিতে পায়—নির্মল ঘোর অসুখী। সে অন্ধ ধীরার উপর দায় ফেলিয়া তাহাকে গালি দেয়। সে কেন ইহার ঘাড়ে চাপিল ?

নির্মলের এ দিকে প্রাণ বাহির হইতেছিল। এই ত আজ বাদে যতী চলিয়া যাইবে -প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে তাঁদের সংবাদ ত লইতে পারিল না! আর কবে এ সুযোগ ঘটিবে ? যতী নিজেই সেদিন কথা পাড়িল—অমন সুবিধা, কিন্তু ও নামে কি আছে, নির্মল যেন কেমনধারা হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা আর করা হইল না।

সুযোগ আবারও দেখা দিল। কথায় কথায় অপর্ণাদের কথা উঠিল।

যতীশ্বরের মনটা ভাল। বিশেষ অপর্ণাদের সে বড় ভালবাসিত, নির্মলের ঔদাস্যে বিরক্ত হইয়াছিল ; রাগ করিয়া বলিল—সাধ করে কি বলি, নিমুদা! পয়সা হলে মানুষ বদলে যায়!

সে ভিতরে ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিল। যতীশ্বরের অনুযোগেও নির্মলের মুখে ভাষা জোগাইল না ; যতী বিস্ময় অনুভব করিল। একটু সংযতভাবে বলিল—তুমি তাঁদের তুচ্ছ করছো নিমু-দা। কিন্তু তাঁদের মহত্ত্ব তোমার চাইতে ঢের বেশী, অপর্ণার মা তোমায় কত যে ভালবাসেন! তোমার খবর জানবার জন্যে তাঁর ব্যাকুলতার কথা আমি ত জানি। সেই জন্যেই তোমার কাছে তাঁদের কথা পেড়েছিলেম, তাঁদের জন্যে ভিক্ষে চাই নি। অসুখের সময় সর্বদা তাঁকে দেখতে গেছি ত। দু-তিন দিন জ্ঞানই ছিল না—সেই সময়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছিলাম। তিনি সর্বক্ষণ তোমার নাম করতেন। মনে হয়েছিল তুমি যেন কোন আশা ওদের দিয়েছিলে।

অসংখ্য নক্ষত্রখণ্ডবিভাষিত মহাকাশ যেন ঝিনুকের সঙ্কীর্ণ খোলার মত ছোট হইয়া নির্মলকে চাপিয়া ধরিল। সে অস্ফুটে উচ্চারণ করিল—কেন ?

—কেন যেন মনে হয়েছিল! বামুনমাসি অসুখের ঘোরে কি যেন ঐ রকম কথাই বলতেন! এখন ভাল মনে নেই ; তবে, এত বড় আশা দিলে কেন ?

আমি তো স্বপ্নেও ভাবি নি! বাবা নির্মল! তুমিও বিশ্বাসঘাতক! তবে আর কাকে বিশ্বাস করবো!—এমনি যেন কি সব ছাড়াছাড়া কথা একটু একটু বোঝা যেত। সেও তো বছর দেড়েক হয়ে গেল।

নির্মল দুই হাতে মুখ ঢাকিল। এতদিন যে বহ্নি-জালা গোপনে ধূমায়িত হইতেছিল আজ অনুকূল বাতাসে সে আগুন উর্দ্ধ-শিখায় জলিয়া উঠিল। সেই কথা! সেই অবিস্মরণীয় বিশেষণ! অসহ্য, আজও সমান অসহ্য।

জলিয়া জলিয়া জালা যখন একটু প্রশমিত হইয়া আসিল, নির্মল দেখিল তার মাথা যতীশ্বরের কাঁধে! যতী তার মাথায় পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতেছে। আর সহিল না, হোক পুরুষ-মানুষ! পুরুষ-মানুষকে ত আর ভগবান পাষাণ দিয়ে তৈরি করেন নাই। নির্মলের বয়সই বা কি এমন? মুখের কাছে মুখ নত করিয়া বড় সহানুভূতির সহিত আ-বাল্যের পরম সুহৃদ মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল—বুঝেছি! নিমু-দা, এবার বুঝেছি সব, সত্যি তোমার বড় দুঃখের জীবন!

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অশ্রু প্রবাহ বাহির হইল। শিশুর মত অশ্রু প্লাবিত মুখ সে বন্ধুর বক্ষে লুকাইল—সত্যি আমি বিশ্বাসঘাতকতাই যে করেছি।

তারপর এক সময় শান্ত হইয়া বন্ধুর সহানুভূতিপূর্ণ প্রশ্নে প্রশ্নে নির্মল অশ্রু ধৌত হৃদয়ের বাকি তাপটুকুও উজাড় করিয়া দিল। অপর্ণার মাকে বাক্যদান হইতে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত সকল কথাই সে অকপটে উহাকে জানাইল। সমস্ত বলা হইলে প্রশ্ন করিল—তিনি হয়ত বেঁচে নাই! থাকলেও ক্ষমার প্রত্যাশা আমি তাঁর কাছে করতে পারি নে, নৈলে হয়ত একবার অন্ততঃ দেশে যেতাম।

শুনিয়া যতী সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আজ সবই পরিষ্কার হয়ে গেল! আমার মনে আছে, যে দিন তোমার বিয়ের খবর আমাদের বাড়ী পৌঁছায়—সে দিন—হ্যাঁ ঠিক! সেই দিনই বটে, সেই খবর শুনে রাঁধতে রাঁধতে অপর্ণার মা হঠাৎ রান্নাঘরেই মূর্ছা যান, আর সেই থেকেই তাঁর কঠিন ব্যাধি। যা হয়ে গেছে, তা তো আর ফেরবার নয়। অপর্ণার মা বেঁচেই আছেন, হয়ত সুখেই আছেন, অপর্ণারও ভাল বেথা

হয়ে থাকবে। মিথ্যে ও-কথা ভেবে ভেবে নিজেকে আরও বেশী অসুখী করো না। তাতে ফলই বা কি?

এই বলিয়া যতীশ্বর অপর্ণাদের কথা যাহা জানিত, বলিল—মাতামহ রাধিকাপ্রসন্নর আর কেউ নেই, অপর্ণার মা ওঁর বিষয়ের অধিকারিণী। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, অপর্ণা অপাত্রে পড়বে না। তার জন্যে নয়, তোমার জন্যেই ভাবছি, তুমি চিরদিন এই নিরানন্দ, নির্বাসিত জীবন যাপন করবে কি সুখে!

কথাটা শেষ হইতে না দিয়া নির্মল অসন্তোষের সহিত সবেগে কহিয়া উঠিল—ও সব কথা বারে বারে কেন বলছো! সে যদি সুখী হয়ে থাকে, আমার মনে কোন দুঃখ নেই। আমি ধীরাকে সত্যিই ভালবাসি।

নির্মল এই কথা বলিয়া বহুদিন পরে যেন নি শ্চন্ততার পরম পরিতোষ লাভ করিল। অপর্ণা ুখে আছে নিশ্চয়ই সুখী হইয়াছে, তবে আবার কি?

যতীশ্বর একটু দুঃখের হাসি মনে মনে হাসিল। মনে মনেই বলিল, নিজের মনকে বোঝাও আমায় বোঝাতে হবে না।

৪৪

এর পর নির্মল নিজের মনকে বুঝাইতে লাগিল এই বলিয়া, এখন আর অপর্ণাদের চিন্তা অনাবশ্যক। তারা সুখে আছে, এত দিন নিশ্চয় তার ভাল বিয়ে হয়েছে, ধীরাকে ত আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি তবে আমারই বা অসুখী হবার কারণ কি?

মনে পড়িল, এ কয় দিন ধীরাকে সে যেন ভুলিয়া বসিয়াছিল। ইহা মনে পড়ায় লজ্জা পাইল। যা হোক, যতীশ্বর আসিয়া বড় ভাল করিয়াছে, সে না আসিলে ত অপর্ণার নিশ্চিত সুখের খবরটা সে পাইত না!

যতীশ্বরের ছুটির মেয়াদ ফুরাইলে আবার এই সমাজসম্বন্ধবিহীন, নদীবক্ষে তারা দুজনে অনন্যসহায় হইল। কিন্তু পূর্বের মন বুঝি আর কাহারও মধ্যে

ছিল না। একটি অনাহূত আগন্তুক অকস্মাৎ তাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া জীবন-নদীর স্রোত-পরিবর্তন আনিয়া দিল। দেখা গেল, পূর্ববাহিনী পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে।

নির্মল ধীরাকে বেশী করিয়া যত্ন করে, সর্বদা কাছে কাছে থাকে, অপরাহ্নে ছাদে বসিয়া বাছা বাছা বই পড়িয়া শুনায়! আদর যত্নের ত্রুটি নাই। ধীরার মনোজগতে যদি এত বড় একটা বিপ্লব উপস্থিত না হইত, যদি তার হৃদয়রাজ্যে অহোরাত্র তুমুল সংগ্রাম না চলিত, হয়ত সেই অভাগিনী স্বামীকে যেমন করিয়া চাহিয়া ছিল, ইচ্ছা করিলে তেমনি করিয়াই পাইতে পারিত। স্বামী তার কাছে আত্মসমর্পণের জন্যই প্রস্তুত। শরৎ জ্যোৎস্নায় কৌমুদীবিধৌত ধীরার মুখ নির্মলের চোখে আজকাল বড় সুন্দর ঠেকিতেছে, রাত্রে বিদায়চুম্বন তার মর্মরশুভ্র ললাটে মুদ্রিত রাখিয়া সেদিন সে স্নেহ সন্তর্পণে মুখখানা তার তুলিয়া ধরিল, তারপর আবার সেখানাকে আদরে ভরাইয়া দিয়া গেল। মনের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতে পরিবর্তন একটা অতি ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। বুঝি ইহা যতীশ্বরের পত্নী সম্বন্ধীয় আলোচনার ফল! মানুষের মন অনেক বিষয়ে নিস্তরঙ্গ জলের মতই স্থির থাকে; বাতাস বহিলেই তরঙ্গ বুদ্‌বুদ ফেনার সৃষ্টি হয়। ধীরাকে নির্মল এতদিন পত্নীভাবে দেখে নাই; নিজেকে সে স্বামীর পরিবর্তে অভিভাবক বলিয়াই মনে করিত, আজ সম্বন্ধের একটু বদল হইয়াছিল।

কিন্তু এদিকে কি যে ঘটিয়াছে, কত বড় যে একটা ধ্বংসময়-যুগান্তর এই কয়টিমাত্র দিনে ধীরার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে—সে খবর জানে কে? ঐ পদ্মপলাশবৎ নেত্র দুটি যদি আভ্যন্তরিক আলোকচ্ছায়া প্রতিফলিত করিতে পারিত, হয়ত সেই আলোকে তার অন্তর্দৃশ্য দেখিয়া স্নেহময় স্বামী তার শিহরিয়া উঠিত। ভিতরে মহাসমর শেষে রণস্থলের যে অবস্থা ঘটে, ভিতরটা তার সেইরূপ বিধ্বস্ত ও শোণিতাপ্লুত। শ্মশানবৈরাগ্যে চিত্ত তার সর্বত্যাগী!

জ্যোৎস্নাতরঙ্গে তরঙ্গিত ছাদে সেদিনও বাঁশী বাজিতেছিল। ধীরা শুনিতে ভালবাসে বলিয়া নির্মল প্রতিদিনই বাঁশী বাজায়। ধীরা বাঁশীর সেই সম্মোহনে তেমন করিয়া তো আর মুগ্ধ হয় না! অথবা আনমনা চিত্তে সুর লহরী

প্রবেশপথেই বাধা পায়, কে জানে! শ্রোত্রীর চিত্ত যদি দুঃখব্যথা মান-অভিমান আশা-আনন্দ, সুখস্পৃহা, এ সবের অতীত বিষয়ে নিমগ্ন থাকে সমস্তই তার কাছে তুচ্ছ হয়। অপর পক্ষে, বাঁশী ত আরও আশাহীনের অকথ্য বেদনাভরা ক্রন্দন, যাহা জড় প্রকৃতি হইতেও অশ্রু আহরণ করিতে পরিবর্তিত হইয়াছিল। বাঁশী পূর্বে নিজের অব্যক্ত কান্না কাঁদিত, এখন অন্যের চিত্ত বিনোদনের প্রযত্ন করিতেছে।

নির্মল আবিষ্কার করিল—ধীরা কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহে না। না ডাকিলে নিজে হইতে কাছে আসে না, সে রাত্রে বৃষ্টির সময় বজ্ররা দুলিতেছিল, নির্মল উঠিয়া আসিয়া ধীরাকে বিনিদ্র বুঝিয়া কহিল—তোমার কাছে যাবো?

ধীরা সংক্ষেপে উত্তর দিল—না।

আবারও প্রশ্ন করিল—ভয় করচে না?

উত্তর পাইল—না।

নির্মল ইহাতে অবশ্য আস্থা স্থাপন করে নাই। সে তার শয্যায় আসিয়াছিল, ধীরা কিন্তু তেমন করিয়া নিজেকে আজ তার কাছে নিবেদন করিয়া দিল না। যেমন ছিল, তেমনই নিশ্চল রহিল। নির্মল সর্বপ্রথম ধীরার এই নির্লিপ্ত ব্যবহারে বিস্মিত, হয়ত বা দুঃখিতও হইল!

পরদিন অনেকক্ষণ বাঁশী বাজাইয়া নির্মল ধীরার দিকে চাহিতেই পূর্বের কথা মনে জাগিয়া উঠিল। কতদিন বাঁশী থামিলে সে তার হিম-কৌমুদী বিভাসিত শুভ্র গণ্ডে অশ্রুবিন্দুর মুক্তাবলী লক্ষ্য করিয়া নিজের আবেগাশ্রু নিঃশব্দে মুছিয়া ফেলিয়াছে। আজ নেত্র দুটি তারই মত অন্ধ আকাশে সংস্থাপিত, যেন দৃষ্টিহীনা নিজের শূন্য চিত্ত দিয়া মহাশূন্যের গভীর রহস্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট। মন তার এ পৃথিবীতে নাই। জ্যোৎস্নাধৌত লতাগাছি বাহুমধ্যে তুলিয়া লইয়া নির্মল ডাকিল—ধীরা!

—কি!—বলিয়া ধীরা মুখ ফিরাইল। কিন্তু একি! আজ স্বামীর স্নেহস্পর্শে তার সেই স্পর্শ-লোভাতুর কাঙ্গাল-চিত্ত ত পাগল হইয়া উঠিল না? কি হইল?

নির্মল তার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া স্নেহ-তরল কণ্ঠে কিছু বলিবার জন্যই বলিল—এইবার কি বাড়ী যাবে ধীরা ?

মৃদু ধীর কণ্ঠে ধীরার উত্তর আসিল—যাবো।

পূর্বে এ প্রশ্নে ধীরা ব্যাকুল হইয়া তার হাত চাপিয়া ধরিত। সবটা না বুঝিলেও নির্মল বুঝিত, বাড়ী সে যাইতে চায় না। সেই জন্যই শত অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া এই জলের বাসা সে ভাঙ্গিতে পারে নাই। আজ এই অনায়াসে 'যাবো' উত্তর শুনিয়া আবারও সে বিস্ময় অনুভব করিল।

অবশেষে তার মনের খবর প্রকাশ পাইল। জল যখন ছিদ্রপথে প্রবেশ করে আরোহী তখন সর্বনাশের খবর পায় না, যখন নৌকা ভরিয়া যায় তখনই নৌকারোহী সঙ্কটাবস্থার সম্মুখীন হয়। আরোহী রক্ষা পাইলেও জীর্ণ তরীর অতল নিমজ্জন ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।

ধীরা যে বহ্নিজ্বালায় জ্বলিতেছিল, তাহারই একটু স্ফুলিঙ্গ বাহিরে আসিল। নির্মল "পারিবারিক-প্রবন্ধে" 'স্ত্রী-শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িতেছিল। শাস্ত্রসাগরমথিত সুধাভাণ্ডতুল্য এই পুস্তকখানি বাংলার গৌরবের ধন! —যাঁদের বিশ্বাস বঙ্গনারী তাঁদের পতির সেবিকামাত্র, এই পুস্তকের পতি-পত্নী সম্বন্ধীয় বিষয়গুলিতে দেখিতে পাইবেন, তাঁদের ধারণা কিরূপই ভ্রান্ত! নির্মল পড়িতেছিল—আমি তোমার, ওরা তোমার বলেই আমার। যিনি এই মন্ত্র দিবেন, তাঁহার স্বয়ং মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে সত্যসত্যই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। অনৃতবাদী শঠতাসম্পন্ন গুরুর মন্ত্র—অরি-মন্ত্র। উহার দ্বারা দীক্ষার ফল ফলে না। এই জন্য কর্তাভজারা বলেন—মানুষ ধরতে হলে মরতে হয়! যদি তুমি কাহাকেও ধরিতে চাও অর্থাৎ নিতান্ত নিজস্ব করিতে চাও, তবে আপনি মর, অর্থাৎ আপনাতে আপনি থেক না, একেবারে তাহার হইয়া যাও!

মৃদু শব্দে নির্মল মুখ তুলিল, দেখিল—ধীরা উঠিয়া বসিয়াছে! সে পড়া থামাইতেই বলিল—আজ এই থাক।

কেন, ধীরা না বলিলেও নির্মল অনুমান করিল, তার ঘুম পাইয়াছে।

বই বন্ধ করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া আলো ও পুস্তকাদি নীচে পাঠাইয়া দিল; কাছে আসিয়া বলিল—নীচে যাবে? চল।

—যাই—বলিয়া ধীরা তেমনিই স্থির থাকিল, উঠিবার চেষ্টাও করিল না। বড় চিন্তাভারাকুল বড়ই অন্যমনা! নির্মল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল; তারপর কামরার ক্লক ঘড়িতে দশটা বাজিতে শোনা গেলে, গাত্রস্পর্শ করিয়া কহিল—রাত হয়েছে—এসো, নীচে যাই—

অসুখ করার কথাটা আজ উল্লেখ করিল না, করিলেও বুঝি আজ আর ধীরার কানে সেটাও বেসুরা বাজিবে না, আজ আর তো সেদিনের সে ধীরা নাই, বুঝি সে ধীরা মরিয়াছে—অথবা মরিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে! সে এই স্পর্শে সজাগ হইয়া উঠিল, দ্বিধা মাত্র না করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—আমার একটা কথা আছে; বল রাখবে?

একি! কার কথা এ? এ কে স্বামীকে সাধারণ-নারীজন-সুলভ আবদারের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইতে চায়? এ সেই ধীরা? নির্মল বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চন্দ্রচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত সেই মুখের দিকে চাহিল। নিবিড় কৃষ্ণ কেশকলাপ পরিবেষ্টিত, ক্ষুদ্র, সুন্দর, শান্ত মুখ! চন্দ্রার্ধবৎ ললাট প্রান্তে সূক্ষ্ম দুটি ভ্রূলেখা, তার নীচে মধ্যাহ্ন সূর্যোপরি মেঘ ছায়াপাতে দীপ্তিশূন্য সুবৃহৎ, নীল নেত্র! তেমনই রহস্যময়, কুহেলিকাপূর্ণ! বিস্ময় দমন করিয়া সে স্নেহপূর্ণ কোমল কণ্ঠে কহিল—শুনবো বই কি! তোমার কথা শুনবো না? কি বলবে বল?

—তুমি আবার বিয়ে করো, আমার এই অনুরোধ।

নির্মল এ কথা শুনিয়া এমনই চমকিয়া উঠিল, যে নৈকট্যবশতঃ ধীরাও উহা জানিতে পারিল। সামান্য ক্ষণ নীরব থাকিয়া নির্মল প্রশ্ন করিল—এ কথা কেন ধীরা?

ধীরা এবার বিপন্ন হইল। সংসারের লোকের মত সে ছলনা-চাতুরী জানে না, মিথ্যার আশ্রয় লইতে শিক্ষা করে নাই, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া উত্তর দিবার চেষ্টাই ত্যাগ করিল।

তখন নির্মল তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইল, অতি সাবধানে মাথাটি তার কাঁধের উপর রাখিয়া বড় আদরেই কহিল—ছিঃ! এ কথা কি বলতে আছে?

এই ঈপ্সিত-সুখস্পর্শ কিছুদিন পূর্বে—এমন কি যতদিন ত্যাগে ও মোহে, দেবীতে ও মানবীতে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তখনও লাভ করিতে পারিলে, হয়ত মুহূর্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হারাইয়া সে শুধু সেই স্পর্শসুখময় বাহুমূলেই আত্মসমর্পণ সুখে বিশ্ব-বিস্মৃতা হইতে পারিত—কিন্তু আজ আর সে দিনই নাই! আজ এই তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী সমস্তই 'স্বামী দেবতায় স্বাহা' মন্ত্রে যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়া দিয়াছে। নিজের জন্য আর ত কিছুই সে বাকি রাখে নাই! বাংলার শিক্ষাগুরু বলিয়াছেন, যদি কাহাকেও আপনার করিতে চাও তবে আপনি মর!

সে তার সেই স্বর্গ-নন্দনের সন্তানকসম্ভার হইতে মাথা তুলিয়া সরিয়া বসিল; বলিল—আমায় নিয়ে সুখী হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি অন্ধ আমি তোমার কোন কাজে লাগবো না, সে অদৃষ্ট যখন আমার নয়—তখন আমার জন্য চিরদিন তুমি কেন দুঃখ পাবে, তুমি বিয়ে করো।

এত কথা—এমন বাঁধনমুক্ত অথচ মর্ম ছেঁড়া প্রাণোৎসর্গকর বাক্যাবলী, এ কেমন করিয়া কবে কাহার কাছে এই সংসারাভীতা সরলা অন্ধ বালিকা শিক্ষা করিল? হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়া নির্মল সাধারণ জীবের মতই নিজের স্ত্রীকে অকস্মাৎ বক্ষ মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। অশ্রুকম্পনে কণ্ঠ ওষ্ঠ তার কাঁপিয়া উঠিতেছিল; কষ্টে ব্যথিত উচ্ছ্বাস নিরোধ করিয়া কহিল—বুঝেছি! যতীশ্বরের সঙ্গে আমার সেদিনের কথাগুলো শুনেছিলে—কিন্তু তাই যদি শুনে থাক—তবে এও কি শোন নি ধীরা! আমি তোমায় পেয়ে অসুখী নই? যে যাই মনে করুক, তুমি আমার ভালবাসায় সংশয় করো না, আমার বড় কষ্ট হবে।

এই বলিয়া নির্মল তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রগাঢ় চুম্বন করিল। সে আদরে কণ্ঠস্বরে সত্যই সুগভীর ভালবাসা ব্যক্ত হইতেছিল। ধীরা অপ্রার্থিতপূর্ব

আশাতীত লাভে কেমন যেন হইয়া গিয়া স্থিরসঙ্কল্প তখনকার মত ভুলিয়া গেল। আর কোন কথা সেদিন বলা হইল না।

সংসারের এ কি রীতি!—বাসনা যখন হৃদয়ের কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ, অনিবৃত্ত আকাঙ্ক্ষার অনলে প্রাণ যখন জ্বলিয়া যাইতেছে—কাম্য তখন কোথায়? সেই তীব্র কামনার যেই বিলুপ্তি ঘটিল, দেখা গেল বাসনা-যজ্ঞের সেই আকাঙ্ক্ষিত ফলভার আশাতীতরূপে ফলিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু তখন সেই আসক্তিই যে চলিয়া গিয়াছে।

৪৫

ক'টা দিন চুপচাপ কাটিয়া গেল। শনিবার বিকালবেলা অপর্ণা বিহারীকে ডাকিয়া বলিল—বেহারিদা, আমারই সঙ্গে না হয় বাদ-সাধা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু রাত পোয়ালেই যে ভদ্রলোক দুজন বাড়ী আসবে, তাদের কি করবে শুনি—আমি নিজেই নয় ধামা-কাঁকালে বাজারে যাই? অনেক দুর্গতিই তো ঘটলো—এইটাই বা বাকি থাকে কেন?

বিহারীর মন এমনি বিকল—শরীর তার এতই অবসন্ন যে, হাজারবার স্প্রিং ঘুরাইলেও যেন তাহা শিথিলই থাকিয়া যায়, দম আর লাগে না। মুখ তুলিয়া উদাসীনভাবে প্রশ্ন করিল—কি করতে হবে বলো।

অপর্ণা রাগিয়া উঠিল, ঝঙ্কার দিয়া কহিল—আমি কি না পাঁচটা ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়েচি, তাই জানি—কি করতে হয়।

বিহারী এ কথার প্রতিবাদ করিল না, করিলে রহস্য করিয়া সেও বলিতে পারিত—আমিই বা ক'টার দিয়েছি ভাই? সে তা করিল না, একটু পরেই বাহির হইয়া গেল এবং সন্ধ্যার পর দুখানা এনামেলের রেকাব ও দুইটা জলের গ্লাস এবং একটা আনারস ও একটা ফজলি আম হাতে বাড়ী ফিরিল। কিনিয়া আনিল পৃথিবীর মধ্যের দুইটি সুপক্ক, সুগন্ধ শ্রেষ্ঠ ফল, অথচ তার চলন দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন অতি প্রিয়তমের চিতা সাজাইবার কাঠ কিনিয়া আনিল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পাঠ নাই। পূর্বে দিনের বেলা রাত্রের রুটি তৈয়ারি থাকিত, এখন কোন দিন থাকে, কোন দিন থাকেও না। থাকিলেও ধরিয়া দিতে, অথবা চাহিয়া লইতে দুপক্ষেরই আলস্য অনিচ্ছা কে জানে কি হয়। আবশ্যক বোধ না থাকিলেই এমনটা ঘটিয়া থাকে।

বিহারী রাস্তায় পথে একটু ঘুরিল, মুনিব বাড়ী যেটুকু কাজ ছিল, সারিয়া ইচ্ছা করিয়াই বিলম্বে বাড়ী ফিরিল। বাড়ীর ভিতরটা স্তব্ধ। দুটা মানুষ অথচ কেহ কাহারও সহিত সাধ্য পক্ষে কথা কহে না। বিহারীর প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যায় কই? গেলে তো সে বাঁচিয়া যায়।

পাশের বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রতি সন্ধ্যার মতই মজলিস চলিতেছিল। একজোড়া পাখোয়াজের সঙ্গে সস্তার একটা হারমোনিয়ম সন্ধ্যা হইতে বাজিয়াই চলিয়াছে। বাজনার ও বাদকের আলস্য নাই। অল্প দূরে আর একটা বাড়ীর দ্বিতল হইতে একটি ছোট মেয়ের গীতবাদ্যের ধ্বনিও আসিতেছিল। মজলিসিদের অপেক্ষা তাহা বরঞ্চ সহনীয়। শোনা যাইতেছিল—এসো ফিরে, এসো ফিরে, মা—

অপর্ণা চিলে কোঠার কোটরটিতে ছোট জানলাটার কাছে বসিয়া সেই গান শুনিল। তার বক্ষবস্ত্র কাঁপাইয়া দীর্ঘশ্বাস উত্থিত ও পতিত হইল। মা! হায় মা! যে জ্বালা হতে তুমি ত্রাণ পেয়েছ, এমন কোন পাষণ্ড মাতৃগর্ভে জন্ম লইয়াছে যে, আবার সেইখানে ফিরিতে বলিবে? না মা! যদি পৃথিবীর সঙ্গে এখনও কোন যোগ থাকে—আজও যদি সব দেখতে পাও তবু না, —তবু না। শুধু আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মত উঁচু মাথায় সেও চিতার আগুনে জ্বালা নিভাইতে পারে। তোমার এই শেষ আশীর্বাদ সফল হোক;

ক্ষুদ্র জানালা দিয়া আকাশের জ্যোৎস্নাধৌত রজতমূর্তির সামান্যই দেখা যাইতেছিল। শুক্লপক্ষের সে কি একটা বিশেষ তিথি। বাড়ীর পিছনের গলি অন্ধকার, আর্দ্রতায় পঙ্কিল। গলির পাশেই কলার ঝাড়ে বাদুড় ডানা ঝটপট করিতে লাগিল। নারিকেল গাছের মাথায় চিলের বাস, কোন নিশাচর পক্ষী চরিতে বাহির হইয়া সেখানে অকস্মাৎ গিয়া পড়িয়া থাকিবে, চিলশাবকের

কর্কশ চীৎকারে দ্রুত উড়িয়া গেল। অপর্ণা হাতের উপর মাথা রাখিয়া সেইটুকু আকাশের পানে চাহিল। কোথায় আছ মা? না—না: তোমায় ডাকি নি, তোমার সুপ্তির তোমার শান্তির যেন ব্যাঘাত না ঘটে, যেখানে থাক ভালই আছ, তোমার মত জ্বলে জ্বলে আমিও তোমার কাছেই যাব, মাগো! বল মা! যেন সে দিন শীঘ্র আসে—

সিঁড়ি ভাঙ্গাচোরা, রাত্রি দিনের সেখানে প্রায় সমান অধিকার! কাহার স্খলিত পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন পড়িতে পড়িতে পতন নিবারণ করিল! অপর্ণা সেই শব্দে মুখ ফিরাইল। কে আর? বিহারী।

প্রদীপ ছিল না; জানালা দিয়া সামান্য আলো আসিয়াছিল। বিহারীর মুখটা অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। দয়ার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ক্ষিদে পেয়েচে—বেহারিদা?

ক্ষুধার পরিবর্তে বিহারীর কান্না পাইতেছিল। চৌকাঠে বসিয়া পড়িয়া রোদন রুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—আমায় মেরে ফেলিস নে দিদি! একটু দয়া কর—

তার চোখের চাহনি যেন পাগলের চাহনির মত। কিছুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটু কাছে আসিয়া সহানুভূতির কোমল স্বরে অপর্ণা কহিল—কেন বেহারিদা! অমন করচো কেন? বিয়ে কি কেউ বুড়োকে করে না? দেখ, অদৃষ্টে থাকলে অল্পবয়সীর হাতে পড়েও তো মানুষ চিরজন্ম একাদশী করে মরচে, এ তো তবু ভেবে দেখ; সেরকম কিছু যদি ঘটে, তবু তো ভাত কাপড়ের জন্যে কারু দ্বারস্থ হতে হবে না।

বিহারী এইবার বয়সের মর্যাদায় দৃকপাত না করিয়া শিশুর মত হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—দিদি তুই এত নিষ্ঠুর!

—কেন বেহারিদা! কি এমন করলুম—বলিতে বলিতে অপর্ণা মুখ ফিরাইল। অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে রহিল! তখন আকাশের চাঁদও যেন গভীর আলস্য-ভরে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতেছিলেন, পূবের আলো পশ্চিমে সরিয়া আসিতে-ছিল। কোলাহল মুখর সহরের বুকেও জ্যোৎস্না মিশ্রিত ঘুমের নেশা সংক্রমিত

হইতেছে, প্রকৃতি ঘুম পাড়ানিয়া গান জ্যোৎস্না-তরঙ্গের প্রাণে প্রাণে ঢালিয়া দিয়া প্রাসাদ অট্টালিকা কুটীরের ছাদে ছাদে জানালায় জানালায় মর্ত্যবাসীর চোখে চোখে মাখাইয়া দিবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন। বাতাসের নিশ্বাসে ও পাতার মর্মরেও সেই ঘুমের নেশার আমেজ পাওয়া যায়। সেই ঘুমের সুরে বাজনার সুর, গানের সুর, এমন কি, নিত্যকার কথা হাসির সুরসুদ্ধ ক্রমেই ঢাকিয়া আসিয়া শান্তির বিরাট একটা স্তব্ধতা জগতের সর্বত্র জাগিয়া উঠিতেছিল। বিহারী চোখ মুছিয়া সংশয়-জড়িত ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, বড় ভয়ে ভয়েই কহিল—এর চেয়ে আর একটা উপায় আছে, যদি শোন

অপর্ণা তরল অন্ধকারে চাহিয়া দেখিল—বলোই না।

—আমরা ব্রাহ্ম হই। শুনেছি ব্রাহ্ম মেয়েদের বিয়ে না হলেও দোষ হয় না।

নিবিড় অন্ধকারে অকস্মাৎ যেন বিদ্যুৎ চমকিল! শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহে অপর্ণা যেন কি বলিয়া উঠিতে গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই যেমন করিয়া ঘরের জানালার সম্মুখ হইতে চাঁদের আলো সরিয়া যাইতেছে তেমনি করিয়াই তার মুখেরও সেই ক্ষণিক উজ্জ্বলতা অন্ধকারে মিলাইয়া আসিল। অত্যন্ত অস্ফুটস্বরে উত্তর করিল—মা যাবার সময় কি বলে গেছেন, বেহারিদা? 'কুলধর্ম জাতি-মান বজায় রাখা'—মায়ের শেষ আদেশ, ভুলে গেছ?

—ব্রাহ্মধর্ম তো হিন্দুধর্ম ছাড়া নয়, এ আমি ভাল লোকেরই মুখে শুনেচি, আচার ব্যবহার বজায় রাখা তো নিজেদের হাত—

—বেহারিদা! দেখছি সাধ করে কর্তাবাবু তোমায় গাল দিতেন না! তোমার মত স্বার্থপর আমি নই যে, মায়ের আদেশ ভুলে, ঠাকুর মন্দিরে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাবার গর্ত খুঁড়তে যাবো! সুবিধের জন্যে লোক দেখানো ধর্মের ভান হয়তো তুমি করতে পারো; আমি পারি নে!

এরপর তর্ক চলে না, চলিলেও নিষ্ফল, ইহা নিশ্চিত। শেষ আশা বিসর্জন দিয়া বিহারী হেঁটমুখে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন তসরের ধুতি খসমস করিতে করিতে একমুখ পানদোক্তার টে গর ও গালভরা হাসি লইয়া ঘটক-ঠাকুরাণী মোক্ষদাসুন্দরী দন্তখন্ত হইয়া বাড়ী

ঢুকিলেন। সম্মুখে কাহাকেও না দেখিয়া উপরের সেই চোরকুঠুরীটিতেই সরাসরি উঠিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে আর একদিন আসিয়া এই কোটরটির সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন!

অপর্ণা দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া ছিল। মোক্ষদাসুন্দরীর গৃহপ্রবেশের পরেও তেমনি রহিল। মোক্ষদার মনটা একটু বিশেষ উৎফুল্ল, সে এই অসময়ের নিদ্রাকে সম্মান না দিয়া, তাহাকে দুই হাতে নাড়া দিল—ওঠো গো! উঠে পড়ো, বরকর্তামশাই পুরুত সঙ্গে বাড়ী হতে বার হচ্ছে, দেখেই ঘোড়ার মতন দৌড় দিয়ে খবর দিতে এয়েচি। তোমাদের এখেনে সব জোগাড় যন্তর হয়ে গ্যাছে? শাঁক চন্দন ধান দুব্বো? চক্কোত্তি মশাইয়ের দরজার গোড়ায় 'আও ভাও' করবার লেগে তৈরী থাকা উচিত! কই কোথা গেল? চট করে উঠে পড়ো, তেনারা এই এলো বলে?

অপর্ণা যেমন ছিল, তেমনি থাকিয়া অবসাদের ক্লান্তস্বরে উত্তর করিল—তুমি গিয়ে ওঁদের আসতে মানা করগে যাও বাছা!—মাথার যন্ত্রণায় আমি মরে যাচ্চি, উঠতেই পারব না।

—অ্যাঁ! সে কি?—মোক্ষদার হাসিমুখ চুণপানা হইয়া গেল।—এও কি একটা কথা হলো গা? ভদ্দর লোক, তাও কেওকেটা নয়, লোকের মত লোক, বড় আশা করে আসচে, অপমান হবে যে! সে কি কথা? তা তুমি যেতে না পার, ওনারা এইখেনে এসেই আশীব্বাদ করে যান। শুভক্ষণে শুভদিষ্টি হবে, বর নিজে তো আর আসতে পারে না। হাজার হোক সেকেলে পিরবীন লোক তো, এখনকার বারফাটকা ছোড়াদের মতন ধম্ম-কম্ম বিবর্জিত তো আর নয়। একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পাঠাচ্চেন! ন্যাও মেয়ে, ওঠো কাপড়টা ছাড়। আর কিছু করো না করো, বলে, এনা চন্নন কেনা পরে, কপালগুণে চন্নন ঝলমল করে! একখানা ন্যাতা কাপড়েই এই! সাজবার কি দরকার? তা সাজাবে, যে সাজাবার সেই সাজাবে। ব্যাটার বউকে তো আর কমটি দেয় নি। মেয়েরও সিন্দুক ভরা হীরে জহরত পড়ে কাঁদচে, উঠবে সবই এই তোমার অঙ্গে!

মোক্ষদা প্রশংসায় গলানো চোখের আদরভরা দৃষ্টি দিয়া সেই 'সোনার

অঙ্গের' খানিকটা সোনাই যেন ছানিয়া তুলিয়া লইল, তথাপি 'স্বর্ণময়ীর' মন পাইল না! মোক্ষদার কথা শেষ হইতেই ভাল করিয়া পাশবালিসটা টানিয়া অপর্ণা দৃঢ় স্বরে কহিল—আমার আজ উঠে বসবার ক্ষমতা নেই। কেন মিথ্যে ভদ্রলোকদের হায়রাণ করে ফেরাবে—তার চাইতে এখনি গিয়ে বলোগে, আজ যেন না আসেন।

চেনা দুদিনের হইলে কি হয়, ঘটকঠাকুরাণী জাতসাপ চিনিয়াছিলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—কবে ওনাদের আসতে বলবো?

—সে তখন বিবেচনা করা যাবে, এখন তো দুদিন যেতে দাও। উঃ! মাথা খসে গেল! আমি বলে মরে যাচ্চি, আর তোমাদের যত—জ্বালিও না বাপু—তুমি এখন যাও—

বড় মুখ করিয়া 'মুকি' আগের ভাগে তসরখানি আদায় করিয়াছে, সেই মুখ ভোঁতা করিয়া সে 'মচ্ছিভঙ্গ' হইয়া ফিরিয়া গেল। দ্বারের নিকট বিহারী হঠাৎ চটকাভাঙ্গা হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কখন আসচেন?

—কই আর এসতে পেলেন, এসতে মানা করতেই তো যাচ্ছি!—বলিয়াই মোক্ষদা চলিয়া গেল। কি হইল বুঝিতে না পারিয়া—আপাতত আশীর্বাদটা বন্ধ রহিল ইহাতে অনেকখানি হাল্কা হইয়া বিহারী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অপর্ণা সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া নামিয়া আসিতেছে। বিহারীকে দেখিয়া সে ডাকিয়া বলিল—আমার আজ চান হয় নি; তোমার সেই ঠিকে ঝিমাগী তো জল দিয়ে গেল না? রাস্তার কল থেকে এক ঘড়া জল ধরে এনে দাও দেখি নি চট করে, চানটা সেরে নিই।

বিহারী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—ওদের কি আজ আসতে মানা করেছ?

অপর্ণা রাশিকরা চুল বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহারই একটা গুচ্ছ আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে হাসিয়া উত্তর করিল—করবো না তো কি? তুমি তো সব খবরই রাখো! জ্বরে আমি পুড়ে মরে যাচ্চি, জ্বরগায়ে কি শুভকর্ম হয়?

বিহারীও মৃদু হাসিল, কহিল—জ্বর হয়েছে? তবে যে বললে চান করবে?

অপর্ণা তেলের বাটি পাড়িতে পাড়িতে উত্তর করিল—আমার খুশি!

কয়লার চুলা গন গন করিয়া জ্বলিতেছিল। হাঁড়ি চাপাইয়া দুটি চাল জলে ছাড়িয়া দিলেই রাঁধা ভাত নামানো যায়, কিন্তু একটুমাত্র হইলে কি কি হয়, এইটুকু করিতেই যে মনে ইচ্ছা অথবা শরীরে শক্তির সময় সময় বড়ই অভাব দেখা দেয়! কাজটা তো বড় নয়, কর্ম-কারকই যে সব।

তাকে সাজানো হাঁড়িকুড়ি পাড়িবার অপেক্ষা না রাখিয়া যদি হাতের গোড়ায় নামিয়া আসে, তা হইলে যা-হয় হয়, তেমন মন্ত্র তাহাদের তো জানা নাই, যথাস্থানে যথাযথ রহিয়া গিয়াছে, উনানের অঙ্গার ভস্মে পরিবর্তিত হইতেছে, অপর্ণাও দেওয়ালে পিঠ ঠেসিয়া নিস্পন্দ বসিয়া আছে। দিনে দিনে তাহাকে আলস্য-ভূতে পাইয়া বসিতেছিল। তার সেই চিরচাঞ্চল্যের স্থলে পাষাণোপম জড়তা তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে যেন সাঁটিয়া ধরিতেছিল। কাজকর্মে ঘরকরণার পারিপাট্যসাধনে যার সময়ে আঁটিত না, মাতৃবিয়োগের অত বড় শোকও যে কর্মের অন্তরালে চাপা দিয়া রাখিল, আজকাল সকল কাজেই যেন তার বিতৃষ্ণা প্রকটিত হইতেছে। চাল ফুরাইলেও আনিয়া দিতে বলে না, কোনদিন ভাতে-ভাত, কোনদিন এক-তরকারি ভাত, তাও এক একদিন ধরিয়া যায়—এক একদিন শুধু ফুটিয়া ফুটিয়া জল শুকাইয়া হাঁড়ি ফাটিতে আরম্ভ করে, চাল দিবার কথা মনে থাকে না। এমনি কত রকমে কর্মকর্ত্রীর মনের গভীরতর অন্যমনস্কতার কত ত্রুটিই যে তার হাতের কাজগুলি বাহির করিতেছিল, হিসাব রাখিলে খাতা ভরিয়া উঠে! বিহারী উদ্বেগ-শঙ্কিত চিত্তে সবই লক্ষ্য করে, কিন্তু খুবই যে দুঃখিত হয়, এমন মনে হয় না। অপর্ণার এই নিদারুণ তিতিক্ষা-পূর্ণ অবসাদ হয়ত তার এতদিনকার উন্মাদ বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া, ইহা সে বুঝে। মা কালী করুন, এ যেন তার পরাজয়ের লক্ষণই হয়, তাঁহাকে সে পূজা দিবে। মনে কিন্তু তারও শান্তি ছিল না, অথচ কোন কথা তুলিতে সাহসে কুলাইয়া উঠে না। কি জানি, যদি সুস্পষ্ট প্রশ্নে মনের অস্পষ্ট বেদনাকে ক্ষতের আকারে বাহির করে? সে যে

একটা প্রাণঘাতী ভাবনার তরঙ্গে ওঠানামা করিতেছে, নিজেকে ছিঁড়িয়া খানখান করিয়া সমাজ বা কোন শ্যেনরূপী দেবতার প্রবঞ্চনার-ক্ষুধা মিটাইবার জন্যই খড়্গ শানাইতেছে, এই ধরণেরই কি একটা দুভাবনার ধ্যানে ব্যাপৃত রহিয়াছে, অতি বুদ্ধির ধারে না গিয়াও বিহারী এটা বুঝিল। তার নিজের প্রাণে এই যে ব্যর্থ ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে, অপর্ণাকে পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে, আর? সেই পরের ঘর তার বধ্যভূমি, বাসরঘর নয়! এই কষ্টেই যে হৃদ্‌পিণ্ড ফাটিতেছিল। কিন্তু অপর্ণা যে তাদের দুজনের সুনাম বাঁচাইতে এমন করিয়া নিজের মাথা হাঁড়িকাঠে গলাইল, এ যন্ত্রণা এই মূল-হীন জীবনটা শতবার ধ্বংস করিলেও ঘুচিবে না। এই পৃথিবীতে মানুষ-দেহ পাইয়া কত লোকে কত বড় বড় কাজ করিতেছে, কত লোকের একটি তর্জনী হেলনে এ জগতের চিরনিয়ন্ত্রিত নিয়ম পদ্ধতির আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত বিধাতৃ-বিধানেরই মতই আমূল পরিবর্তিত হইতেছে, সেই মনুষ্য-দেহ লইয়া সেই একই পৃথিবীতে জন্মিয়া বিহারী এই একটিমাত্র মেয়েকে এতটুকু সুখী করিতে পারিল না? ধিক থাক এমন জন্মে!—

তিনদিন পরে আশীর্বাদের দিন ধার্য হইয়াছে। বিবাহের দিন এ মাসে আর নাই, একেবারে ১৯শে শ্রাবণ। সেই বা কি এমন যুগান্তরের কথা? সেও তো সতেরটি দিন পর।

আশীর্বাদের পূর্বদিনের অপরাহ্ণে অস্তমান সন্ধ্যালোকে বসিয়া অপর্ণা সমুদয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সমস্ত বাদ সহসাই টানিয়া ফেলিল। কয়েকখানা রুটি ও কুমড়ার ছক্কা তৈরি করিয়া, অনেকদিন পরে ঠাঁই করিয়া খাবার ধরিয়া দিয়া বিহারীকে খাইতে ডাকিল।

বিহারীর খাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও ক্ষুধা নাই বলিবার দুঃসাহসও তার ছিল না। সে আসনে বসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি খাবে না? তোমার আছে ত?

—আছে, পাবোখন তুমি বসো।—বলিয়া সেইখানে দাড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে লাগিল। বিহারী তার এমন দ্বিধাগ্রস্ত অপ্রতিভ ভাব

জীবনে দেখে নাই ; কোন নূতনতর বিপদাশঙ্কায় শঙ্কিত নেত্রে সর্বনাশ-প্রচ্ছন্ন সেই মুখখানায় চকিতে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। ভিতরে ভিতরে সে কিন্তু আতঙ্কিত ছিল। মুখখানায় প্রবল ঝটিকাভাস, না শুধু আভাসই নয় আসন্ন। বিহারীর খাওয়া হইয়া গেলে সে যখন চলিয়া যায়—অপর্ণা ধ্যানভঙ্গের মত চমকিয়া ডাকিল—শুনে যাও।

এমন ছোট করিয়া, ভিতরে এমন গুপ্ত অর্থ নিহিত রাখিয়া, সে বুঝি আর কখনও কথা কহে নাই। এই অসাধারণ অপ্রচ্ছন্নতার বিশেষত্বটুকু বর্জন করিয়া যেন কি এক রহস্যের মোটা চাদরে নিজেকে বিহারীর নিকট হইতে ঢাকা দিয়াছে। তাই না বিহারী মরিতে বসিয়াছে।

বিহারী ফিরিয়া কোন একটা অঘটনের জন্যই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল সেটা যে নিশ্চিত আসিয়া পড়িয়াছে স্পষ্টই বুঝা গেল।

অপর্ণা গলাটা একটু ঝাড়িয়া লইল, কপাটের গায়ে ভার ছিল, ত্যাগ করিয়া নিজের পায়ে জোর দিয়া দাঁড়াইল, বিহারীর দিকে না চাহিয়া আর একদিকে চাহিয়া কহিল—আমার মার অমত ছিল না, সে তুমি জানো। আমি—আমিও তাই স্থির করেছি সব চাইতে সেই ভাল। ভাল না? তুমিই বিয়েটা করে ফেল, নেঠা চুকে যাক।

—অপর্ণা! আর যা খুশি বলো, মাতামহের বয়সী বুড়োকে এতবড় অপমানটা করো না! এরকম হীন তামাসাও আমি সহ্য করবো না!

অপর্ণা স্থির নেত্রে বিহারীর ভূতাহত মূর্তির দিকে তাকাইল, বিদ্রূপের কঠিন স্বরে নির্মমভাবে কহিল—তোমার মত ছিরিত্তিরির মেয়ে-বেচার ঘরে আমার মত নৈকষ্য কুলীনের মেয়ে নেওয়ার কত যে অপমান. সে আমার অজানা নয়! মিথ্যে মানের-কান্না কেঁদো না, থামো। যা বলি শোন, এদিকে আমায় প্রাণধরে পরের ঘরেও পাঠাতে পারবে না, সেও তো এই চক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। রাত্তির দিন হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্চো! আবার এও না! তবে তুমি কি চাও, তাই না হয় স্পষ্ট করেই বল, শুনিই।

ঘৃণায় লজ্জায় ধিক্কারে আকণ্ঠ আরক্ত বিহারী সবেগে কহিয়া উঠিল— অপর্ণা, তুমি যে এতখানি দেখতে পাও তা জানতাম না! আমি বুঝেছি সত্যি সত্যিই তোমায় ছেড়ে বেঁচে থাকতে পারবো না, লুকুতে চাই নে, একথা খুবই সত্যি! কিন্তু তা বলে তোমায় আমি তো স্বার্থের জন্যে কাছে ধরে রাখতে চাই নি! ভগবান জানেন, না শুধু তাই নয়, তুমিও জানো, আমার মনের কোণে এতটুকু পাপ নেই! আমি চাই তুমি সুখী হও—সুখে থাকো। তোমায় ভাল লোকের হাতে বড়লোকের বাড়ী দিতে চেয়েচি। এত দিন যা কিছু দুঃখ পেয়েচ, সয়েছে, ঐশ্বর্যের সিংহাসনে বসে তার শোধ পাবে। স্বীকার করি সেই সঙ্গে নিজের কথাও ভেবেছি বৈকি! ভেবেছি, আমিও তোমার স্বামীর আশ্রয়ে, ঘাড়ে চেপে নয়, আমার মত ক্ষুদ্রের যা সাধ্য সেই মত সামান্য চাকরী উপলক্ষে থাকলে তোমায় দেখতে পাবো, তোমা থেকে দূরে যেতে হবে না। মনে মনে কতই না গড়া-পেটা করেছি! তোমার ছেলেমেয়ে কাঁধে-পিঠে নিয়ে তোমাদের সুখে-দুঃখে লাভে-ক্ষতিতে প্রাণপাত করে দিন কটা কাটিয়ে দেবো। এত কেন? তোমরা যে আমার অন্নদাতার গায়ের রক্ত! তুমি যে আমার সৌদামিনী মায়ের মেয়ে! তিনি তোমায় মরবার সময় আমার হাতেই যে দিয়ে গেছেন, কিন্তু যদি তোমায় সুখী করতেই না পারলাম, যদি তোমায় এক অভাবের কষ্ট হতে বার করে অপার দুঃখের মধ্যেই ঠেলে ফেলতে হলো, তবে কেমন করে তোমার বেহারিদার মুখে হাসি আসে দিদি? এতে কি তার বুক ফেটে যাবে না? সে যে এই পৃথিবীতে এসে শুধু এই একটিই ব্রত নিয়েছিল, তাও তার পচে গেল, উদ্‌যাপন হলো না!

বিহারীর দুই চোখ অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে হীরার কুচির মত ঝকিয়া উঠিয়াছিল, শীর্ণ পাণ্ডু মুখে বিগত যৌবনের উচ্ছ্বাসময় তপ্ত রক্ত আবীরের দীপ্তি ফুটাইয়া দিয়াছে, অপর্ণার আনত মুখের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া সুস্পষ্ট স্বরে কহিতে লাগিল—আমায় এতটা নীচ তুমি ভাব না সে যেমন তুমি জান তেমনি আমিও জানি, সে দিন যে অকথ্য

কথাগুলো বলেছিলে, সে আমাকে খোঁছা দিয়ে জাগাবার জন্যে, তাও বুঝি, তবু বলি, যা খুশি বলো ঐটুকু বাদে! মনে বড় বাজে।

অপর্ণা তখন আর কিছু বলিল না। যতই হোক সেও মানুষ, মেয়েমানুষ। বিহারী গভীর নিশ্বাসে বুকে আটকান হাঁফটা সহজ করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

মোক্ষদা আসিয়া পঞ্চাশটা টাকা অপর্ণার সাক্ষাতে বিহারীর হাতে দিতে গেল, হাসিয়া হাসিয়া বলিল—বাবু দেছেন। তোমাদের অবস্তার কথা সব ওখানে বন্ন কি না। শুনে বললেন, অন্য একটা বাড়ী ভাড়া নাও। এ বাড়ীতে তো বে হতে পারে না। সাতপাক ঘোরবারও ঠাঁইরত্তি নেই! এখন এই ন্যাও, তা পর যেমন যেমন খরচপত্তর হবে, সব তিনি দিয়ে দেবেন। বল কি মা, সত্তর হাজার টাকা কোম্পানীতে খাটচে! আবার মাস মাস একটি কলম নিকে ছ্যান, কোম্পানী অমনি চারশো টাকা পেন্‌সিন পাঠিয়ে দেয়। সোজা নোক, গোটা জেলার ফাঁসি দেবার কর্তা!

বিহারীর হাতের মুঠা ভিতরের দিকেই আঁটিয়া রহিল খুলিতে চাহিল না। দেখিয়া অপর্ণার দিকে ফিরিল—যা, বলেছিলে! বাবাঠাকুরের আমার মাথায় বেশ একটু ছিট আছে! তা তুমিই তবে ধরো—টাকা কয়টা অপর্ণার হাতে ঠেকিয়া ঝনঝন শব্দে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

—ও কিগো মা-লক্ষ্মীর শব্দ কি করতে আছে! মা লক্ষ্মী যে ওতে বিমুখ হন—বলিয়া সোহাগে গলানো আড়চোখে চাহিতে চাহিতে ঘটকঠাকুরাণী টাকাগুলি কুড়াইতে লাগিলেন। কুড়ানো হইলে বলিলেন—কর্তা বললেন, কালকের জন্যে কোন উদ্‌যোগ করার দরকার নেই, তেনারা সক্কালবেলা চা মুখে দিয়েই আসবেন। আমিও বলি, ও সব ন্যাঠায় কাজ কি? এই তো দুটো দিন বাদ কাছে বসেই 'এটা খাও', 'ওটা খাও' করে খাওয়াবেই!

অপর্ণা কহিল—ওকথা থাক? শোন বাছা ও টাকা তুমি ফেরত নিয়ে যাও। উনি তোমায় লজ্জায় বলতে পারচেন না, এদিকে অন্য জায়গায় বিয়ে পাকা করে বসে আছেন। কাণ্ড দেখ! অনর্থক তুমি কষ্ট পেলে, মনে কিছু

করো না। এই নাও টাকা চারটি দিচ্চি, পান খেও। কি আর করবো বলো, এ মানুষটি যে ঐ একরকমের তা তো তুমি আগাগোড়াই দেখতে পাচ্ছো ? না পাগল, না মানুষ। তোমাদের কথা দিয়েচে, অথচ ওদিকে পাকা দেখা টেকা করে বসে আছে !

মোক্ষদা ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হইল। অমনি অমনিই সে গেল না, দু-চার কথা শুনাইয়া এবং দু-দশ কথা শুনিয়াও গেল। তার পর বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বজ্রাহত বিহারীর পানে প্রখর দৃষ্টিতে চাহিয়া অপর্ণা রূঢ়কণ্ঠে কহিল—বিধবা বউ বিধবা মেয়ের গায়ের গয়না দিয়ে যে বাষট্টি বছর বয়সে নূতন করে কনে সাজায়, তার চেয়েও তুমি নিজেকে অধম মনে করো ? তা যদি করো, তাহলে সত্যিই তুমি তাই ! অতবড় একটা পাষণ্ড বুড়োর হাতে আমায় দিতে পারো, আর এইখানে একটুখানি স্বস্তিতে পড়ে থাকতে দিতে পারো না ? এই ছাই পাঁশ ভালবাসার অত গুমোর ?

—আমি তো আগা গোড়া ও সম্বন্ধর বিরুদ্ধে। ওর জন্যে আধখানা প্রাণ আমার তুমি এই কদিনে বার করে দিয়েচ, বোঝ নি ?

—হুঁ তাই তো ! যত দোষ নন্দঘোষ। আমিই তোমার যত মন্দ সবই করচি। তার জন্যেই বুঝি ভাঙ্গাকুলো বাজিয়ে অলক্ষ্মী বিদায় করছিলে ? ও সম্বন্ধ তুমি আন নি তো কি আমি রাস্তা ঢুঁড়ে ওই ঘটকি মাগীকে ডেকে এনেছিলুম ? যাকগে—এখন ক্ষমা দাও ! মা যা বলে গেছেন সেই উচিত ; আর যা উচিত, তা-ই ভাল।

৪৭

সেই ঘটনার পর দুদিন চুপচাপ কাটিয়া গেল। যতীর সঙ্গের নৈশ-আলোচনা যে ধীরার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, নির্মল ইহা বুঝিয়া বিশেষ লজ্জা পাইল। সে আলোচনা ধীরাকে যেন জ্ঞান রাজ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। উহা তার নিঃস্বার্থ মহৎ অন্তঃকরণকে একান্ত ভাবেই অসুখে ভরাইয়া তুলিয়াছিল। ধীরা বুঝিয়াছে,

সে অন্ধ, সে নির্মলের ন্যায় একজন চক্ষুষ্মানের গলগ্রহ—তাই নিজেকে সে তার স্বার্থে বলি দিতেও প্রস্তুত! কিন্তু নির্মল যে ধীরার নেত্র-কটাক্ষের জন্য এতটুকু লালায়িত নয়, এজন্য কোন অভাবই সে যে অনুভব করে না, এ কথা কেমন করিয়া সে ধীরার কাছে প্রমাণ করিবে? ধীরার প্রতি প্রেম তুচ্ছ নয়, ইহা সে নিজেই বিচার করিয়া বুঝিয়াছে; বুঝিয়া নিজের পরে সে তুষ্ট হইয়াছিল। ধীরার চেয়ে তার আপন বলিতে আর কে আছে? তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তো তার সংসার, সমাজ, জীবন।

আবার ধীরা ঐ কথাই পাড়িল। বলিল—তুমি অপর্ণাকে বিয়ে করো না?

এই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে নির্মল স্তম্ভিত হইল। তার পর কাতর কণ্ঠে কহিল—এ কথা তুমি বারে বারে কেন বলচো ধীরা? আমি কি তোমার কাছে কোন দোষ করেছি? আমায় তুমি চাও না?

ধীরা তার তেমন কণ্ঠস্বরেও বিচলিত হইল না, কহিল—কেন যে বলি, জানি নে; কিন্তু এটি যে আমার মনের একমাত্র সাধ, তুমিই বা কেন তা বিশ্বাস করতে পারচো না?

—তোমার বিশ্বাস, তোমায় আমি ভালবাসি নে, দয়া করি?

ধীরা উত্তর এবার ক্ষণকাল বিলম্ব করিল, অত্যন্ত বিনম্র মৃদুস্বরে কহিল—না, তা আমার বিশ্বাস নয়। ভালবাস বলেই আমি তোমায় দুঃখ পেতে দেবো না; আমার সহ্য হবে না।

স্বামীর সহিত এমন পাকা-গৃহিণীর মত, আদর্শ প্রেমিকার মত গুছাইয়া কথা বলিতেও ধীরার আর বাধে না, আশ্চর্য তো!

শুনিয়া নির্মল স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর কিছুক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া বলিল—কেন তুমি মনে করচো আর একটা বিয়ে করলেই আমি সুখী হব, নৈলে হবো না—কিসে তুমি মনে করচো, তোমাতে আমার সুখ নেই? সুখ তো বাইরে নয়, মনে; আমি সুখী কি অসুখী আমার চেয়ে কে জানবে? যতী যা বলেছে সে কথা ভুলে যাও, সকলকার মন এক নয়। বিশ্বাস করো আমার মনে এতটুকু দুঃখ নেই।

ধীরা অবিশ্বাস করিতে জানে না কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হইল। সে গোপন করিতে জানে না; দ্বৈধভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল—তুমি তো অপর্ণাকে ভালবাস?

এই সংসারের বহির্ভূতা বঞ্চিতা বালিকা—যাহাকে শিশুর চেয়ে বেশী কিছু ভাবিতে পারা যায় না তাহার মুখে এমন সুস্পষ্ট, এমন অকাট্য যুক্তি শুনিয়া নির্মল ক্রমেই বিস্মিততর হইতেছিল! বাক্যস্ফূর্তি তার ক্রমেই যেন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে প্রতারক নয়। গোপন না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অপর্ণার কথা তোমায় কে বলেছে? তাকে আমি ভালবাসি—তুমি কি করে জানলে?

ধীরা অপরাধী ভাবে উত্তর করিল—তোমার মুখে।

—আ—মা—র মুখে?

—অসুখের সময় তুমি 'অপর্ণা অপর্ণা' বলে চেঁচিয়ে উঠতে আর—ধীরা নীরব হইল। নির্মল যে কষ্ট পাইতেছে চোখে না দেখিয়াও সে যেন অনুভব করিল। তাহাকে থামিতে দেখিয়া নির্মল শিথিল স্বরে প্রশ্ন করিল—আর কি?

—বাবার কাছে তুমি যে বলেছিলে—দেশের একজনকে তুমি বিয়ে করবে কথা দিয়েছ! তুমি তাকেই বিয়ে করো। তোমার পায়ে হাত রেখে বলছি, আমি একটুও দুঃখিত হবো না বরং অনেক সুখী হবো। দুজনে এক সঙ্গে থাকবো, আমার সে বোন হবে।

সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া নির্মল কহিল—ধীরা! তোমার কাছে গোপন করবো না, তোমার মত মেয়ের কাছে যে লুকোচুরি করতে পারে, সে পাষণ্ড! আমি অপর্ণাকে একদিন ভাল হয়ত বেসেছিলাম; কিন্তু তাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি বলে যতটা দুঃখ আমার হয়েছিল, সত্যি বলছি, তাকে পাই নি বলে তার শতাংশও হয় নি। এখন? তোমায় আমি অপর্ণার চেয়ে কম ভালবাসি নে এ কথা জোর করেই বলতে পারি। বিশেষতঃ অপর্ণা এখন খুব সম্ভব বিবাহিতা, তার সম্বন্ধে এ সব আলোচনা তো উঠতেই পারে না। যদিও সে বিবাহিতা না-ও হয়, আমি তাকে বিয়ে করবো না। আমি নী:

নই, এ কথা তুমি গর্ব মনে করো না, সত্যই আমি আন্তরিকভাবে তোমায় সুখী করতে চাই ; বিশ্বাস করো, তাতেই আমি সুখী হব।

—কিন্তু আমার তো তাতে সুখ হবে না।

—কেন বারে বারে এমন অসঙ্গত জিদ করচো ধীরা? আমার মনে যে ব্যথা লাগে, তার কিছুই জানো না তুমি! এ সম্বন্ধে আলোচনা আর করবো না বলেই তো তোমায় স্পষ্ট করেই সব কথা বলেছি ; একজনদের কাছে বিশ্বাস-হন্তা হয়েছি, তা বলে এ আমার পেশা নয়! তোমার বাবা আমায় চিনতেন, তাই ভিখারীকে রাজা করে গেছেন! তুমি আমায় চিনতে চাও না, তাই এ কথা বলচো! তোমার স্বামী নিতান্ত একটা অধম নয়, শুধু বিশ্বাসটুকু রেখো।

নির্মল উঠিয়া চলিয়া গেল ; ধীরার অনুমতি না লইয়াই মাল্লাদের ডাকিয়া বাড়ী ফিরিবার হুকুম দিয়া, নদীর তীরে তীরে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া আসিল। ধীরার চিত্ত হইতে এই সাজ্ঘাতিক চিন্তা কেমন করিয়া মুছিয়া ফেলিবে ভাবিয়া পাইল না। যতীশ্বরের উপর এবং নিজের উপরেও রাগ হইল। ধীরার উপরও না হইল তাও নয়, কি এমন কথা বলিয়াছিল যা লইয়া সে এতখানি করিতেছে! সে যা ধরে, ছাড়ে না কেন?

৪৮

সেদিন সুস্পষ্ট ভাবে অত কথা বলিয়া নির্মল আশা করিয়াছিল এর পর ধীরার পক্ষে তাহাকে বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। অপ্রিয়-প্রসঙ্গ বুঝি চুকিয়া গেল!

দেখাও গেল ধীরা আজকাল পূর্বের মত চিন্তাভারাকুল নয়। সে যেন আজকাল স্বামীর মনের উপর গোয়েন্দা-গিরি করিতেছে! বুঝিয়াছিল তার মধ্যে পরিবর্তনের জোয়ার আসিয়াছে। নির্মল তাহাকে যত্ন করিত, এখনও করে, কিন্তু পূর্বে যাহাতে প্রাণ ছিল না এখন তাহা প্রাণময়! তার সেদিনের অভিব্যক্তিতে যে আতিশয্য ছিল না, সত্যই তিনি তাকে ভালবাসেন এবং নিত্যই সে ভালবাসা বর্ধিত হইতেছে ইহা সে বুঝিল, বুঝিয়া সুখী হইল না

ক্লিষ্ট হইল, ভীত হইল। সে দেখে, নির্মল তার কাছে আসিলে সহজে উঠে না; এত কাছে বসে, যে নিশ্বাস তার অঙ্গ স্পর্শ করে, দেহে স্পৃষ্ট হয়। তার সমস্ত আদর পূর্বে মন্দপবন হিল্লোলবৎ ত্বকস্পর্শী ছিল, এখন আবেগ স্পন্দন অনুভূত ও উচ্ছ্বাস কল্লোল শ্রুত হয়। থাকিয়া থাকিয়া সে আর বিমনা হয় না, দীর্ঘশ্বাস তেমন করিয়া জমিয়া উঠে না, রাত্রে গল্প করিতে তার শয্যাপ্রান্তে আশ্রয় না লইয়া তার সঙ্কীর্ণ শয্যার একাংশ অধিকার করিয়া শুইয়া পড়ে। অনেক রাত্রে—কোন দিন সে ঘুমাইবার পরেও উঠিয়া যায়। আরও লক্ষ্য করিল—পূর্বে সে পুঁথির কথাই তার সহিত কহিত, এখন অনেক কথাই কয়।

বজরা হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে, নদী চলিয়াছে, তীরের দৃশ্যাবলী অল্প অল্প পরিবর্তিত হইতে হইতে চলিয়াছে, নির্মল কহিল—বাড়ী পৌছতে দিন দু-তিনের বেশী দেরি নেই, ভয় হচ্ছে, বাড়ী গিয়ে এবার নতুন ভাজের আদরে আমায় না ভুলে যাও!

সে এখন তার সঙ্গে এই রকম হাস্যপরিহাসও করিয়া থাকে, পূজার দেবী কি ক্রমেই প্রিয়ার পদে নমিত হইতেছিল?

ধীরা হাসিল—ভোরের আলো-লাগা সারা রাত্রির ক্লান্ত তারা যেমন হাসে তেমনিই হাসি। ঘুরাইয়া অন্য কথা পাড়িল, বলিল—দাদা হঠাৎ যে এ রকম বিয়েটা করে ফেললেন?

—ভগবান সুমতি দিয়েছেন, আর কি!

—কে জানে কেমন বউ।

—বউকে—আলোকনাথের মেয়েকে আমি দেখেছি, দেখতে মেয়েটি অবশ্য তেমন কিছুই নয়! মানুষ খুবই ভাল। তোমার দাদা এবার সুখী হবেন।

শুনিয়া ধীরা মনে মনে ভ্রাতার মঙ্গল কামনা করিল। পরে বলিল—বউয়ের মুখ দেখে লোকে কত কি দেয়, আমি তো বউ দেখতে পাবো না, তুমি বৌদিকে আমার অলঙ্কারের মধ্যে সব চেয়ে যেখানি ভাল—সেখানি আমার হয়ে দিও।

—আমি কেন, তুমি নিজেই দেবে—এই বলিয়া ব্যথিত নির্মল অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে গেল। ধীরা আবার সেইরূপ রিক্ত হাসি হাসিয়া উত্তর করিল—সে একই কথা।

নির্মল বুঝিল ধীরা দুঃস্বপ্ন ভুলিয়াছে। তারা আর দুজন নাই, দুজনে এখন এক হইয়াছে—এই কথাই সে জানাইল।

ছাদবিলম্বী স্নিগ্ধ নীল আলোকে সুসজ্জিত ক্ষুদ্র কামরাটি ছবির মত দেখাইতেছিল, সেই আলোর আভাসে ধীরার ক্ষুদ্র শুভ্রমুখ পরীলোকের একটি নীলপরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, নির্মল পাশে শুইয়া গল্প করিতে করিতে পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে বারে বারে সেই মুখখানি স্নেহভরে চাহিয়া দেখিল। কাহার সাধ্য ইহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? দুজনকে কি ভালবাসিতে পারা যায় না? কেন যাইবে না! এক ব্যক্তি তার দুটি ভাইকে, দুজন বন্ধুকে তো ভালবাসিতে পারে, তবে কেন দুই, না, হয়ত পারে না। কই আজকাল তো আর অপর্ণার মুখ তার চিত্তপটে তেমন সুস্পষ্ট নাই। পরস্ত্রী বলিয়া তার ধ্যানের প্রতিমাকে সে যে বিসর্জন দিয়া দিয়াছে, তাই না ধীরার এই কল্যাণীমূর্তি অন্তরে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

কথায় কথায় দুর্ভাগ্যক্রমে, সেকালের সতীদাহ প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল। নির্মলের প্রপিতামহী স্বামীর সহিত বড় ঘটা করিয়াই নাকি সহমরণে গিয়াছিলেন। কত নাকি বাদ্যভাণ্ড পুষ্পবর্ষণ, খৈ-কড়ির ছড়াছড়ি, দর্শকের হুড়াহুড়ি হইয়াছিল, সতীর সিঁথার সিন্দুর ও চরণরেণু পাইবার জন্য জনসঙ্ঘের কাড়াকাড়ি নাকি থামান যায় না! এ গল্প নির্মল শিশুকাল হইতে শুনিয়াই আসিয়াছে। যেমন যেমন শুনিয়াছিল, ধীরার কাছে গল্প করিল। ইনি স্বামীর দুর্ভাগা স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু যেমনি স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গে স্বামীর উদ্দেশ্যে শ্মশানে আসিয়া সময়োচিত সজ্জা ও ক্রিয়ানুষ্ঠানাদি সম্পাদন পূর্বক স্বামীর পদতলে বসিয়া, পা-দুটি কোলে লইলেন। হাসিয়া কহিয়াছিলেন —বড় যে তফাতে রেখেছিলে! এইবার? সেখানে তো ছুটকী (সপত্নী) যাচ্ছে না, এখন যে আমারই সেবা খেতে হবে গো!

গল্প শেষ হইল, নির্মল চোখ মুছিল, ধীরা নিশ্চল, চোখে তার জলের রেখাও ছিল না। সহসা বলিয়া উঠিল—আচ্ছা আমি তোমার কি কাজে লাগবো ?—গল্প শুনিয়া যেন তার মনের মধ্যে একটা ঝড় বহিয়া গেল।

নির্মল বলিল—ফের সেই কথা!

—না না, তুমি বারণ করো না, আমায় বলতে দাও গো, বলতে দাও! না বলে আমি যে থাকতে পারছি নে—বলিতে বলিতে বিছানার উপর অস্থির হইয়া উঠিল বসিল। নির্মলও উঠিয়া বসিয়াছিল; এই ব্যাকুলতাময় কাতরোক্তিতে মন তার কি যে হইয়া গেল—সে আর বাধা দিতে পারিল না। শ্বাস প্রশ্বাসে যেন তার ঝড়ের শব্দ! ক্ষণ পরে ঈষৎ শান্ত হইয়া ধীরা কহিল—লোকে বিয়ে করে কেন?

—ঘর সংসার করবে বলে, ভালবাসবে বলে, ভালবাসা পাবে বলে।

—শুধু কি তাই? বইয়ের লেখকেরা তো লিখেছেন, সন্তানের জন্যে বিয়ে করে।

—বেশ তো।

—তুমি কেন তবে আবার বিয়ে করবে না? তুমি তো জানো, আমার সন্তান হলে সে অন্ধ হতে পারে!—বলিয়াই সে আপনার কথায় আপনি কাঁপিয়া উঠিল। স্বামী-পুত্রের এই সর্বনাশ সাধন করিতেই কি এই নারীদেহ ধরিয়া সে জগতে আসিয়াছে?

নির্মল সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না; বলিল—তাই কি সব সময় হয়? না-ও তো হতে পারে।

—সম্ভবই তো বেশী।

সে নীরব রহিল। যে এমন অকপট, সংসারের কৃত্রিম লজ্জা জ্ঞান পর্যন্ত যার আজও জন্মে নাই, তার কাছে মিথ্যা বলা যে বড় সহজ বলিয়াই বড় কঠিন! এই অবসরে ধীরা কহিল—তবে কেন তুমি বিয়ে করবে না?

নির্মল এতক্ষণে উত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছিল; বলিল—সন্তান কি সবার হয়? আমাদের না-ই হলো? আমরা আমাদের ধন দেশের কাজে, সদ্ব্যয়

করবো! শোন ধীরা! তুমি যখন ও-কথা ভুলতে পারছো না, তখন আরও একটা কথা তোমার জানা দরকার; ইচ্ছা থাকলেও আমি বিয়ে করতে পারি না। তুমি বর্তমানে আর কাকেও বিয়ে করবো না; করলে আমাদের হিন্দু-বিবাহ সত্ত্বেও আমি দণ্ডনীয় হবো; এই কথা তোমার বাবা ও অপর দশজনের সাক্ষাতে লিখে দিয়েছেন, দস্তুরমত তা রেজেষ্ট্রী করা দলিল হয়ে আছে। তুমি কি চাও, তোমার খেয়াল রক্ষা করে আমি জেল খাটি?

—আচ্ছা আমি মরে গেল ত তুমি বিয়ে করবে?

—সে আমি তোমার কাছে হলপ করে বলতে পারি নে।—এই বলিয়া নির্মল অত্যন্ত বিরক্তির সহিত উঠিয়া গেল। ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল হঠাৎ ধীরার কান্না শুনিয়া ফিরিয়া আসিল। অব্যক্ত কণ্ঠে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া অত্যন্ত মমতা জন্মিল। কিন্তু তার এতখানি বাড়াবাড়িতে আজ তার উপর ক্রোধের পরিমাণটা সত্যই বেশী হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে এই উপলক্ষে একটু শাসন করিয়া ক্ষান্ত করার ইচ্ছায় উষ্ণরবেই বলিল—তবে কেবল-কেবল ও সব কথা বলো কেন? ফের যদি এ সম্বন্ধে একটি কথা বলবে আমি আর তোমার কাছে আসবো না। তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর। নিজের কথাই ভাবতে শিখেছ, আমি যে কতটা কষ্ট পাই সেকথা তোমার মনেও হয় না!

ধীরা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। নির্মল অনুতপ্ত চিত্তে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে অশ্রু-স্পন্দিত গাঢ়স্বরে কহিল—আর কক্ষনো তুমি এসব কথা বলবে না বলো? তা হলে আমিও তোমায় কখনো আর বকবো না কেমন?

ধীরা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘাড় নাড়িল—না।

—নিজেকে তুমি আমার অযোগ্য মনে করে কেন এত দুঃখ পাচ্চো ধীরা? তুমি দেখতে পাও না আমি পাই, এই তো? বেশ এর জন্য যদি তুমি নিজেকে এতই অসুখী বোধ করো তাহলে আমি আমাদের মধ্যের এ ব্যবধানটা না হয় ঘুচিয়েই দিই? কি বল? তাহলে তো কাকেও কারও অযোগ্য মনে করবার কিছু থাকবে না?

ধীরা স্বামীর বক্ষে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিল—তুমি এবারকার মতন ক্ষমা করো, আর আমি তোমায় কক্ষণ বলবো না।

সমস্যা মিটিয়া গেল! গেল কি?

৪৯

জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী। সাগরগামিনী বেগবতী ইরাবতী অবিরাম কলকল গদগদ স্বরে পুলকময় প্রণয়সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া আত্মদানে ছুটিয়াছে। হৃদয়েশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্তে বেগ বুঝি এমনই অসংবরণীয় হইয়া উঠে? বিপুল বেগে উল্লাসকল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া বিরহিণী দীর্ঘ বিরহের জ্বালা অবসানকল্পে যেন উন্মাদিনী হইয়াছে। তীরে সুদীর্ঘ শালের শ্রেণী আর বড় একটা দেখা যায় না। অদূরে সৌধমন্দিরময়ী নগরীর উপকণ্ঠ দেখা যাইতেছিল। সহর আর দূরে নাই! এদিকে আকাশ পৃথিবী জলস্থল বিশ্বচরাচর আজিকার শারদ জ্যোৎস্নায় আলোকস্নাত। আজ তাদের নৌকা-যাত্রার শেষ রাত্রি বলিয়াই বুঝি তাহা এমন মাধুর্যময়ী? আজ বাতাস বড়ই মিঠা, পাপিয়ার গান তেমনি সুমিষ্ট। আবার ছাদের উপর এই শেষবারের মত গালিচা শয্যায় অর্ধশায়িতা ধীরার মৃদুমন্দ হাসিটুকু সামাদানের সম্মুখে বই খুলিয়া উপবিষ্ট নির্মলের চোখে ততোধিক মিষ্টতর ঠেকিতেছিল! সে পুস্তক পাঠ করিতেছে; মধ্যে মধ্যে পাঠ বন্ধ করিয়া দুজনে দু-একটা কথাবার্তাও চলিতেছে, কারণে অকারণে ধীরা আজ বারে বারেই হাসিতেছে, নির্মলের হাত লইয়া আপন মনে ক্রীড়া করিতেছে, নির্মল একবার কি কথায় হাসিয়া তাহাকে আদর করিয়া চুম্বন করিল, সেও তার প্রতিদান করিল। এমন কাণ্ড আর কখনও সে করে নাই!

দুজনে যে কথা হইতেছিল, তাহার একাংশ এইরূপ—আচ্ছা, যাঁরা সতী হন তাঁরা স্বর্গে গিয়ে তাঁদের স্বামীকে ফের ফিরে পান তো?

—নিশ্চয়।

—যদি তাঁদের আরও সতীন থাকে, আর তারাও যদি স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরে তা হলে কি হয়?

—তা হলে?—নির্মল একটু ভাবিল—ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল—বোধ করি মর্ত্যের মানুষের মত স্বর্গের তাঁদের মন এত সংকীর্ণ থাকে না, সেখানে অনেককেই একজনে হয়ত স্বর্গীয়রা সমান ভালবাসতে পারে।

ধীরা স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্বাস ফেলিল, পরে হাত দিয়া নির্মলের হাতটা একটু ঠেলিয়া দিল, বলিল—পড়ো।

নির্মল পড়িতে লাগিল, আহা এমন দিন কি হবে? শবসাধন সিদ্ধ হবে? মরা আবার বাঁচিবে? মহানিশা তো উপস্থিত! কৈ সে সাধক মহাপুরুষ কৈ?…

সমস্ত পৃথিবীর সকল ধ্বনি নিঃশেষ হইয়া ধীরার কানে বাজিল—মহানিশা তো উপস্থিত। কৈ সে সাধক মহাপুরুষ কৈ?—মহানিশা! এই তো মহানিশা? তার জীবনই তো মহানিশা! আবার মহানিশা কোথায়? এ অফুরন্ত রাত্রির কাছে আর কোন নিশা বৃহত্তর? তবে সাধক পুরুষ কোথায়, কে জানে!—সাধনায় সকলেরই তো অধিকার আছে? মহাপুরুষ সে নয়, কিন্তু সাধনায় বাধা কি? আজিকার এই রাত্রি, কেমন এ? এ নিশাই মহানিশা হোক না!

ঘড়িতে সশব্দে মধ্যরাত্রি ঘোষণা করিল। এই তো মহানিশা! অপ্রতিভের একশেষ হইয়া নির্মল উঠিয়া দাড়াইল—উঃ করেছি কি! অনেক রাত হয়ে গেলো যে! এসো, এসো ধীরা! নীচে যাই।

—যাই—বলিয়া উঠিয়া ধীরা স্বামীর হাত ধরিল, তাহাকে বজরায় রেলিঙের দিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—আজই তো শেষ! আর একটু থাকি না?

দুজনে বজরার ধারে নীচু রেলিঙের নিকটে আসিয়া হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইল। দ্যুলোক ভূলোক সমস্তটাই তখন জ্যোৎস্নার আলোকে ডুবিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ প্রভায় অগণ্য নক্ষত্র জ্যোতিঃ

জোনাকীর চেয়েও নগণ্য প্রভায় রজত সমুদ্রে সাঁতার কাটিতেছে! নীচে নদীজলেও সেই চাঁদ, সেই তারা, অধিকন্তু চাঁদ উর্ধ্বে এক, নিম্নে বহু। প্রতি তরঙ্গ এক একটি চাঁদের টুকরা বুকে লইয়া নাচাইতেছিল ভাসাইতেছিল, এইরূপে নদীজলে কোটি চন্দ্রের উদয় হইয়াছে! ধীরা জিজ্ঞাসা করিল—আজ কি? রাত্রি কি অন্ধকার?

—অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রি, আজ পূর্ণিমা যে।

—ওঃ আজ পূর্ণিমা!—ধীরার মুখও পূর্ণিমার সেই অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের মতই উজ্জ্বল দেখাইল—চাঁদ এখন কোথায়?

—ঠিক আমাদের মাথার উপরে।

—নদীর জলেও চাঁদের ছায়া পড়েছে? আমাদের ঠিক সামনের জলেও কি জ্যোৎস্নার আলো আছে?

—হ্যাঁ, পড়েছে বই কি! সেই যে সেবারে বলেছিলুম, আজও সেই রকম সমস্ত নদীর বুকেই যেন কোটি চাঁদের মালা গাঁথা!

—কি সুন্দর! আঃ—ধীরা অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। ক্ষণপরে অকস্মাৎ নত হইয়া স্বামীর পদধূলি মাথায় নিল, অতি-মধুর-স্নিগ্ধ পুষ্প পরিমল তুল্য মৃদু হাসি হাসিয়া তেমনি শান্তস্বরে কহিল—ক্ষমা করো, আমার এই অন্ধকারভরা জীবন দিয়ে তোমার জীবনকে এমন করে অভিশপ্ত রেখে কিছুতেই আমি থাকতে পারলুম না। আশীর্বাদ করো এই আলোর তরঙ্গে এবার যেন এ মহানিশার প্রভাত হয়!

ভাল করিয়া বুঝিবার, সাবধান হইবার পূর্বেই সেই চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত আলোকোজ্জ্বল সলিলরাশি বিপুল বেগে আলোড়িত করিয়া একটা প্রচণ্ড শব্দ হইল এবং বৃত্তাকারে বিপুল জলরাশি আন্দোলিত করিয়া স্থির জলোচ্ছ্বাস জাল শুদ্ধ হইল। নির্মল দেখিল, ধীরা তার পাশে নাই। একটা অন্তর্ভেদী আকুল আর্তনাদে সুপ্তি-মগ্ন প্রকৃতির সমুদয় কান্তি তৃপ্তি ব্যাহত করিয়া পরমুহূর্তে আরও একটা বৃহত্তর সলিল-বৃত্ত সেই গলিত সুবর্ণধারাবৎ অপরূপ নদী বক্ষে সৃষ্টি করিয়া নির্মল জলে ঝাঁপ দিল।

বাতাস তখন মন্দ মধুর বহিতেছিল, নিদ্রাহীন পাপিয়ার বিরহসঙ্গীত তদপেক্ষাও মধুময়। উপরের আকাশের চাঁদ মধুর হাসির তরঙ্গে তরতর করিয়া ভাসিয়া যাইতেছেন, নীচের চন্দ্রচ্ছায়া শুধু দীর্ণ, বিদীর্ণ—শোকাহত !

৫০

এর চেয়েও কত বড় বড় শোকও তো মানুষকে সহ্য করিতে হয়, তুলনায় হয়ত নির্মলের শোক তার চাইতে বড় না হইতে পারে, তবে শোনা যায় গভীর ক্ষত শুকাইয়া গেলেও উহার চিহ্ন কখনও মুছে না। নির্মলের এ শোকও বড় গভীর, তাই দাগ তার মিলাইল না। কোনদিনই আর মিলাইবার আশাও থাকিল না। নির্মলের চীৎকারে মাল্লাদের ঘুম ভাঙ্গে; ধীরার পতন তারা জানিতে পারে নাই, নির্মলের পতন শব্দই তারা শুনিতে পাইয়াছিল। অচেতন নির্মলকে উহারা বহুকষ্টে টানিয়া তুলিল, ধীরার কথা যখন জানিতে পারিল যতদূর সম্ভব চেষ্টাও করিল; কিন্তু সেই ঘূর্ণাবর্তময় প্রবল স্রোত-জলের গভীর প্রবাহ মধ্যে ততক্ষণে ঝরিয়া-পড়া ক্ষুদ্র যুথিকাটি অবিরল বায়ুবিতাড়িত তরঙ্গ চালনার আঘাতে আঘাতে কোন অনির্দেশ্য পথে ভাসিয়া গিয়াছে, সে কি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় ?

নিজের প্রতি একান্ত ক্ষমাহীন গভীর শোকে নির্মল ধীরার পরিত্যক্ত শয্যাতলে অভিভূত হইয়া লুটাইয়া রহিল। দুরন্ত লোভ তার চারিদিক হইতে সূর্যকরোজ্জ্বলা, অথবা তরঙ্গময়ী জ্যোৎস্নাস্নাতা নদীতরঙ্গ রূপে কুলুকুলু কলকল তানে তার কানে-কানে প্রলোভনের মিষ্ট বাণী কহিতে থাকে, ঝড়ের বাতাস বারংবার বজ্রনাদে তীব্র শাসন ঝাঁকাইয়া কহে—ও কালা মুখ তুই কারু কাছে দেখাস নে ! যেখানে সেই পতিপ্রাণা গিয়াছে, তুইও সেইখানে যা ! অসংবরণীয় লোভে নির্মল উঠিয়া বসিয়াছে, কিন্তু আরও একটা কঠোর হস্ত এই প্রলোভনের তীব্র মদিরা তার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে, তিরস্কার করিয়া বলিয়াছে, আত্মহত্যা দ্বারা তুই কি সেখানে স্থান পাইবি ? তা

সাধনা নিষ্কাম প্রেমের, তোর মাত্র অনুতাপের জ্বালা—তুই কি এক ? সেকালের সতীরা যে স্বামীর অনুগামিনী হইতেন, সেও নিষ্কাম প্রেম নয়, তাতেও মদীয় ভাব থাকিত। এই মদীয়তাই সংসারের স্থিতি শক্তি, এ না থাকিলে সংসার সমাজ গঠিত হইত না, কিন্তু তদীয়তার স্থান এর বহু উর্দ্ধে। সকলি তোমার ; এ সকল তোমার বলিয়াই আমার। সেই তুমিই যদি আমার জন্য সুখী হইলে না, তবে আমার এ জীবনে কাজ কি ? তুমি বলিতেছ, তুমি সুখী, আমি জানি—মনে তোমার সুখ নাই, কিছুমাত্র সুখ নাই ! সংসার, সমাজ পিতৃপুরুষ এঁদের উপর তোমার যে কর্তব্য, তাহাতে যদি তোমার হানি হইল, মানবদেহ পাইয়া যদি সংসারে যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করিতেই পারিলে না, তবে তোমার জীবনে যথার্থ সুখ আসিবে কোথা হইতে ? তোমার জন্মই অফলা, জীবন ব্যর্থ। আমার জন্য এতবড় ক্ষতি ! এ কি আমি সইতে পারি ? আমি কে ? তোমার জন্যই আমি। যেখানে তোমার পথে এতটুকু বাধা, সেখানে ক্ষুদ্র কঙ্কর কণ্টকের চেয়ে আমার মূল্য বেশী নয়। আমি তোমার সুখের পথ, ধর্মের পথ, যশের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া গেলাম। তোমার জন্য যদি তোমাকেই না ছাড়িতে পারিলাম, তবে তোমার প্রতি আমার ভালবাসার গভীরতা কোথায় ?

হায়, সেই তদাত্মময় সুগভীর প্রেমের সহিত তাহার এই গ্লানিময় ধিক্কারপূর্ণ কলঙ্ক-লাঞ্ছিত জীবন বিনিময় যোগ্য ? তারপর, যাহাদের বিশ্বাস, মরিলে এ পৃথিবীর সব জ্বালা জুড়ায়, মরণ তাদের বন্ধু ; যারা পরলোক বিশ্বাসী, মরণে তার কি এত লাভ ? যেখানে আছি, যাহা আছি, সহিয়া গিয়াছে। সে যে আবার নূতন আরম্ভ। পাপীর মরণকে বড় ভয়, নির্মলের মরণকে যদিও আজ আর ভয় ছিল না, ভক্তিও নাই ! সে ভাবে, গতি আমার যা হইবে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, অগতির চেষ্টা করি কেন ? এ পাপের দণ্ড, এর হাত ছাড়াতে চাইলে সে আমায় ছাড়বে কেন ? পাপ বাড়িয়ে ফল কি ? সহ্য দ্বারা পাপ খণ্ডন করাই ভাল !

দাসদাসীদের সে বাড়ী পাঠাইয়া দিল। তারা বীরার জন্যই সঙ্গে

ছিল, সে গরীব, গরীবের মতই থাকিবে; দাসী-চাকরে তার কি প্রয়োজন?

বজরা ইরাবতীর মোহনার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথম শোকোচ্ছ্বাসে সকল মানুষেরই মত নির্মলও স্থির করিয়াছিল এ জন্মে এ বজরা সে ত্যাগ করিবে না, ধীরার সমাধিস্থল এই নদী-বক্ষই তার একক আশ্রয়। জীবনের অবশিষ্ট কাল সে এরই কোলে কাটাইবে।

এমন করিয়া দিন কাটিয়া গেল। সান্ত্বনা সুধীবাক্য অথবা কর্ম সমুদয় শোকঘ্ন বিষয় বস্তুর একান্ত অভাবে নির্মলের অনুতাপ-বিদ্ধ গভীর শোক-ক্ষতের লাঘব হইতে পাইল না, সে সেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ধীরাময় হইয়া রহিল।

একদিন দ্বিপ্রহরে যথা নিয়মিত পালঙ্কে শুইয়া সে সারিসারি খোলা জানালাগুলার মধ্য দিয়া ইরাবতীর বক্ষে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। চিন্তাকুল মনে হইলেও মনে তার চিন্তামাত্র ছিল না, বায়ুলেশহীন স্তব্ধ! শোকে যখন সমস্ত ভস্ম করে, চিন্তাশক্তিকেও সে বাদ দেয় না, অতীতের স্মৃতিমাত্রই সম্বল হয়, ভবিষ্যৎ শোকসাগরে ডুবিয়া যায়।

বাহিরে বাতাস ছিল, নদীর জল বায়ু-সন্তাড়িত, তরঙ্গভঙ্গিমাময়, জলতরঙ্গ সূর্য কিরণে ঝলমল করিতেছে, বজরা মন্দ গমনে উদ্দেশ্যহীন গতিতে--বুঝিবা ,আরোহীর অন্তরের অনুকৃতিতেই অনির্দেশ্য যাত্রা পথে ভাসিতেছে।

কি একটা যেন ঘটিল; কিসের যেন সোর গোল শোনা গেল। একখানা ষ্টীম লঞ্চ ঝক ঝক করিয়া বজরার কাছে আসিল। তারপর বজরার মাল্লাদের সম্মান সূচক অভিবাদন সম্ভাষণ শোনা গেল, দেখিতে দেখিতে ভারি জুতা পায়ের ধ্বনির সহিত কামরার মধ্যে কেহ প্রবেশ করিল। তখন মুখ ফিরাইয়া নির্মল দেখিল, ব্রজরাজ!

ব্রজ হ্যাট ও ছড়ি ফেলিয়া রুমালে ঘর্ম মোচন করিতে করিতে ভগিনীপতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিল—হ্যাঁ নির্মল! তোমার এ কাণ্ডটা কি? এতদিন হয়ে গেলো ফিরলেও না, খবরও দিলে না, এ কি! অ্যাঁ!

এ কি চেহারা হয়েছে! অসুখ থেকে উঠেও তো এর চাইতে ভাল এসেছিলে, অ্যাঁ!

নির্মল আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোর বিস্ময়ের তাড়নায় তাহাকে সময়োচিত একটা সম্ভাষণ করিতেও তার মনে রহিল না। শুধু বিস্ময়ই নয়, বিস্ময়ের সহিত লজ্জা ভয়ও মিশ্রিত ছিল। সর্বপ্রধান হইয়া উঠিতেছিল শোক!

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো, ভাই বসে পড়ো না—ছি ছি! এমন করেই কি শরীর মাটি করতে হয়? দুঃখ সংসারে কার না আছে? আমারই কি দুঃখ হয় নি? কানা হোক, যাই হোক, তবু তো মায়ের পেটের ঐ একটা বোনই ছিল! সে থাকতে তাকে একদিনও আদর করি নি, যত্ন করি নি, কিন্তু—বলিতে বলিতে ব্রজ ললাট হইতে কেশগুচ্ছ অপসারিত করিয়া রুমালে চোখমুখ ঘষিয়া মুছিল। তারপর নিকটস্থ হইয়া নির্মলের হাত ধরিয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহের সহিত তাহাকে খাটের উপর বসাইয়া নিজেও তার পাশে বসিল। বাস্তবিকই নির্মলকে প্রায় চেনা যায় না। তার উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে, চোখের কোলে বৃত্তাকারে কালি পড়িয়াছে; পরিপুষ্ট মুখ শুকাইয়া লম্বা ও সরু হইয়াছে, গলার ও কাঁধের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে বিশেষ তাহার গায়ের সে কাঁচা সোনার রঙ, ব্রজ যার বিশেষ করিয়াই হিংসা করিত, সে রঙ তার আর নাই!

আজ কিন্তু ব্রজ ইহাতে খুশী হইল না! সে তার দিকে অনুযোগ মিশ্রিত করুণায় চাহিতে চাহিতে কহিতে লাগিল—নিজেকে কি করে ফেলেছ! শরীরে যে কিছু রাখো নি নিমু! এমন করে দেহপাত করলেই কি তাকে ফিরে পাবে?

এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—হ্যাঁ, বলছিলাম কি, যেমন তার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি তথাপি বুঝতে পেরেছি, সত্যি সত্যি তাকে যে আমি দেখতে পারতুম না, তা তো নয়! বরং তখন এমনি আশ্চর্য —তখনই হঠাৎ মনে হল কেনই বা এতদিন তাকে এতটুকু আদর করি নি?

দুটো মিষ্টি কথা কখনো তাকে কেন বলি নি? তাকে যে আমি ভালবাসতেম, সে তো তা জানতেও পারলে না! তাকে যে আমি ভালবাসতেম, কেনই বা তাকে তা জানতে দিলেম না? তাকে জানাবো কি? নিজেই যে এ কথা জানি নে, সে চলে যাবার এক মিনিট আগেও না! এ কি আশ্চর্য নিমু? —ব্রজর স্বর ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। নির্মল অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিতে দেখিল, তার দুই চোখ জলে ভরা। সহসা ভরা গাঙ্গে জোয়ার বহিল, ফোঁটা দুই জল তার পুরুষ কঠিন গণ্ডের উপর নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল। নির্মল বুঝিল এ কি জল! পাষাণ বিদারী সলিলটুকু যমুনা কাবেরী গঙ্গা গোদাবরী সরস্বতী কারও চেয়ে কম পবিত্র নয়। তখন আর কি রক্ষা থাকে? নির্মল তখন নিজের এই অশ্রুহীন শোকের এতদিনের সমস্ত জমাট অশ্রু সেই ভ্রাতৃস্নেহের বাতাসস্পর্শে এক মুহূর্তে উজাড় করিয়া দিল। সেই অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে বুঝি অনেকখানি আগুনও নিবিয়া আসিল।

৫১

মানুষ মনে মনে যত বড় বড় সঙ্কল্পই করুক—সবটাই থাকে না। প্রতিজ্ঞা করা শক্ত নয়, রক্ষা করাই কঠিন! নির্মল যে স্থির করিয়াছিল, সে আর রেঙ্গুনের সেই বাড়ীতে ফিরিবে না, সে সঙ্কল্প সে রাখিতে পারিল না, ব্রজ তাহাকে রাখিতে দিল না, ব্রজর অনুরোধ এড়াইয়া যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

যখন বাড়ীই ফিরিল, তখন কাজকর্ম আপনা হইতেই হাতে উঠিয়া বসিল, তারা যে এত দিন তার পথই চাহিয়া আছে। তখন নির্মলই বা কি আর করিবে যথাপূর্ব অফিসে বসিয়া হিসাব দেখিতে কেরানীদের কাজ লইতে অংশীদারদের সহিত পরামর্শ আঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। না করিলেই বা দিন কাটে কিরূপে? যদি প্রিয়জন হারাইয়া এ পৃথিবীতে স্থায়ী হইতে চাও, যত পার, নিজেকে খাটাও; তিলমাত্র বিশ্রাম লইও না, অতীতের পানে চাহিয়া

দেখিও না, ভবিষ্যৎকে কাছে ঘেঁসিতে দিও না, হাড় ভাঙ্গিয়া কাজ কর, একটুখানি ত ভুলিবে। যদি এই সঙ্গে ভগবানের আশ্রয় লইতে পার, হারানো ধনকে তাঁহেই সমর্পণ করিতে পার, শান্তি পাইবে, এ ভিন্ন পথ নাই।

নির্মল ব্রজর সহিত পূর্বে কখনও মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই, এখন কহে। কহে যে, নির্মলের সাহস বৃদ্ধি তার কারণ নয়, ব্রজর পরিবর্তনই ইহার মূল। ধীরার প্রতি অবিচারের খেদটা সে তার স্বামীর উপর দিয়া মিটাইতেছিল। ধীরা যে এই স্বামীকে সুখী করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, এ কথা নির্মল তো গোপন রাখে নাই।

একদিন দুজনে বহু বিতর্ক হইল। নির্মল ধীরার সম্পত্তি দুই ভাগ করিয়া এক অংশে ধীরার নামে কোন স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপন করিতে, অপরার্ধ যাদের বিষয় তাদেরই ফিরাইয়া দিতে চাহিল। সে জানিত ব্রজ এই সম্পত্তি দানটাকে এক সময় বড় কঠিন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল। তার যখন আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, তখন কেন সে অপরের ন্যায্য পাওনা কাড়িয়া লইবে! লইয়াই বা তার লাভ কি?

ব্রজ এ কথায় কর্ণপাত করিল না। অনেক বাদানুবাদের পর সে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—তোমার দরকার না থাকে বিলিয়ে দাওগে, লুটিয়ে দাওগে, রাস্তায় ছড়িয়ে দাওগে। আমি কেন আমাদের দান-করা জিনিষ ফিরিয়ে নিয়ে দত্তাপহারী হবো? বাবা যখন দিয়েছিলেন আমি অবশ্য খুশী হই নি, কিন্তু যখন দেওয়াই হয়ে গেছে, তিনিও বর্তমান নেই, তখন তাঁর দেওয়া জিনিষ ফিরিয়ে নেওয়ায় আমার কিসের অধিকার?

তারপর কিছু ঠাণ্ডা হইয়া বলিল—এত তাড়াতাড়ি কেন? তুমি ছেলেমানুষ সামনে চিরজীবন পড়ে আছে, ব্যস্ত হবার দরকার কি? স্রোতের মুখে ফেলে দিয়ে বসে দেখ, কোথায় কি নিয়ে যায়!

ব্রজ কি আজকাল অদৃষ্টবাদীও হইয়াছে না কি? নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়!

যতীশ্বর আসিয়াছিল। নির্মলকে একবার দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সে বহু চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হয় নাই।

এবার ব্রজর সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া মাকে সে সঙ্গে আনিয়াছে। পিসিমা আসিয়া ভাইপোর ঐশ্বর্যে বিস্ময়ানন্দ এবং শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তারপর মাথার দিব্য দিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি অশ্রুজলও বর্ষিত হইল। অগত্যা কোন আপত্তিই টিঁকিল না; প্রধান আপত্তি ব্রজ নিজেই কাটাইয়া রাখিয়াছিল। সে বলিল—তোমায় দু মাসের ছুটি দিচ্চি। সেই পর্যন্ত যেমন করে হয় কাজ চালাবো, কিন্তু দেখো ভাই! তার চাইতে দেরি করো না, পেরে উঠবো না।

ব্রজ নিজের জীবনযাত্রার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। এখন সে ইচ্ছা করিলে নির্মলের সাহায্য ব্যতিরেকে অফিস চালাইতে পারে! পারিবে না কেন? সে ত অক্ষম বা মূর্খ নয়!

নির্মল তার অংশ ব্রজকে বেচিয়া ফেলিতে চাহিল। ইচ্ছা, যখন যাইতেছে আর ফিরিবে না।

ব্রজ এ প্রসঙ্গে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তার পৃষ্ঠের পরিবর্তে টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিয়া উঠিল—তুমি অতি পাষণ্ড! নির্মল! এরই মধ্যে ভুলে যাচ্ছো, বাবা তাঁর কারবার সম্বন্ধে আমার চেয়েও তোমাকে বেশী বিশ্বাস করেছিলেন? তুমি ভুলে যেতে পার; কিন্তু আমার সেটা মর্মান্তিক হয়েছিল কি না, আমি ভুলি নি।

নির্মল বুঝিল, তার হাত-পা এ বাড়ীর সঙ্গে চিরকালের মতই বাঁধা, উদ্ধারের উপায় নাই! যাত্রাকালে অতীত স্মৃতির সহস্র বৃশ্চিক দংশন জ্বালায় জ্বলিয়া সে বাষ্প পরিপূর্ণ সজল মেঘের মত স্তম্ভিত হৃদয় লইয়া কোন মতে সবার কাছেই বিদায় লইল! ব্রজ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে চিবুক স্পর্শ করিল। তার পর উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—প্রিয়! প্রিয়ম্বদা শুনে যাও।

প্রিয়ম্বদা লজ্জায় জড়সড় হইয়া দেখা দিল। না আসিলে রক্ষা নাই, সে কথা সে জানে।

ব্রজ কহিল—তোমার ঠাকুরজামাই দেশে যাচ্ছেন! তোমার জন্মে সেখান থেকে কিছু আনতে হয়ত ওঁকে বলে দাও না।

প্রিয় নির্মলকে বড় আপনার বলিয়া জানিয়াছিল। তাদের দরিদ্রাবস্থায় নির্মলের কাছে তারা বড়ই সহানুভূতি পাইয়াছিল। এখনও তাদের বাড়ীর সবাইকারই কেমন একটা ধারণা যে, তাদের এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মূলে নির্মলের কিছু হাত আছে। সে ছলছল নেত্রে নির্মলের মুখের দিকে চাহিতেই নির্মল নমস্কার করিল। সম্বন্ধে সে এখন নির্মলের মাননীয়া।

প্রিয় লজ্জায় ব্রজর দিকে অপাঙ্গদৃষ্টি করিলে, ব্রজ তাহাকে কি একটা ইঙ্গিত করিল। প্রিয় তখন নতমুখে বলিল—দেশে যাচ্ছেন, আমায় কি এনে দেবেন বলুন?

নির্মল ক্ষীণ হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি চাই বল?

—আমার ঠাকুরঝি নেই, আমায় একটি ঠাকুরঝি এনে দেবেন। আমি বড় একা, আমার বড্ড কষ্ট হয়।—বলিতে বলিতে সত্য সত্যই তার চোখ দুটি ছলছলিয়া আসিল। ধীরাকে বিশেষ ভাবে না দেখিলেও তার জন্য মনে তার বড় অভাব ঠেকিত।

এমন সময় ব্রজও তার কাঁধে হাত রাখিয়া অনুরোধের স্বরে কহিল—ও ঠিক বলেছে নির্মল! যদি আমার উপর তোমার কিছুমাত্র ভালবাসা থাকে ভাই, তাহলে আমাদের এই অনুরোধটি তোমায় রাখতেই হবে। আমার বোন অকালে চলে গেছে, আমায় আর একটি বোন তুমি এনে দাও। আমি—আমি ধীরাকে কখনো আদর করি নি, এবার তাকে করবো—

তখন আবার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। ব্রজ কাঁদিল, প্রিয়ম্বদা কাঁদিল, নির্মল কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইল।

মেয়েমানুষে কথা চাপিতে পারে না। নির্মলের পিসিমাও ত মেয়েমানুষ ছাড়া নন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের আয়ত্ত দেখিয়াই তাঁর আগমনের আসল উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতে বিলম্ব করিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বয়স্থা অনূঢ়া কন্যার সংবাদও প্রদান করিয়া বলিলেন—আমাদের বামুন কায়েতের ঘরে বড় মেয়ের, ভাল মেয়ের ভাবনাটা কি! এখন এদের মধ্যে যাকে তোর পছন্দ, নিজে দেখে বিয়ে কর। কিসের বয়স তোর—ইত্যাদি—

নির্মল প্রথমে নীরব রহিল। নীরবতায় উল্টো উৎপত্তি হয় দেখিয়া পিসিমার সহিত তর্ক করিল। তর্ক করিতে গিয়া দেখিল সেখানেও সে দুর্বল। কলেজে পাশ্চাত্য-ন্যায় পাঠ্য থাকিলেও সে শাস্ত্রে সে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে নাই। তাছাড়া মা-পিসিমাদের সঙ্গে যথাশাস্ত্র তর্কে জয়ী হওয়া অসম্ভব। অগত্যা হাল ছাড়িয়া আবার মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ বোধ করিল।

পিসিমা বড় বড় যুক্তি দেখাইলেন। নির্মলের শ্বশুরের উইলের খবর শুনিয়াছিলেন, তাহাকেই নজীর করিলেন, বলিলেন—তোর শ্বশুর যে তোর এতটা করলে তার কথাটাও তোর রাখতে হয়? তিনি যে উইলে লিখে গেছেন যদি তাঁর মেয়ে মারা যায়। সমস্ত সম্পতি তার স্বামাকে অশাবে, এতে কেউ আপত্তি তুলতে পারবে না। আরও শুনলুম, লিখে গেছেন, তাঁর মেয়ে যদি অল্প বয়সে অপুত্রকা মারা যায়, জামাই যেন আবার বিয়ে করেন, তাঁর এই অনুরোধ। শুধু বিয়ে করাই নয়, তাঁর জামাইয়ের দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁর কন্যার মত তাঁর ইচ্ছা হলে বাড়ীতে বাস করতেও পারে! তার গর্ভের ছেলেরা—তাঁর নিজ দৌহিত্র না হয়েও ত্রিরাত্রির অশৌচাধিকারী হবে। তা নিমু! এমন শ্বশুর কিন্তু কেউ সাতজন্ম তপস্যা করেও পায় নি'!—এ শ্বশুরের অনুরোধই বলো, আর আদেশই বলো—এ তোমার ঠেললে পরে মহাপাতক হবে।

নির্মল আর একবার পিসিমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। শ্বশুর যে কারণে এইরূপে নিজের জলগণ্ডুষের একটি কণা বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁর

সৌভাগ্যক্রমে সে দারুণ আতঙ্ক কার্যে পরিণত হয় নাই! ব্রজ স্বজাতিকন্যা বিবাহ করিয়াছে, উক্ত কন্যার গর্ভজাতপুত্র পিতৃপুরুষের যথার্থ পিণ্ডাধিকারী। এখন তাঁর দৌহিত্র পাতানোর প্রয়োজন নাই—কিন্তু পিসিমার পণ, কিছুতেই তিনি বুঝিলেন না! শেষে নিজের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ কাঁদিতে বসিলেন। তাঁর দাদা থাকিলে, বউ থাকিলে কি হইত, এই প্রশ্ন তুলিলেন, হার মানিয়া নির্মল আবারও রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল।

চারিদিকেই যখন শত্রুসৈন্য, পালাবেই বা সে কোথায়? ডেক-চেয়ারে বসিয়া অনন্তবিস্তার জলরাশির পানে চাহিয়া সে ধীরার কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল ধীরার দৃষ্টিহীন চোখ দুটি ঠিক এমনি গভীর নীল, এমনি রহস্যময়, এমনই অতলস্পর্শী ছিল! আর ভিতরটা তার এইরূপই রত্নের আকর! সুগভীর নিশ্বাস মোচন করিল।

যতীশ্বর পাশের চেয়ারে বসিয়া ছিল। ডেক জনহীন। রৌদ্রের তাপ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই, যাত্রীরা যে যার কামরায় বিশ্রাম লইতে গিয়াছে।

যতী চেষ্টা করিয়া আশপাশ দু-একটি বাজে কথা কহিতে লাগিল। নির্মল বেশী কথা কহে না। ধীরার মৃত্যুর পর এই এগার মাস ধরিয়া সে প্রায় মৌনাবলম্বন করিয়াছে; একেই ত কোন দিনই সে প্রগল্‌ভ নয়।

এমনি করিয়া যতীশ্বর নিজেকে প্রস্তুত করিয়া বক্তব্যটি ফাঁস করিল, বলিল—কদিন ধরেই তোমায় একটা কথা বলবো বলবো করচি।

কথাটা যে কি—সে সম্বন্ধে নির্মলের আন্দাজ ছিল, কাজেই শুনিবার জন্য সে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন না করিয়া পরম গম্ভীর মুখে গাম্ভীর্যময় সমুদ্রবক্ষেই লক্ষ্য স্থির রাখিল।

যতীশ্বর তাহাকে প্রশ্ন-বিমুখ দেখিয়া আপনিই কহিল—শোকে আচ্ছন্ন হওয়া পৌরুষ নয় নিমু-দা! যে চলে গেছে, তার জন্যে বৃথা আকুলতা তমোগুণকে প্রশ্রয় দেওয়া।—যতীশ্বর বোধ করি গীতা পড়িয়াছে!

নির্মল মনে মনে চটিতেছিল। এখন সহজেই রাগ হয়, বিশেষ ধীরাকে

ভুলিবার কথায়। সে শ্লেষের সহিত কহিয়া উঠিল—ঠিক! মৃতের স্মৃতিকে অতলজলে ডুবিয়ে দেওয়াই মনুষ্যত্ব—সেইটেই সত্বগুণ!

যতীশ্বর টিপ্পনি শুনিয়া কিছু অপ্রতিভ হইল—তাই কি বলেছি? মৃতের স্মৃতি আমাদের পূজার কিন্তু জীবিতের দুঃখ কি করুণার বিষয় নয়?

—হতে পারে, কিন্তু আমরা ত বুদ্ধ বা যীশুখৃষ্ট নই, যে জগতের দুঃখ দূর করবো।

—একজন সবার দুঃখ দূর না করতে পারি; কিন্তু প্রত্যেকে ত প্রত্যেকের জন্যে চেষ্টা করা যায়? আমি জগতের কথা বলছি নে—ব্যক্তিবিশেষের কথাই বলছি—অপর্ণার কথাই বলছিলুম।

নির্মলের হৃদয় ব্যাপিয়া যে বিরক্তিটা জমিয়া উঠিয়াছিল, তার খানিকটা কুয়াশার মতই কাটিয়া আসিল, স্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টিতে সে এবার যতীশ্বরের মুখের দিকে চাহিল। প্রশ্ন বুঝিয়া যতী উত্তর দিল—অপর্ণার আজও বিয়ে হয় নি।

জলের উপর সর্বদাই ভূমিকম্প অনুভূত হয়, সে কিছুই বিচিত্র নহে, নির্মলের শরীরে মৃদু কম্পন হইল। যতী কহিতে লাগিল—আর বছর তোমার কাছ থেকে ফিরে অপর্ণাদের খবর জানবার জন্যে মনে একটা কৌতূহল জন্মেছিল, খবর নিয়ে জানতে পারলেম তার তখনও বিয়ে হয় নি, বিয়ের কথা হচ্ছে। আমার জানা একটি ভাল ছেলে ছিল, আমি তার সঙ্গে বিয়ের কথা ঘটকের মুখ দিয়ে বলে দিলুম, পরে শুনলুম বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, পাকা দেখাও হয়েছে বলে শোনা গেল, তার পর আর কোন খবর নিই নি। তোমার স্ত্রী যে আমি চলে আসার পরই জলে ডুবে মারা যান, সে খবর ত তখনও পাই নি। পেলে অবশ্য এত সব করা যেত না।—যাই হোক যখন ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি আন্দাজ এই খবরটা পেলুম, আবার অপর্ণার খবর জানতে ইচ্ছা হলো, নিজেই সেবার বাকুল গেলুম, গিয়ে শুনলুম—যতী এইখানে একটু থামিল।

নির্মল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সব কথা যেন সে ভাল

করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, মনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা ভীতি জাগিতেছিল।

—গিয়ে শুনলুম, সব উল্টে গেছে! অপর্ণার মায়ের মাতামহ মারা গেছেন, তাঁর বৈমাত্র সম্পর্কের এক নাতি এসে বিষয় আশয় বাড়ী ঘর সব দখল করেছে, ওদের সঙ্গে নাকি বনিবনা না হওয়ায় বাড়ীর পুরনো সরকার তাদের নিয়ে ত্রিবেণী চলে গেছে। ত্রিবেণীতেও খবর নিয়ে জানতে পারলুম—বামুনমাসি মারা গেছেন, তার পর তারা যে কোথায় আছে, সে খবর অনেকদিন আর পাই নি।

নির্মল এইবার প্রশ্ন করিল—তার পর পেলে?

—হ্যাঁ, বিস্তর খোঁজ তল্লাস করতে করতে হঠাৎ এই সেদিন মাত্র জানতে পেরেছি, আমাদেরই এক ডাক্তার ফ্রেণ্ডের শ্বশুরবাড়ীর মুহুরী—অপর্ণার অভিভাবক সেই বিহারী চক্রবর্তী। তারা এখন ভবানীপুরে রয়েছে। এই সেদিন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। অপর্ণার বিয়ে যদিও হয় নি। কিন্তু কি একটা যেন ঘটেছে, সেটা ঠিক বোঝা গেল না। বিয়ের কথা কিছুতেই ও আলোচনা করতে চায় না! তোমার কথা উঠলো; তোমার স্ত্রী মারা গেছে, তাও বললুম, অপর্ণা শেষটায় আমার সঙ্গে এমন তাচ্ছল্য ব্যবহার করতে লাগল, যে বেশ বুঝতে পারলুম যাতে আমি উঠে যাই—আর না আসি, এই তার মতলব! শেষে অনেক কষ্টে বিহারীর কাছ থেকে এটুকু কথা বার করতে পেরেছি, আগামী ১৫ই শ্রাবণ অপর্ণার বিয়ে। বর কোথাকার? কেমন? সে খবর কিছুতেই বার করতে পারি নি, কোন কথা দুজনের একজনও বলতে চায় না। বোধ করি, দেখে শুনে পৃথিবীর উপর ওদের ঘৃণা জন্মে গেছে! তাই বলচি নিমু-দা। তোমার কি এখন অপগতার জন্যই শুধু শোক করা উচিত? না যে এখন পর্যন্ত দারুণ দুঃখ ভোগ করছে, তার মুখ চেয়ে নিজেকে সামলান কর্তব্য?

নির্মল জবাব দিল না। জবাব দিবে কি, সে ত আর এ সব কথা শুনিতেছিল না,—তার হৃদয়সাগরে তখন এই চক্রমথিত সলিলরাশির মতই

চিন্তারাশি উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হইয়া জলকল্লোলের ধ্বনি তুলিতেছিল। আর সেই ধ্বনিকেও পরাভব করিয়া একটি সকরুণ মিনতি কর্ণকুহরে বাজিয়া বাজিয়া বলিতেছিল—তুমি অপর্ণাকে বিয়ে করো! তুমি ত অপর্ণাকে ভালবাস! তুমি ত তাকে বিয়ে করবে বলে বাগদত্ত ছিলে! কেন বিয়ে করবে না?

ওঃ! ভগবান! ভগবান! তবে কি তুমি অপর্ণাকে স্থান করে দেবার জন্যই দুঃখিনী ধীরার জায়গাটুকু খালি করলে? ধীরা! ধীরা! লোকে বলে তুমি দেখতে পেতে না—অন্ধ! কিন্তু তুমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলে আজও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারই প্রতীক্ষায় অনূঢ়া জীবন যাপন করছে? তাই কি অমন করে সরে গেলে?

যতীশ্বর বলিল—কি বলো? আর সময় নেই, আজ ৭ই শ্রাবণ ১৫ই বিয়ে।

নির্মল জবাব দিবার পূর্বেই ধীরা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তার হইয়া সে-ই জবাব দিল—ধীরার এই শেষ অনুরোধ ছিল—

তারপরেই নির্মল বলিল—কিন্তু—

যতী ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল—কিন্তু তো থাকবেই! কিন্তু কিন্তুর জন্য 'কিন্তু' হলে তো চলবে না দাদা! উভয় পক্ষীয় দুটো 'কিন্তু'কেই সামঞ্জস্য করে নিতে হবে।

নির্মল চলোর্মিমালাবিমণ্ডিত অপার নিরধীর বক্ষে চাহিয়া গভীরতর শ্বাস মোচন করিল। নিজের জন্য নহে, পূর্ববদ্ধ সত্যের জন্যও সে অপর্ণাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। সুখের আশা তার নাই, কিন্তু অপরকে সুখী করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করা চলে না! ধীরা তাহাতে পরলোকে হয়ত অসুখী হইবে।

৫৩

দ্বারে কড়া নড়িতেই ঠিকা ঝি সকড়ি বাসন মাজিতে মাজিতে উঠিয়া বাঁ হাতে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, সেই পথে কে প্রবেশ করিবে জানাই আছে অপর্ণা তাই

এতটুকু উঠানের পাশের টগর গাছটার কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনিই রহিল। একটু পরেই কিন্তু সে নিজের ভুলটা বুঝিয়া মুখ ফিরাইতে দেখিল—যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল সে বিহারী নয়। এ জুতার শব্দ ছেঁড়া চটির নহে, এবং ঈষৎ অগ্রসর হইয়াই সে শব্দটা সঙ্কোচে মিলাইয়া গেলেও সে জোয়ান পুরুষের পায়ের শব্দ, চিন্তা-জ্বরাতুর অর্ধাহারী প্রবীণের নয়!—

অপর্ণা সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিতেই এক তরুণের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল। পতিত হইয়াই কিন্তু সে দৃষ্টি তখনই আর প্রত্যাবর্তন করিতে পারিল না! শৈলেশ-রাজতনয়া যেমন অতর্কিত-দৃষ্ট সাধনের ধনকে সম্মুখে দেখিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ—হইয়াছিলেন, অপর্ণার তেজীয়ান দৃষ্টিরও আজ সেই দশা! কিছুক্ষণ এমনই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া থাকিয়া নির্মলই প্রথমে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল, যেহেতু বিস্ময়ের ঢেউটা তার দিক হইতেই গিয়াছিল, তার দিকে আসে নাই। সে এক পা অগ্রসর হইয়া সহজ ভাব ধারণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টায় সামান্য কৃতকার্য হইয়া কথা কহিল—ভাল আছ অপর্ণা?

অপর্ণার চিত্ত হইতে তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই, সে জবাব দিল—ভাল। আপনি?

—আমি ভাল আছি।—এই উত্তর দিয়া নির্মল এমন একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিল, যাহা চোখে পড়িলে দ্রষ্টার পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা হয়ত দুঃসাধ্য হয়, অপর্ণার নতনেত্রে ধরা পড়িল না।

ঝি বাসন মাজিয়া রান্নাঘরে তুলিতেছে, একটা বিড়াল এঁটো কাঁটার মধ্যে খাদ্যান্বেষণে নিরত রহিয়াছে, আর কেহ কোথাও নাই। চারিদিকে চাহিয়া নির্মল অপর্ণাকে প্রশ্ন করিল—বেহারিবাবু কোথায়?

—বাড়ী নেই।—অপর্ণা পায়ের আঙ্গুল দিয়া উঠানের মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

নির্মল পুনঃ প্রশ্ন করিল—ফিরবেন কখন?

—জানি না।—অপর্ণা যথা কার্য করিতে লাগিল, ঈষৎ কুণ্ঠিত।

—ফিরতে কি বেশী দেরি হবে? তাঁকে আমার বিশেষ দরকার। সকালেই

আমি আসছিলাম, কলেজ ষ্ট্রীটের কাছে আমাদের গাড়ীর সঙ্গে অন্য গাড়ীর ধাক্কা লাগে, যতী—আমার ভাই যতীশ্বরের পায়ে তাইতে একটা চোট লেগেছে, তাই তখন আসা হলো না, এখন—

—যতী-দা কোথায় ?

—কলেজ হাসপাতালে। এখনই তার কাছে ফিরে যাব। ডাক্তার বলেছেন দু-তিন দিনে সেরে যাবে, ভয় নেই।

অনেকক্ষণ কেহই আর কোন কথা কহিল না। বুঝি ইহাদের পরস্পরকে জানাইবার এবং পরস্পরের কাছে জানিবার সব কথাই ঐ কয়টি কথার মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে !

অগত্যা নির্মল বিদায় লইল। অপর্ণা তাহাকে বসিতেও বলিল না; বিহারীর আসার সম্বন্ধে আশাও দিল না, কাজেই অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। মনে বুঝি সে রকম বলেরও অভাব, কর্তব্যের খাতিরে আসিয়াছে, সঙ্কোচ কাটে কেমন করিয়া ? যতীও ভাগ্যক্রমে শয্যাগত, সময়ও সংক্ষেপ।

—কাল সকালবেলা আসবো ? তিনি বাড়ী থাকবেন ?

অপর্ণা একবার নতদৃষ্টি তুলিয়া নির্মলের আধি-ক্লিষ্ট মুখের পানে তাকাইল। চোখের দৃষ্টি ঈষৎ করুণ হইয়া উঠিল, একটু ভাবিয়া কহিল—কাল এই সময় আসতে পারেন।

—আচ্ছা—বলিয়া নির্মল বাহির হইয়া গেল।

বিহারীর এই কয়দিনে যে রেটে বয়স বৃদ্ধি হইতেছিল, সে হিসাবে চলিতে থাকিলে দু-এক মাসেই তার একশত বৎসরের বৃদ্ধত্বলাভ আশা করা যায়। সে ধীরে ধীরে চলে, মৃদুকণ্ঠে কথা কয়, খাওয়া প্রায় নাই। অপর্ণা দু-একদিন রহস্য করিয়া বলিতে গিয়াছিল—খরচ বাঁচাবে বুঝি কম খেয়ে খেয়ে ?—জবাব পায় নাই।

কিন্তু কনের মনটা আজকাল বড় ভাল। সে মনের স্ফূর্তিতে দিব্য রাঁধে বাড়ে, খায় দায়, এবং মধ্যে মধ্যে একা একা গুনগুন করিয়া আপন মনে গানও করে। আবদারে অত্যাচারে বিহারীর উপর জুলুম করিতে কিছুমাত্র

ক্রটি করে না। তবে বেহারী দা ডাকটা আগে ভাগেই ত্যাগ করিয়াছে, এবং বিহারীর এই সংসার-নিস্পৃহার মধ্যে যে কিছুমাত্রও বৈরাগ্য নাই—একথা বারংবার তাহাকে বিঁধাইয়া শুনাইতেও ছাড়ে না। শুনিয়া বিহারী রাগ না করিয়া নীরবেই থাকে! তার যে কি হইয়াছে, সে নিজেই জানে না!

তবে এ কথাটা তার এই ব্যথা-জড় চিত্তটাও বুঝিত, অপর্ণার এই আত্মবলিদান বুকে তার যতই বাজুক—এই শোণিতাপ্লুত উৎসর্গ গ্রহণের মধ্যের নিদারুণ লজ্জা জ্বালার ভিতর যতই গ্লানি তার থাক, এক ফোঁটা তীব্রতম সুখও আছে, ইহা অস্বীকার করিবার নয়, আর ইহাই শুধু বিহারীকে লজ্জায় মরিয়া যাওয়া হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যে অপর্ণা তার এই উত্তীর্ণ-প্রায় প্রৌঢ়-জীবনের ধ্যান এবং স্বর্গ—সে তাকে সুখী করিতে পারিল না সত্য কিন্তু তারা যে পরস্পরের সান্নিধ্যে পরম স্বস্তিতে থাকিতে পারিবে, যতবড় স্বার্থপরতাই থাকুক এ সত্য সে অস্বীকার করিবে কোন মুখে? একমাত্র দুঃখ, দিদি অপর্ণা! এই প্রাণভরা ডাক যাহাতে তার সারাপ্রাণ আনন্দে গৌরবে ভরিয়া উঠে সেই মধুর সম্বোধন, বাহ্যতঃ হইলেও এই নব-সম্বন্ধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে স্থান পাইবে না! বিশ্রী ভাবে 'ও গো' 'হ্যাঁ গো' বলিতেও আদিষ্ট হইতে পারে! ছলে ছুতায় নড়িতে চড়িতে বুক ভরিয়া একবার ডাকিয়া উঠিবার উপায় নাই—দিদি অপর্ণা! দিদিমণি রে!—এ দুঃখ কি মন ছাড়িয়া যায়? কিন্তু অপর্ণা এদিকে বক্র কটাক্ষে দেখে, আপন-ভোলা প্রৌঢ়ের চিন্তাতুর শুষ্ক মুখে বড় অজ্ঞাতসারে কোন সুখ স্বপ্নের আমেজে অতি ধীরে অতীত দিনের অরুণরাগ জাগিয়া উঠিতেছিল, ধিক্কারের কালবৈশাখী সে ক্ষীণ আলো আভাসকে আড়াল করিতে মুছিয়া দিতে পারিতেছিল না।

৫৪

মেঘভারক্লিষ্ট রোদনোচ্ছ্বসিত মধ্যাহ্নকাল! সারা প্রকৃতি কিসের আসন্ন দুঃখে যেন আজ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন! দ্বারের কড়া নড়িতেই

অপর্ণা নিজে আসিয়া আজ দরজা খুলিয়া দিল। খোলা দ্বারের মধ্য দিয়া নির্মলও আজ কতকটা সহজভাবেই উঠানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—তিনি কোথায় ?

অপর্ণা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া পাশের রোয়াক দেখাইয়া জবাব দিল—বসুন, বলচি।

নির্মল নীরবে আজ্ঞা পালন করিয়া শুনিবার জন্য ঔৎসুক্যপূর্ণ নেত্রে আতিথ্যকারিণীর মুখের দিকে চাহিল। চাহিয়া যেন মনে মনে শিহরিয়া, তখনি সে দৃষ্টি নত করিল। সত্যই কি এ তার সেই পরিচিতা অনাথা বালিকা অপর্ণা।

অপর্ণা অতিথির অদূরে দাঁড়াইল, বলিল - তিনি আজও বাড়ী নাই—ফিরতে অনেক রাত হবে।

—তুমি তাঁকে বলতে বুঝি ভুলে গেছ ? তা হোক, আজ যতী অনেকটা ভাল আছে আমি আবার সন্ধ্যার পরেই আসছি। বলিয়া নির্মল উঠিবার জন্য পা উঠাইল।

একটু কাছে আসিয়া অপর্ণা কহিল—না, আপনি আর আসবেন না।

এই অদ্ভুত শিষ্টাচারের অর্থ বোধ করিতে না পারিয়া বিহ্বলভাবে নির্মল তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া সে কথাটা সুস্পষ্ট করিয়া দিল, বলিল—যদি সম্ভব হয়, তা হলে অন্ততঃ দিন পাঁচেকের জন্যে ভবানীপুর—না, কলকাতাও আপনাকে ত্যাগ করতে হবে!

নির্মল কিয়ৎকাল স্তম্ভিত থাকিয়া কহিল—তাঁর সঙ্গে দেখা করায় তোমার আপত্তি কিসের অপর্ণা ?

—আছে বলেই বলছি! পনেরই শ্রাবণের পর ইচ্ছা হয়ত আসবেন, তখন আসায় আমার মানা নেই।

বিহ্বল শ্রোতার মুখে বারেক ক্রূর কটাক্ষক্ষেপ করিয়া অপর্ণা আবার কহিল—আমার এই কটি কথাই বলবার ছিল, আপনাকে আর কষ্ট দেব না।

এইরূপে বিদায় দিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া নির্মল রুদ্ধস্বরে ডাকিল—

শোন! নাম ধরিয়া তাহাকে সে আর আহ্বান করিল না। অপর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইলে নির্মল তেমনি প্রগাঢ় স্বরে কহিতে লাগিল—তোমার মা বেঁচে থাকলে আমার অবস্থা জেনে তিনি হয়ত আমায় ক্ষমা করতেন। কাল আমি বড় আশা করেছিলাম—বুঝি তুমিও তা পারবে! নারীর মধ্যে দেবতার আবির্ভাব আমি যেমন দেখেছি, তেমন করে কেউ দেখতে পায় নি। তাই ভেবেছিলাম এখানেও দেবতার পরাজয় ঘটবে না! কিন্তু—

—যা ভেবেছিলেন, তাতে আপনার কোন ভুল হয় নি। মনে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই! আমি আপনার কাছে করযোড়ে ভিক্ষা চাচ্চি, আপনি এ বিয়ের প্রতিবন্ধক হবেন না—ওর কাছে আমরা যে বড় ঋণী, সে ঋণের এই একটুখানি মাত্র পরিশোধ করবার অবসর আমায় পেতে দিন।

বিদ্ধ-পশুর আর্ত রবের ন্যায় অকস্মাৎ চমকিয়া নির্মল বিকৃতস্বরে উচ্চারণ করিয়া উঠিল—তাঁর সঙ্গেই কি তবে বিয়ে? বেহারির সঙ্গে!

—হ্যাঁ।

দুই চক্ষে নিবিড় অন্ধকার লইয়া সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর বাক্য স্ফূর্তি হইলে—অতি ধীরে উচ্চারণ করিল—সত্যি?

অপর্ণা হাসিল—মিথ্যা বলা কখন ত অভ্যেস করি নি, নিমু-দা!

আবারও কিছুক্ষণ ধরিয়া নির্মল এ আঘাতও সামলাইল! পরে কহিল—আমায় তুমি ক্ষমা করো নি, না-ই করলে, আমি না হয় চলেই যাচ্চি, কিন্তু অপি! যোড়হাত করছি তোমার কাছে, এ বিয়ে তুমি বন্ধ কর।

পলাশডাঙ্গার বাড়ীতে অপর্ণাকে সকলে অপি বলিয়াই ডাকিত। নির্মল আজ বহুদিন পরে সেই নামই ধরিল! ঠোঁট কামড়াইয়া লইয়া অপর্ণা কহিল—আমরা ত বড়লোক হই নি নিমু-দা! আমাদের ধর্ম সমাজ সব দিকটা বজায় রেখে চলতে হয় যে!

—এ পাগলামি ত্যাগ তোমায় করতেই হবে অপু! তা না করলে আমি শুনবো না।

অপর্ণা এই সনির্বন্ধ অনুনয়ের উত্তরে মাত্র একটুখানি হাসিল।

— বেহারিবাবুর সঙ্গে তাহলে দেখা আমি করবো।—নির্মলের মনে একটু একটু করিয়া সাহস দেখা দিতেছিল, তাই এমন দৃঢ় প্রতিবাদটাও করিয়া বসিল।

অপর্ণা দুই চক্ষে আগুন জ্বালিয়া সরোষে চাহিল—ভ্রূকুটিকুটিল মুখে কহিল—না, করবেন না।

পরক্ষণে নিজের এই অসংযত আচরণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আবার নিজের সে লজ্জা ঢাকিতে বড় বেশী রাগিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল—আমার দিব্যি, আপনি কলকাতা ছেড়ে এক্ষনি চলে যান! কিসের জন্যে আমার কর্তব্যে বাধা দিতে এসেছেন?

—তবে এ-ই তোমার শেষ সিদ্ধান্ত?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমি যাই?

—যান।

—বেহারির সঙ্গে দেখা আমি করবো না, তোমার দিব্য আমার কাছে তুচ্ছ নয়—তা না জানলে তুমি এ দিব্য দিতে না। দুঃখ এই, ক্রমাগত পাপই করে চলেছি। প্রায়শ্চিত্ত একটারও করতে পারলেম না! উপায় কি! কিন্তু অন্ততঃ আত্মীয় মনে করে এই কথাটুকু আমার রাখ- অপর্ণা আর কাকেও তুমি বিয়ে কর। আমায় শুধু সেই ভারটুকু নিতে দাও। এ তোমার জন্যে নয়, আমার প্রতি দয়া করে প্রায়শ্চিত্ত করবার এইটুকু অধিকার দাও!

অপর্ণা বিরক্তি-বিরসমুখে চুপ করিয়া রহিল।

—তবে না হয় লোকে একটু নিন্দাই করবে—এই রকমই থাকো।

—যাদের অনেক আছে—তাদের কাছে লোকনিন্দা হয়ত খুবই তুচ্ছ। কিন্তু যাদের আর কিছুই নেই, তাদের কাছে এটা নেহাত সামান্য নয়। কেন আমি অনর্থক লোকগঞ্জনা সহ্য করতে যাব?

নির্মল এবার আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মুখ দিয়া সবেগে বাহির হইয়া গেল—বেহারির জন্যে নিজেকে ত বলিদান করতে পারচ! এতেই কি লোকে হাসবে না?

—সে হাসি হয়ত খুব অসহ্য নাও হতে পারে, নিমু-দা। আজও যে এই একটা আশ্রয়ের মধ্যে আছি, আপনাদের মতন বড়মানুষদের দোরে রাঁধুনিবৃত্তি করে আমায় যে খেতে হচ্ছে না, সে কার জন্যে? আমাদের মান ইজ্জত বজায় রয়েছে, এর কাছে ধৃষ্ট লোকের একটুখানি বাঁকা হাসি কি আর খুব বেশী মনে বাজবে?

এই কথাটা এমন সত্য, আর এমনি নির্ঘাত, যে নির্মল শুধু অর্থহীন দৃষ্টিতে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, প্রতিবাদের চেষ্টা মাত্র করিতে পারিল না।

তখন অপর্ণা আবার বলিল—এবার জ্বালাহীন অনুনয়ের স্বরেই কহিল—আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। শুনেছি, আপনি খুবই শোকার্ত আপনাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে আমার নেই, আপনার কাছে আমাদের কিসের দাবী? প্রতিশোধের কথাই বা তুলতে গেলেন কেন? কিসের প্রতিশোধ? আপনারা যে অনুগ্রহ করে আজও মধ্যে মধ্যে বার্তা নিচ্চেন, তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ, তার বেশী সম্বন্ধ মুনিব-ভৃত্যের তো নয়! আপনি দয়ালু তাই দয়া করতেই এসেছিলেন; নইলে আজকের বাজারে কে এত করে? আমার দুর্ভাগ্য—আমি সে দয়া নেবার যোগ্য নই। উনি আমার মাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন, মরণকালে তাঁকে বড় শান্তিতেই মরতে দিয়েছেন—অনেক করেছেন, আজও করছেন। আমি তার কতটুকু শোধ করতে পারব? —আমার যা সাধ্য, তাই করতে চেয়েছি। আমি সব চাইতে এতেই সুখী। মাতৃঋণের কিছু পরিশোধ হবে।

এই বলিয়া অপর্ণা সরিয়া দাঁড়াইল। নত দেহে স্থাণুবৎ অচল নির্মলকে সে প্রণাম করিল! তার পর হাসিমুখ তুলিয়া বলিল—এ পৃথিবী থেকে শুধু ঋণী হয়ে না গিয়ে, যতটা পারি, কিছু শোধ করে যেন যেতে পারি—এই কথা বলুন! মাও মৃত্যুকালে এই আশীর্বাদ করে গেছেন।

আশীর্বাদ করা দূরে থাক—কোন কথাই নির্মল কহিল না, ক্ষণমাত্র পরে নীরবে উঠিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। জুতা ছাতা যেখানকার সেইখানেই সব পড়িয়া রহিল। এদিকে কোন সময় নিকষকালো মেঘজালে শ্রাবণের বর্ষণক্লান্ত

আকাশ আবার ছাইয়া গিয়াছিল। কখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিজল প্রকৃতির ব্যাকুল বেদনাশ্রুর মতই ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, উহারা জানিতেও পারে নাই। এক্ষণে সেই টিপ টিপ বৃষ্টির বেগ বর্ধিত হইয়া উঠিল। বাতাস ঘোর রোলে হাহাকার করিয়া উঠিল—হায়! হায়! হায় রে!

বিহারী ভিজা ছাতা রকে মেলিতে গিয়া দেখিল একজোড়া চকচকে দামী জুতা উঠানে পড়িয়া ভিজিতেছে; আর সেই মাটির রোয়াকের উপর সেই ঘনায়মান মেঘ-সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে আকাশের তড়িৎলতা বুঝিবা স্থিরকৃত রহিয়াছে! থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া বৃষ্টি প্রবলতর হইয়া আসিতেছে; বাতাস হা হা করিয়া শোকের কান্না কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, আর এই জনহীন গৃহ মধ্যেও সেইরূপই রূপের তরঙ্গে শোকের তরঙ্গ উত্তাল হইয়া যমুনা গঙ্গার মত একধারায় মিশিয়া তরঙ্গিত হইতেছিল। বিহারীর মনে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ দেখা দিল। মুনিববাড়ী—তাঁদের জামাইয়ের কোন বন্ধুর পা ভাঙ্গিয়া পতন উপলক্ষে কোন এক দূরপ্রবাসীর একটা পরিচিত নাম সে যেন বারংবারই উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিল না? তার পর এই জুতা জোড়া—এ কাহার? নিকটে আসিয়া অধীর উত্তেজনায় প্রশ্ন করিয়া উঠিল—কে এসেছিল!

বিহারীর সাড়া পাইয়া অপর্ণা তখনই ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিতেই বিহারী তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—তুমি অমন করে কাঁদছিলে অপর্ণা!

অপর্ণার রোদনাক্ত মুখে তখনই তার অভ্যস্ত গর্বের চিহ্ন ফুটাইতে গেল, কিন্তু সুস্পষ্টরূপে বুঝিবা ফুটিল না,—আকাশের বিদ্যুতের মত শুধু একবার সে জমাট মেঘস্তরের উপর চকিত হইয়াই মিলাইয়া গেল। তথাপি সে রোখ করিয়া জবাব দিল—আমার কি কাঁদবার কিছুই নেই!

—থাকবে না কেন? কিন্তু তোমার মা যেদিন স্বর্গে যান—আমি হাহাকার করে কেঁদেছি, তুমি ত কই সেদিনও কাঁদ নি?

—মা নরক ছেড়ে স্বর্গে গেলেন, তাতে কান্না পাবার কি ছিল শুনি?

বিহারী এবার তার মুখের দিকে সুস্পষ্ট চাহিয়া অসীম সাহসভরে কহিল—আজ তোমার স্বর্গ থেকে নরকে পতন হলো বুঝি? কে এসেছিল?

—কে আবার কবে তোমার বাড়ী এসে থাকে? স্বপ্ন দেখচো না কি?

—তুমি বলবে না? নাই বললে, আমি বলতে পারি। বলবো?

—না, কোন কথা তোমার বলবারও দরকার নেই, মাথা ঘামাবার দরকারও নেই।

—নির্মল এসেছিল?

—কে তিনি? আমি কোন নির্মলকে চিনি নে!

—চিনবে না কেন, খুব চেনো এই হতভাগা বেহারীর গলায় দড়ি দেবে বলে, তাকে তুমি বিদায় করে দিয়েছ? কেমন, না?

—দিয়ে থাকি দিয়েছি—খুব করেছি। সে আমার কে যে দোব না?

—তোমার কেউ না, আমার সব। আর আমি তোমার ও চোখ-রাঙ্গানীকে ভয় করি নে, অপর্ণা! যেখান থেকে পাই—এক্ষনি আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো।

সেই অবিরল শ্রাবণ ধারার মধ্যে ঘনায়মান মেঘান্ধকারে প্রৌঢ় বিহারী বলিষ্ঠ যুবকের মতই একলাফে সেই কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে বাহির হইয়া গেল।

তখন আবার সেই আদ্র মাটির মেঝের উপর পুড়িয়া অপর্ণা আর্তস্বরে বলিল—মাগো! আজ তুমি কোথায় মা?

বৃষ্টি তখনও থামে নাই—বরষণভারাতুর আর্দ্র বায়ু তখনও থাকিয়া থাকিয়া হু হু শব্দে যেন কার বিদায়কান্না কাঁদিয়া উঠিতেছে। আকাশপথে বরণের আ'না ঘুরাইয়া মঙ্গল শঙ্খধ্বনি হইতেছিল নাকি? সেই গাছটায় একগাছ টগর ফুল বিনিময়ের মালার মত শুভ্র বেশে প্রতীক্ষারত রহিয়াছে, আর অপরিচ্ছন্ন মৃত্তিকায় তখনও সেই রাশিকরা ফুটন্ত পদ্ম পড়িয়া। বিহারী আগ্রহ-মথিত আনন্দ-নিরুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—উঠে বসে দেখ দিদি! একবার চেয়ে দেখ, আজ সাত রাজার ধন মাণিক কুড়িয়ে ঘরে এনেছি—দিদিমণি! চেয়ে দেখ।

কুণ্ঠিতভাবে নির্মল কহিল—অপর্ণা! তুমি তাড়িয়ে দিয়েছিলে, আবার এসেছি, এ অপরাধ আমার ক্ষমা করতে পারবে কি ?

শিশুর মত প্রাণখোলা উচ্চ হাসি হাসিয়া সুখবিহ্বল বিহারী গদগদ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—আমার দিদি দিনের মধ্যে নাহোক, সাতবারও আমায় তাড়ায়, আমিও ভাই! সাতবার ঘুরে ঘুরেই আসি। এবার তুমিও তাই করবে দাদা! তাতে ত গৌরব ভিন্ন তোমার লজ্জা নেই, অন্নপূর্ণার দোরে যে শিব ভিখারী! বিশ্বেশ্বর ত সে দরবারে রাজা নন।

সমাপ্ত